KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2087	Place of Publication: ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলকাতা
Collection: KLMLGK	Publisher: প্রবোধ পাল
Title: পল্লী-শ্রী	Size: 7"x9" 17.78 x 22.86 c.m.
Vol. & Number: ১/১-১২	Year of Publication: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ - বৈশাখ, ১৩৪৬
	Condition: Brittle Good
Editor: অমূল্যচরণ ৪৩ ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেন	Remarks:

CD Roll No. KLMLGK

পল্লী-শ্রী

বার্ষিক সূচী

১ম বর্ষ

(জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫—বৈশাখ ১৩৪৬)

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দত্ত

(জ্যৈষ্ঠ—কার্ত্তিক ১৩৪৫)

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম

(অগ্রহায়ণ ১৩৪৫—)

বার্ষিক সূচী

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

নিবেদন ... ১
মেদিনীপুরে পল্লী-সংগঠন ... ১
পল্লী-উন্নয়ন ... ২
ঘাটাল মহকুমায় পল্লী-সংস্কার—নাটুক গ্রামের উন্নতি ... ৩
সাতশাটির উন্নতি ... ৩
আনন্দপুরে পল্লী-মঙ্গল ... ৩
নেড়ে-বলিবাঁধ পল্লী-সংস্কার সমবায় সমিতি ... ৪
টুঙ্গুরে পল্লী-উন্নয়ন ... ৪
বালিচকে পল্লী-মঙ্গল ... ৪
মাড়োতলায় পল্লী-মঙ্গল ... ৫
গোপালপুরে পল্লী-মঙ্গল ... ৫
আঙ্গুয়ায় পল্লী-উন্নয়ন ... ৫
আমড়াখালি খাল সংস্কার ... ৬
তমলুকে খাল সংস্কার ... ৬
বানপুর-মেচেদা খাল সংস্কার ... ৬
তমলুক মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন ... ৬
কাঁথি মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন ... ৭
কৃষি ও শিল্প ... ৭
মেদিনীপুরে পঞ্চায়ৎ সম্মিলন ... ৯
রোগ ও চিকিৎসা ... ১০
শোক-সংবাদ ... ১০

আষাঢ়, ১৩৪৫

চিনাবাদামের চাষ ... ১
চাঙ্গুয়াল ইউনিয়ন বোর্ডের জনসেবা ... ৩
গোপালপুর পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির উদ্যম ... ৪
কাঁথি মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন ... ৪
হাঙ্গুয়াখালি খাল সংস্কার ... ৫
শ্যামগঞ্জে পল্লী-উন্নয়ন ... ৬
খেলা-ধূলা ... ৮

শ্রাবণ, ১৩৪৫

গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা ... ১
বিদ্যাসাগর-তর্পণ ... ২
কাঁথির জলনিকাশ সমস্যা ... ৫
তমলুকে জলনিকাশী সভা ... ৬
কার্পাসের চাষ ... ৮
কোটালবেড়ের ... ১১
সদর (উত্তর) মহকুমায় পল্লী-সংগঠন ... ১১
লোহাদায় পল্লী-উন্নয়ন ... ১৩
গো-পালন ... ১৪
সাঁতার ... ১৫

ভাদ্র, ১৩৪৫

বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীসজনীকান্ত দাস ... ১
বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা ... ৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৭
অধ্যাপক স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতার সারমর্ম্ম ... ৭
বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ—শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন ... ৮
বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১১
মেদিনীপুরে বঙ্কিম-শতবার্ষিকী ... ১৩
পল্লী-উন্নয়ন
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মেমোরিয়েল এসোসিএশন ... ১৫
মাণিকপাড়া পল্লী-সংস্কার ... ১৬

আশ্বিন, ১৩৪৫

চলার বেগ ... ১
খাদ্য ও স্বাস্থ্য ... ২
ম্যালেরিয়া ... ৪
নেপিয়ার ঘাস ... ৬
দ্বারিবেড়্যা শ্রীশ্রী গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া সমবায় পল্লী-সংস্কার সমিতি লিমিটেড ... ৯
গোপালপুর পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির কার্য্যবিবরণী ... ১০
জালিমান্দা ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয় ... ১২
ডেবরায় দাতব্য চিকিৎসালয় ... ১২
শ্যামগঞ্জে দাতব্য চিকিৎসালয় ... ১২
খেলাধূলা ... ১৩
জনসংখ্যায় মেদিনীপুর ... ১৪
চক্রকোণার বিবরণ ... ১৮

কার্ত্তিক, ১৩৪৫

বাংলা-গদ্যের জনক মেদিনীপুর-নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
শিশু-সাহিত্য ... ৫
প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ... ৬
স্বাস্থ্যকর গৃহ ... ৮
সবুজ সার ... ৯
গিধনি-পল্লীমঙ্গল-সমিতির কার্য্যবিবরণী ... ১০
পল্লীসেবকের পত্র ... ১১
সাহিত্য-পল্লী ... ১২
যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশ ... ১৫
প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা ... ১৬
খেলাধূলা ... ১৭
হস্ত-নির্ম্মিত কাগজের শিল্প ... ১৮
বাংলা জন-সাধারণের স্বাস্থ্য ... ২০

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

মেদিনীপুরের প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র : 'মেদিনীপুর ও হিজলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ'—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
বাংলা সাহিত্য—শ্রীসজনীকান্ত দাস ... ৩
লোকশিক্ষা ও পাঠাগার—শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন ... ৫
মেদিনীপুরে তুলার চাষ ... ৭
মেদিনীপুর-জেলায় পল্লী-উন্নয়ন ... ৮
ছোট ছেলের খেলা ... ১৪
খেলাধূলা ... ১৬
শ্রীনিকেতন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৭
মেদিনী-পরিচয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু ... ১৯

পৌষ, ১৩৪৫

বাংলা সাময়িক-পত্র—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
উল্কা ... ১১
আনন্দপুর—শ্রীঅনন্তচন্দ্র বাগ ... ১৯
পল্লী-উন্নয়ন ও শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য—ডাঃ অনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ... ২৫
আহারে বিচার—শ্রীবৃদ্ধ ... ১৬
পল্লী-মঙ্গল
বালিসাহী পল্লীমঙ্গল-সমিতির প্রচেষ্টা ... ১৮
দুমুঠি পল্লীমঙ্গল-সমিতির কার্য্য ... ১৯
পাঁচথুবী গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন ... ১৯
মেদিনীপুরে মোস্লেম পুরাকীর্ত্তি ... ২০

মাঘ, ১৩৪৫

বাংলা সাময়িক-পত্র—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
দেশলাইয়ের ইতিহাস ... ৯
পল্লী-পার্ব্বণ—পৌষুরি—শ্রীচারুচন্দ্র সেন ... ১০
সংক্রামক রোগে শুশ্রূষার ব্যবস্থা—শ্রীবৃদ্ধ ... ১২
মেদিনীপুরে সমবায় সম্মিলন ... ১৩
মেদিনীপুর বিভাগীয় সমবায় কন্‌ফারেন্সের সভাপতি মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস.-এর অভিভাষণ ... ১৫
মেদিনীপুর সমবায় সম্মিলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ... ১৮
মেদিনীপুরে যক্ষ্মা চিকিৎসাগার ... ২৩
মেদিনীপুরে বয়-স্কাউট-সম্মিলন ... ২৩
ফাল্গুন মাসের কৃষি-কথা ... ২৪

ফাল্গুন, ১৩৪৫

আমার সাহিত্য-জীবন—শ্রীসজনীকান্ত দাস ... ১
বেতাগ্রে পল্লীমঙ্গল-আসর ও তার ভবিষ্যৎ—মিঃ এ. কে. সেন ... ৪

সমবায় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-সমিতি
—ডাঃ অনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ... ৮
ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিবরণ—শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ... ১০
দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ... ১২
ন্যারায়ণগড় থানার অন্তর্গত গুড়দলা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন গুড়দলা পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী ... ১২
ছেলেদের স্পোর্টস ... ১৪
প্রদর্শনী ... ১৫
গড়বেতা কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী ... ১৬
গোপীবল্লভপুর প্রদর্শনী ... ১৬
বালিচক কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী ... ১৭
টুঙ্গুর কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী ... ১৭
কাগজশিল্পে বাঁশের স্থান ... ১৮

চৈত্র, ১৩৪৫

শিশুই মানবের জনক—মহামান্যা লেডি রীড ... ১
মেদিনীপুর জেলায় পল্লী-উন্নয়ন—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম ... ৩
সাহিত্য ও অন্ন-সমস্যা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস ... ৬
দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ... ৯
প্রদর্শনী
গঙ্গাধর মেলা ও প্রদর্শনী, মৃগবেড়িয়া ... ১২
দ্বারিবেড়্যা কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী ... ১৪
চন্দ্রকোণা কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী ... ১৪
বাথুয়াড়ি কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী ... ১৪
মেদিনীপুরের আদিম অধিবাসীবৃন্দের পূজাপদ্ধতি
—শ্রীসতীশচন্দ্র আঢ্য ... ১৪

বৈশাখ, ১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ ... ১
পল্লীর কথা—চারুচন্দ্র সেন ... ৪
বিদ্যাসাগর-বাণী-ভবন ... ৫
মুরগী-পালন—তপনবিলাস মুখোপাধ্যায় ... ৮
মৃৎশিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র—এগরা—নীহারকুমার রায় ... ১৪
তমলুক মহকুমায় নরঘাট-পল্লী-সংস্থার-সমিতির বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী ... ১০
ভারতের কৃষকের দুরবস্থা ও তাহার কারণ ... ১৩
সম্পাদকের নিবেদন ... ২০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/৫, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পল্লী-শ্রী

১ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ [১ম সংখ্যা

নিবেদন

'পল্লী-শ্রী' মাসে মাসে পল্লীর কথা শোনাবার জন্য আত্মপ্রকাশ করবে।

আজকাল পল্লীতে পল্লীতে নবীন কর্ম্ম-প্রেরণা জেগে উঠছে, বাংলার মুমূর্ষু পল্লীকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্য নানা রকম প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মেদিনীপুর জেলাও আজ অবসাদের মোহ কাটিয়ে উঠেছে। জেলার বর্ত্তমান কালেক্টার মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস, পল্লী-উন্নয়নের যে পরিকল্পনা এনে দিয়েছেন, তাকে অনুসরণ ক'রে অনেকগুলি গ্রামে পল্লীমঙ্গল-সমিতি গ'ড়ে উঠেছে। সেই সব সমিতির উৎসাহী কর্ম্মীদল দেশের নষ্ট স্বাস্থ্য, লুপ্ত শ্রী ফিরিয়ে আনতে আন্তরিক চেষ্টা করছেন। 'পল্লী-শ্রী' প্রতি মাসে এই সকল সমিতির কার্য্যকলাপের পরিচয় দেবে।

মেদিনীপুর জেলা একদিন শিল্প-গৌরবে সমৃদ্ধ ছিল; এখনও অনেক বিরল পল্লীতে পূর্ব্বগৌরবের চিহ্ন অতীতের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ ক'রে যে সব শিল্পী এখনও তাদের জাতীয় ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের সমস্যার আলোচনা 'পল্লী-শ্রী'তে প্রকাশিত হবে। সেই সঙ্গে কুটীরশিল্পের উন্নতি ও প্রবর্ত্তনের জন্য যে সকল প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে, তার পরিচয় দেওয়া হবে।

পরিশেষে, 'পল্লী-শ্রী' মেদিনীপুর জেলার প্রত্যেক অধিবাসীর প্রীতি, সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করে। বন্ধুজনের স্বস্তিবাচন তার উদ্দেশ্যকে সফল করুক।

মেদিনীপুরে পল্লী-সংগঠন

নূতন পরিকল্পনা

প্রায় সাড়ে সাত মাস আগে মেদিনীপুরের বর্ত্তমান কলেক্টর মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. পল্লী-সংগঠনের যে স্কীম ক'রে দিয়েছেন, তারই নীতি অনুসরণ ক'রে এই জেলার বিভিন্ন গ্রামে পল্লী-উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলেছে। পল্লীবাসীর অন্তরে নিজেদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলাই এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। পল্লীবাসী যাতে নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে চায়, যাতে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করতে পারে—সেই চেতনা তাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা—এই পরিকল্পনার মূল নীতি। গণসংযোগ না হ'লে পল্লী-উন্নয়ন স্থায়ী হয় না। সেই জন্য এই পরিকল্পনার পরিচয়ে বলা হয়েছে—"প্রথমে এমন কাজ আরম্ভ করতে হবে, যার সঙ্গে গ্রামবাসীর প্রতিদিনের জীবনযাত্রা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার যোগ আছে এবং যা গ্রামবাসীকে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে।" অতএব "সেই সব কাজ

আমাদের করতে হবে, যা সহজে কম খরচায় হয়, আর যা গ্রামবাসীর প্রকৃত উপকারে আসতে পারে।"

পল্লীর সমস্যা অনেক,—তার পথ ঘাট ভাল করতে হবে, তার জল সরবরাহের উন্নতি করতে হবে, তার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, কুটীরশিল্পের ব্যবস্থা করতে হবে—এমনি কত সমস্যা রয়েছে। কিন্তু এই সব সমস্যাকে পৃথক ভাবে সমাধান করা চলে না, কেন না প্রত্যেকটির সহিত প্রত্যেকটি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সে জন্য বর্ত্তমান 'স্কীমে' পল্লী-উন্নয়নকে এক অখণ্ড সমস্যারূপে কল্পনা করা হয়েছে। এইখানে বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুসারে কর্ম্ম-পদ্ধতির সঙ্গে আগেকার কাজের প্রভেদ দেখা যায়। আগে আগে যে সব কাজ হয়ে গেছে, তাতে এই ভাবে পল্লীর সবগুলি সমস্যাকে একসঙ্গে সমাধান করবার চেষ্টা ছিল না। সে চেষ্টার সঙ্গে ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র সেচের ব্যর্থ চেষ্টার তুলনা করা যায়।

বর্ত্তমান 'স্কীম' অনুসারে এই জেলায় পল্লী-উন্নয়নের কাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য এক জেলা-সমিতি স্থাপিত হয়েছে। এই সমিতি মহকুমা ও গ্রাম্য সমিতিকে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে পল্লী-উন্নয়নের কাজকে সুপরিচালিত করবে। ১৩৪৪ সালে মোট ৫৮টি গ্রাম্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গ্রাম্য-সমিতিগুলি মূল পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করেছে। এদের আন্তরিকতা ও অধ্যবসায়ের ফলে গ্রামবাসীর মনে আত্মোন্নতির আগ্রহ জেগে উঠুক; পল্লীতে পল্লীতে আবার সোনার প্রদীপ জ্বলুক।

পল্লী-উন্নয়ন

শ্যামগঞ্জে পল্লী-সংস্কার

পল্লীবাসীর উৎসাহ

ঘাটাল মহকুমায় শ্যামগঞ্জ পল্লী-সমিতি গ্রামের উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিচ্ছেন। গ্রামবাসীর নিলিত চেষ্টার ফলে ২০০ গজ লম্বা একটি নূতন পথ তৈরি হয়েছে; আরও তিনটে রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে। নয়টি পুকুরের পাঁক তোলা হয়েছে। গ্রামের মাঝখানে একটি বড় পুকুর একেবারে ম'জে যাওয়ায় লোকের জল খাবার অসুবিধা হচ্ছিল, গ্রামের স্বাস্থ্যও খারাপ হচ্ছিল। সে পুকুরের জল ছেঁচে ফেলা হয়েছে এবং মাটি কাটিয়ে পুকুরটিকে গভীর করা হচ্ছে। এই রকম আরও দুটো বড় ডোবার সংস্কার করা হয়েছে। এই সব মাটি দিয়ে গ্রামের সমস্ত ছোট ছোট ডোবা আর গর্ত্ত ভরাট করা হয়েছে; সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি পার্কও তৈরি হচ্ছে। সমিতির চেষ্টায় একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে; তাতে প্রায় ৩০টি ছেলে পড়ছে। পুরনো মসজিদের ঘরটির সংস্কার করা হয়েছে, তার সামনে শীঘ্রই একটি ফুলের বাগান দেখতে পাওয়া যাবে। সমিতির চেষ্টায় গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলবার বন্দোবস্ত হয়েছে। এর জন্য ঘর তৈরি আরম্ভ হয়ে গেছে। কৃষি-বিভাগ থেকে উন্নতধরণের ধানের বীজ আনিয়ে গ্রামবাসীদের দেওয়া হয়েছে; জমিতে সবুজ সার দেবার পরীক্ষা চলছে; চীনাবাদাম চাষের প্রবর্ত্তন করা হচ্ছে। গোজাতির উন্নতির জন্য গ্রামে একটা ভাল ষাঁড়ও রাখা হয়েছে।

ঘাটাল মহকুমায় পল্লী-সংস্কার

পথ-নির্ম্মাণে পল্লীবাসীর উৎসাহ

নাটুক গ্রামের উন্নতি

ঘাটাল থানার এলাকায় নাটুক গ্রামে পল্লী-উন্নয়নের ব্যাপক প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। গ্রামবাসীরা নিজের হাতে ২৮০ হাত লম্বা ও ৮ হাত চওড়া এক রাস্তা তৈরি করেছেন; ৪টি পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করেছেন। গভর্নমেণ্টের সাহায্যের সঙ্গে নিজেদের চাঁদা মিলিয়ে গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় ৪টি টিউব-ওয়েল বসানো হয়েছে।

ঘাটাল মহকুমায় ঘনরামপুর, আমধেড়িয়া, আগরাপাড়া এবং মহাবলা গ্রামের অধিবাসীগণ নিজের চেষ্টায় গ্রামপথ তৈরি করেছেন। হরিনারায়ণপুর, হিজলি, মহিষমুড়ি, খোন্দকারচক, বসন্তপুর ও মথুরাপুরের প্রজারা একযোগে শিলাই নদীর পুরনো বাঁধের সমস্ত জঙ্গল কেটে ফেলেছেন। এই বাঁধটি চন্দ্রকোণা থানার ৯ নম্বর ইউনিয়নে একমাত্র চলাচলের পথ। কুয়াপুরের প্রজারাও গ্রামপথের সংস্কার আরম্ভ করেছেন। ঘনরামপুরে যে রাস্তাটা তৈরি হয়েছে, সেটি ৪০০ গজ লম্বা।

সাতপাটির উন্নতি

শালবনি থানার এলাকায় সাতপাটি গ্রামের অধিবাসীরা বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত গ্রামপথের সংস্কার করেছেন। গ্রামের প্রত্যেকটি রাস্তাকে পাকা করা হয়েছে, তার পাশে ড্রেন কেটে দেওয়া হয়েছে, যেখানে দরকার কাল্‌ভার্ট করা হয়েছে। গ্রামে আর ঝোপঝাড় নেই, পুকুর ডোবাও পরিষ্কার। গ্রামবাসীর চেষ্টায় একটি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। গ্রামবাসীকে আমোদের সঙ্গে শিক্ষা দেবার জন্য গ্রামের মাঝখানে একটি বেতার-যন্ত্র রাখা হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের লোক সেখানে জমা হয়ে বেতারের মারফৎ পল্লী-মঙ্গল বক্তৃতা, গান অভিনয় ইত্যাদি শুনতে পায়। জেলার বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীগণ এবং স্থানীয় অধিবাসীগণও নিয়মিতভাবে তাদের পল্লী-জীবনের উন্নতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

আনন্দপুরে পল্লী-মঙ্গল

কেশপুর থানার এলাকায় আনন্দপুর গ্রামটি ঐ অঞ্চলে এক বিখ্যাত গ্রাম। সম্প্রতি গ্রামবাসীর চেষ্টায় একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এখানকার পল্লী-লাইব্রেরিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। গোজাতির উন্নতির জন্য গ্রামে একটি ভাল ষাঁড় রাখা হয়েছে। গ্রামের মাঝখানে একটি বেতার-যন্ত্র রাখা হয়েছে, সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের লোক বেতারের মারফৎ পল্লী-মঙ্গল বক্তৃতা, গান, অভিনয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জেলার বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীগণের বক্তৃতা শুনতে পায়।

নেড়ে-বলিবাঁধ পল্লী-সংস্কার সমবায় সমিতি

সমবায় সমিতির আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রীভুক্ত এই পল্লী-সংস্কার সমিতি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পল্লী-মঙ্গল কাজ আরম্ভ করেছে। নেড়ে ও বলিবাঁধ শালবনি থানার অধীন দুটি গ্রাম। পল্লী-মঙ্গল কাজের জন্য এই দুটি গ্রামের লোক সমবায় প্রথায় মিলিত হয়েছে। এই সমিতি চাঁদা, মুষ্টিভিক্ষা, শেয়ার বিক্রয় ইত্যাদিতে ১৬৯৷৶৹৷৯ সংগ্রহ করেছে। সমিতির একজন সভ্য সমিতিকে এক বিঘা জমি দিয়েছেন; তার উপর একটি সুন্দর ঘর তৈরি হয়েছে। এই ঘরটি সমিতির অফিস এবং স্কুলের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্কুলে প্রায় ৪০টি ছাত্র বিনা বেতনে পড়ছে। কৃষির প্রসারের জন্য এই সমিতি চেষ্টা করছে। ঢাকা থেকে ৫০০০ আখের চারা আনা হয়েছে। এই আখটিকে বলে সি. ও. ২৮১ এবং এর বিশেষত্ব এই যে, এটি সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে পাকে। এই পরীক্ষা সফল হ'লে এই সমিতি মেদিনীপুর জেলায় নূতন আখ চাষ প্রবর্ত্তনের গৌরব পেতে পারবে। এ বৎসর সমিতি কিছু তুলার চাষ আরম্ভ করছে, নানা রকম তরকারি ও শাক সব্জীর চাষও আরম্ভ করা হয়েছে।

টুঙ্গুরে পল্লী-উন্নয়ন

গ্রামবাসীর আন্তরিকতা

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ হাজরার নেতৃত্বে টুঙ্গুরের গ্রামবাসী যেরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে পল্লী-মঙ্গলের কাজ আরম্ভ করেছেন, তাতে পিংলা থানার অধীন টুঙ্গুর গ্রামটি শীঘ্রই আদর্শ হয়ে উঠবে। জঙ্গল কেটে, পুকুর পরিষ্কার ক'রে, গর্ত্ত ডোবা ভরাট ক'রে গ্রামের চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আশপাশের গ্রামের সঙ্গে টুঙ্গুরের স্বাস্থ্যের তুলনা করলে এর উন্নতি সহজেই বোঝা যায়। গ্রামবাসীর খেলা-ধূলার জন্য গ্রামে একটি ক্লাব রয়েছে। একটি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি নৈশ বিদ্যালয়ও রয়েছে। নৈশ বিদ্যালয়ে এখন পনরো জন ছাত্র পড়ছে। পিংলা থেকে টুঙ্গুর পর্য্যন্ত রাস্তাটি ৫১২০ ফুট লম্বা। গত বৎসর গভর্নমেণ্টের সাহায্য ও স্থানীয় লোকের চাঁদায় এর ৯৫০ ফুটের সংস্কার হয়েছিল; বাকি সমস্ত পথটির সংস্কার গ্রামবাসী নিজেদের চেষ্টায় বিনা খরচে করেছেন। সরকারী সাহায্য ও স্থানীয় লোকের চাঁদায় গ্রামের ভিতরে তিনটি টিউব-ওয়েল বসানো হয়েছে। গরীব প্রজাদের বিপদে আপদে সাহায্য করার জন্য গ্রামে একটি দরিদ্র ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

বালিচকে পল্লী-মঙ্গল

ডেবরা থানার এলাকায় বালিচক গ্রামকে দেখলে এখন ছোট খাট শহর ব'লে মনে হবে। এখানে একটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় রয়েছে; একটি পল্লী-লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে; গ্রামবাসীদের মেলামেশার জন্য একটি ক্লাবও আছে। শীঘ্রই ক্লাবের ঘর তৈরি হবে। বালিচকে নয়টি ধানের কল আছে, অনেক লোকও সেখানে কাজ করে। গ্রামের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে, সেজন্য আবর্জ্জনা পরিষ্কার করার রীতিমত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্প্রতি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এই গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছেন। এখন এখানে ৩০টি ছাত্র পড়ছে। প্রাপ্তবয়স্কগণের শিক্ষার জন্য এখানে একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং এই সমিতির সভ্যগণ নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন।

মাড়োতলায় পল্লী-মঙ্গল

ডেবরা থানার এলাকায় মাড়োতলা গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে; এখন এখানে ৭৩টি ছাত্র পড়ছে। এই স্কুলটির আশপাশে যে সব পুকুর ও জঙ্গল ছিল সেগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে। মাড়োতলা থেকে হরিদ্রাপট পর্য্যন্ত রাস্তাটির সংস্কার করা হচ্ছে। জলনিকাশের জন্য বাজারের ধার দিয়ে একটা ড্রেনও কাটা হয়েছে। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই সমস্ত কাজ দেখে এসেছেন।

গোপালপুরে পল্লী-মঙ্গল

ডেবরা থানার গোপালপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতির চেষ্টায় গ্রামের ১১০টি পুকুর ও ডোবার পঙ্কোদ্ধার হয়েছে; তার পাড়ের জঙ্গল কেটে দেওয়া হয়েছে। এই সমিতি অল্প দিনের মধ্যে গ্রামের অনেক উন্নতি করেছে।

আঙ্গুয়ায় পল্লী-উন্নয়ন

গ্রামবাসীর উদ্যম

বছর চল্লিশ আগে দাঁতন থানার অধীন আঙ্গুয়া গ্রামে ৩৬০টি পরিবারের বাস ছিল, এখন সে সংখ্যা ক'মে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—২১২। এর কারণ ম্যালেরিয়া। সুখের বিষয় গ্রামের লোক সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ম্যালেরিয়া দূর করবার চেষ্টা করছেন। এঁরা ২০১টি বাঁশঝাড় কেটে ফেলেছেন, প্রায় ৩০২৩৫ বর্গ-ফুট ড্রেন তৈরি করেছেন। পুকুরে কেরোসিন ছিটিয়ে ম্যালেরিয়ার বীজ নষ্ট করেছেন। এই সমস্ত চেষ্টার ফলে গ্রামের স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হয়েছে, সেটি নীচের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব থেকে বোঝা যাবে।

সন	জন্ম-সংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা
১৯৩২	২৩	৩৪
১৯৩৩	২৮	৩৪
১৯৩৪	১৯	২০
১৯৩৫	২৭	২০
১৯৩৬	৩১	২৭
১৯৩৭	১৮	১৭

এ থেকে দেখা যাচ্ছে সমিতি স্থাপিত হবার আগের তিন বছরে জন্মের হার ছিল গড়পড়তা হিসাবে—২০, আর মৃত্যুর হার ২৯; কিন্তু সমিতি স্থাপিত হবার পরের তিন বছরে জন্মের হার হয়েছে—২৫; আর মৃত্যুর হার—২১।

গ্রামে যে পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থাপিত হয়েছে তার চেষ্টায় ৩টি মজা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার হচ্ছে। গ্রামের লোক নিজের হাতে লাইব্রেরির জন্য ঘর তুলেছেন। "বি. আর. সেন সাধারণ পাঠাগার, আঙ্গুয়া"—এই নামে লাইব্রেরির উদ্বোধন হয়ে গেছে। চাষের উন্নতির জন্য জমিতে ধৈঞ্চা সবুজ সার দেবার চেষ্টা চলেছে। "গোসবা" "বাদকলমকাটি" ও "ঝিঙ্গাসাল" ধানের প্রবর্ত্তন করা হচ্ছে।

আমড়াখালি খাল সংস্কার

পল্লীবাসীর উদ্যম

সবঙ্গ থানার এলাকায় আমড়াখালি খালটি প্রায় চার মাইল লম্বা। এর দু মাইলের উপর সংস্কার আগে হয়ে গেছে; গত ২রা বৈশাখ থেকে আবার বাকিটা কাটা হচ্ছে। প্রত্যহ গড়ে দু তিন শ লোক নিজের হাতে এই খাল কাটছে। গত ২০শে এপ্রিল, স্বয়ং জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এই কাজটি দেখে এসেছেন; এজন্য দশ ক্রোশ পথ রৌদ্রের মধ্যে পায়ে হাঁটতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। তিনি খালটির বাঁধ রক্ষা করতে সাহায্য করবেন বলেছেন। এই খালটির সংস্কার শেষ হ'লে ঐ অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, যাতায়াতের সুবিধা হবে, চাষেরও সুবিধা হবে।

তমলুকে খাল সংস্কার

হাসুয়াখালি খাল

তমলুক থানার এলাকায় ৯ নম্বর ইউনিয়নে হাসুয়াখালি খালটি প্রায় আট মাইল লম্বা। এই খালটি শ্রীরামপুরের নিকটে কসাই নদীর সঙ্গে পূর্ব্ব-কোলার গঙ্গাখালি খালের সংযোগ ঘটিয়েছে। ঐ সমস্ত অঞ্চলের জল এই খাল দিয়েই বেরিয়ে যায়। বহু বৎসর ধ'রে খালটি ম'জে যাওয়ায় অনেকটা ধানজমির ক্ষতি হচ্ছিল। গ্রামের লোক ইউনিয়ন বোর্ড ও পল্লী-মঙ্গল সমিতির নেতৃত্বে খালটির সংস্কার আরম্ভ করেছেন। প্রায় অর্দ্ধেক খালের সংস্কার হয়ে গেছে। সমস্ত কাজটির ব্যয় হিসাব করলে আনুমানিক ৫৫০০৲ দাঁড়ায়। সেচ বিভাগ খালটির মুখ থেকে মাটি কেটে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বানপুর-মেচেদা খাল সংস্কার

পাশকুড়া থানার কোলা ইউনিয়ন বোর্ডের উৎসাহী সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় "বানপুর-মেচেদা খাল সংস্কার সমিতি" স্থাপিত হয়েছে। ২৯শে এপ্রিল ৩০০ লোক এই খালটি কাটতে আরম্ভ করেছে। সেদিন তমলুকের মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট দাঁড়িয়ে থেকে তাদের উৎসাহ দিয়েছেন এবং নিজে এক কোদাল মাটি কেটে এই কাজটির পত্তন করেছেন।

তমলুক মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন

তমলুক মহকুমায় পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলি অল্প-দিন হ'ল স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু এর মধ্যে গ্রামবাসীর চেষ্টায় পাশকুড়া থানার বাঁকাডাঙ্গর থেকে পরমানন্দপুর পর্য্যন্ত পথটির সংস্কার হয়ে গেছে। শ্রীরামপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতি কৃষির প্রসারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছে। দাইনান গ্রামে একটি ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হয়েছে। বালুঘাটা গ্রামে

কৃষি-ব্যাঙ্কের জন্য ঘর তৈরি হচ্ছে। দ্বারিবেড়্যা গ্রামে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। নরঘাটে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং ছাত্রগণ নিজের হাতে তার জন্য ঘর তৈরি করছে। তমলুক থানায় হুম্নানগ্রামে, সুতাহাটা থানায় আকুবীপুর গ্রামে এবং নন্দীগ্রাম থানায় গোকুলপুর গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

কাঁথি মহকুমায়-পল্লী-উন্নয়ন

কাঁথি মহকুমার বাথুয়াড়ি পল্লী-উন্নয়ন সমিতির চেষ্টায় একটি নৈশ বিদ্যালয় ও পল্লী-লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে। গ্রামে খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে।

রামনগর থানায় দেপাল থেকে দেপাল টোল পর্য্যন্ত গ্রামপথটির সংস্কার হয়েছে। বালিসাহীতে দুটি গ্রাম-পথের সংস্কার হয়েছে। বালিসাহীতে একটি পল্লী-লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে।

মঙ্গলামারো বাজার থেকে কাটরঙ্কা পর্য্যন্ত ৪½ মাইল লম্বা একটি নূতন রাস্তা তৈরি হচ্ছে।

পটাশপুর থানার এলাকায় বদি বাঁধ থেকে মঙ্গলামারো বাজার পর্য্যন্ত ৩ মাইল একটি খালের সংস্কার করা হয়েছে। এর জন্য চিন্তীপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মাইতি প্রায় ৬০০৲ অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। সতীশবাবুর চেষ্টায় মঙ্গলামারো বাজার থেকে কাঁসাঘাই নদী পর্য্যন্ত খালটির সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। এ কাজে আনুমানিক ৭০০৲ ব্যয় হবে; ইউনিয়ন বোর্ড ২০০৲ এর জন্য সাহায্য দিয়েছেন।

বারহাট ইউনিয়ন বোর্ড বাগ্‌দি বাঁধ থেকে কাটরঙ্কা পর্য্যন্ত ২২½ মাইল লম্বা একটি খাল কাটতে আরম্ভ করেছেন। এর জন্য ইউনিয়ন ফণ্ড থেকে ৭৫৲ সাহায্য পাওয়া গেছে।

কৃষি ও শিল্প

মেদিনীপুর জেলায় সরকারী কৃষি-বিভাগের প্রচেষ্টা

এই জেলার কৃষকেরা সাবেক আমল থেকে এক ফসলেরই আবাদ ক'রে আসছে, এ ছাড়া অন্য ফসলের আবাদ তারা করতে জানে না। যে প্রণালীতে এখন তারা চাষ করে, তাতে পর্য্যাপ্ত ফসল ফলে না, যথেষ্ট লাভও হয় না। দেশে যে পরিমাণ সার পাওয়া যায়, জমির পরিমাণের তুলনায় তাকে সামান্যই বলতে হবে।

কি প্রণালীতে চাষ করলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো যায়, কেমন ক'রে বীজ রাখতে হয়, কি রকম সার দিলে জমির তেজ বাড়াতে পারা যায়—এই সমস্ত বিষয় শেখাবার জন্য এই জেলায় বিশেষ চেষ্টা চলেছে।

শীঘ্রই নূতন ও উন্নত ধরণের ফসলের চাষ আবাদ হাতে কলমে দেখবার জন্য এ জেলায় একটি কৃষি ফার্ম স্থাপিত হবে। মেদিনীপুর থেকে দু মাইল দূরে ফড়িঙ্গ-ডাঙ্গার মাঠে এজন্য জমি নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। জেলা-বোর্ড এই কাজের জন্য ১০০০০৲ দান করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আগে জেলায় চাষের কাজ দেখাশুনার জন্য দুজন Demonstrator ছিলেন; বর্ত্তমান কলেক্টর সাহেবের বিশেষ চেষ্টার ফলে আর তিন জন Demonstrator নিযুক্ত হয়েছেন। শীঘ্রই খাশমহালের উদ্যোগে তিনটি এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর উদ্যোগে দুটি Demonstration Farm খোলা হবে।

সরকারী কৃষি-বিভাগ মেদিনীপুর জেলায় এগারোটি

কৃষিকেন্দ্র (Demonstration Farm) স্থাপন করেছেন। এসব জায়গায় নানা রকম ধান, নূতন তরকারি, আলু, আখ, তামাক, ভুট্টা ইত্যাদির চাষ হাতে কলমে ক'রে দেখানো হবে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য ৩৭ বিঘা জমি নেওয়া হয়েছে। কোথায় কোথায় এসব ফারম খোলা হবে, তার বিবরণ এখানে দেওয়া গেল—

ঝাড়গ্রাম মহকুমা— কাঁকপাড়া

সদর (উত্তর) মহকুমা—১। ধান্‌ঘুঁড়ি
২। নেড়ে
৩। বলিবাঁধ
৪। নেপুরা

সদর (দক্ষিণ) মহকুমা—১। পিংলা
২। পাঁচখুবি
৩। মালিগ্রাম

ঘাটাল মহকুমা— ১। বাঁকা
২। মহাবলা
৩। মাড়

এগুলি ছাড়া ৫টি ইউনিয়ন-বোর্ড ফারম স্থাপিত হবে। প্রত্যেকটিতে ১৮ বিঘা জমি নেওয়া হবে। সেখানে উন্নত ধরণের আবাদ দেখানো হবে। বীজ রাখবার জন্য গোলা থাকবে। সেই বীজ পরে কৃষকগণের মধ্যে বিতরণ করা হবে, পশুখাদ্যের জন্য সবুজ ঘাস রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকবে। যে সব যায়গায় ইউনিয়ন-বোর্ড ফারম থাকবে, তার নাম নীচে দেওয়া হ'ল—

ঝাড়গ্রাম মহকুমা— নেতাই

সদর (উত্তর) মহকুমা—১। মাইলদা
২। তলকুই

সদর (দক্ষিণ) মহকুমা—টুন্ডুর

ঘাটাল মহকুমা— হেমন্তপুর

লম্বা-আঁশের তুলার চাষে খুব লাভ হয়। কয়েক জায়গায় এরূপ চাষের পরীক্ষা চলেছে। শালবনি থানার এলাকায় মাইলদা গ্রামে ৫০ বিঘা জমি নিয়ে এই চাষের পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়েছে। মেদিনীপুরের উকীল শ্রীযুক্ত নবকুমার হাজরা এই জমি তুলার চাষের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।

এ বৎসর ৫০ মণ পাটনাই ধানের বীজ কয়েকটি নির্ব্বাচিত কেন্দ্রে বিতরণ করা হবে। এ ধানের ফলন খুব বেশী হয়, ধানের দানাগুলি বেশ বড় হয় আর সাদা হয়। কলওয়ালারা বেশী দামে এ ধান কিনে থাকে। যে সব কেন্দ্রে এই বীজ বিতরণ করবার ব্যবস্থা হয়েছে, তার নাম—

নেতাই— ঝাড়গ্রাম মহকুমা

মাইলদা, বালিচক } —সদর (উত্তর) মহকুমা

ক্ষীরপাই— ঘাটাল মহকুমা

সুতাহাটা, কল্যাণচক } —তমলুক মহকুমা

কাঁথি— কাঁথি মহকুমা

এ ছাড়া ঘাটাল মহকুমায় নাটুক হরিনগর এবং খঞ্জপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতির মারফৎ ১৫ মণ উন্নত আমন ধানের বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

সদর (দক্ষিণ) মহকুমায় আঙ্গুয়া পল্লী-মঙ্গল কেন্দ্রে একটি Demonstration Farm স্থাপিত হয়েছে। এর জন্য ৮ বিঘা জমি নেওয়া হয়েছে। এই পল্লী-মঙ্গল সমিতির মারফৎ ১ মণ ধৈঞ্চা সবুজ সারের বীজ ও আধ মণ উন্নত আমন বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত ওয়ার্ডস এস্টেটের প্রজাগণের মধ্যে ৩০ মণ উন্নত আমন বীজ বিতরণ করা হয়েছে—

(ক) কে. সি. চাটার্জি ট্রাস্ট এস্টেট।
(খ) ভোলানাথ দাস মহাপাত্র এস্টেট।
(গ) সৌদামিনী দাসী এস্টেট।
(ঘ) কুমারকৃষ্ণ মুখার্জি এস্টেট।
(ঙ) অন্নকুল ব্যানার্জি এস্টেট।
(চ) শৈলেন্দ্রকিঙ্কর পাল এস্টেট।

ইউনিয়ন-বোর্ড

মেদিনীপুরে পঞ্চায়ৎ সম্মিলন

গত ২৩শে এপ্রিল শনিবার, মেদিনীপুর কালেক্টরীর বার্জ হলে পঞ্চায়ৎ সম্মিলন হয়েছিল। জেলার ইউনিয়ন-বোর্ডের ও পঞ্চায়তী ইউনিয়নের অনেক প্রেসিডেণ্ট ও সভ্য এই সম্মিলনে যোগ দিয়েছিলেন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন আই. সি. এস. এই সভায় প্রেসিডেণ্ট ও সভ্যগণকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন এবং পরে তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন।

এরূপ সুচিন্তিত অভিভাষণটি আগাগোড়া মুদ্রিত করা গেল না। আমাদের এই পত্রিকায় স্থানাভাব। আমরা কয়েকটি অংশের প্রতি সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

"গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের ফলে জনসাধারণকে তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে জনহিতকর কার্য্যের জন্য ইউনিয়ন-বোর্ডের অর্থের অভাব না হয়, সেজন্য চৌকীদার ও দফাদারের বেতনের অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা বোর্ডকে দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ গ্রামের এই সমস্ত কার্য্য জেলা-বোর্ড বা লোকাল-বোর্ডের কর্ম্ম-পন্থতির অন্তর্ভুক্ত হয় না, অথচ এই সকল কার্য্য পল্লী-জীবনের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। গ্রামের রাস্তা নির্ম্মাণ ও সংস্কার করা; টিউব-ওয়েল বসাইয়া বা পুষ্করিণী পরিষ্কার করিয়া জল সরবরাহের উন্নতি করা; চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, পুষ্করিণীর শৈবাল-দল দূর করিয়া এবং ম্যালেরিয়ার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি করা—এই সমস্তই প্রকৃতপক্ষে পল্লীবাসীর আপনার কার্য্য। এই সকল কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বোর্ডকে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের ৩৭(খ) ধারা হতে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।"

দাঁতন ইউনিয়ন বোর্ড ৩৭(খ) ধারামতে অতিরিক্ত কর ধার্য্য ক'রে কি ভাবে জনহিতকর কাজ আরম্ভ করেছেন, তার উল্লেখ ক'রে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেন—

"দাঁতন ইউনিয়ন-বোর্ডের কার্য্যের পরিচয় দিয়া আমি এই জেলার অন্যান্য ইউনিয়ন-বোর্ডকে নিন্দা করিতেছি না। গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন ইউনিয়ন-বোর্ডকে যে ক্ষমতা দিয়াছে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা হইলে এবং বোর্ড সুপরিচালিত হইলে দেশের কি উপকার সাধিত হয়, তাহাই বুঝাইয়া দিতেছি। বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সমস্যার কথা আমি ভালই জানি। কিন্তু সমস্যা ও বিপদকে এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহার সমাধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

গ্রামের শান্তি বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন-বোর্ড ও স্থানীয় পুলিসের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আইনে ইউনিয়ন-বোর্ডকে চৌকিদার ও দফাদারের উপর কর্ত্তৃত্বভার দেওয়া হয়েছে; কিন্তু আইনের এ অভিপ্রায় নয় যে, ইউনিয়ন-বোর্ড স্বতন্ত্রভাবে এই ক্ষমতার প্রয়োগ করবে এবং চৌকিদার ও দফাদারের উপর পুলিসের কর্ত্তৃত্ব থাকবে না। এই কথা বুঝিয়ে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেছেন—

"পুলিস দাগী ও অপরাধীর কার্য্যকলাপ ও গতিবিধির বিশেষ সংবাদ রাখে। অতএব বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে—দাগী ও অপরাধীর দমনকালে চৌকিদার ও দফাদারের নিয়োগ ব্যাপারে—পুলিসের সিদ্ধান্ত ইউনিয়ন-বোর্ডের বিনা-দ্বিধায় মানিয়া লওয়া উচিত। বোর্ডকে বুঝিতে হইবে যে পুলিসের সহিত সহযোগিতায় তাহার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেওয়া হয় না অথবা সরকারী কর্ম্মচারীর আনুগত্য করার পরিচয় দেওয়া হয় না। তাহাতে প্রজাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার সাহায্য করা হয়।"

পরিশেষে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই জেলায় পল্লী-উন্নয়নের যে কাজ আরম্ভ হয়েছে, তার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং প্রেসিডেণ্ট ও সভ্যগণকে আন্তরিকতার সহিত এই কাজে যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন।

রোগ ও চিকিৎসা

কুষ্ঠব্যাধির প্রতিবিধান

শিলদা কেন্দ্রের ব্যবস্থা

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় কুষ্ঠ চিকিৎসার জন্য শিলদায় একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা হয় ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে। পরের বছর থেকেই নিয়মিত ভাবে কাজ আরম্ভ হয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে এই চিকিৎসা-কেন্দ্রের অধীন আরও তিনটি কেন্দ্র মাগুরা, বেলপাহাড়ি ও আরগোদা গ্রামে খোলা হয়। ১৯৩৭ সালে এই সমস্ত কেন্দ্রে যে কাজ হয়েছে, তার বিবরণ আমরা পেয়েছি। দেখা গেল, এই কটি কেন্দ্রে ২০২টি নূতন কেস ও ১৯৮৬টি পুরনো কেসের চিকিৎসা হয়েছে। যারা নিয়মিত ভাবে এই সকল কেন্দ্রে হাজির হয়ে চিকিৎসা করিয়েছে, তাদের সংখ্যা মোট ১৩১১। চিকিৎসার ফলে ৩৯ জনের দেহ থেকে এই দারুণ ব্যাধির চিহ্ন একেবারে চ'লে গেছে। ৩৯৯ জন রোগীর বিশেষ উপকার হয়েছে এবং আরও ১৪৫ জনের রোগের উপশম হতে দেখা গেছে। সাধারণকে কুষ্ঠব্যাধির স্বরূপ ও তার চিকিৎসা সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবার জন্য এই চিকিৎসা-কেন্দ্রের ব্যবস্থায় "আঁধারে আলো" নাটক অভিনীত হয়েছিল। জেলা-বোর্ড এই সকল চিকিৎসা-কেন্দ্রের সমস্ত খরচ চালাচ্ছেন।

শোক-সংবাদ

'পল্লী-শ্রী'র ছাপা শেষ হবার সঙ্গে টুঙ্গুর গ্রামের বিশিষ্ট পল্লী-সেবক ধীরেন্দ্র নাথ হাজরার অকালমৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেল। আমরা এই সংবাদে মর্ম্মাহত হয়েছি।

এই সংখ্যায় টুঙ্গুর সম্বন্ধে যে খবর আমরা দিয়েছি, সে শুধু ধীরেন্দ্রনাথের কর্ম্ম-শক্তি ও সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দেয়। এই কর্ম্ম-শক্তি গত পাঁচ বছর ধ'রে টুঙ্গুরবাসীর অন্তরে প্রেরণা দিয়েছে এবং তারই ফলে আজ টুঙ্গুরকে আদর্শ গ্রাম বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

তাঁরই উৎসাহে, গেল বছর টুঙ্গুরের প্রজারা নিজের হাতে ৩২৪০০ বর্গ-ফুট জমির জঙ্গল পরিষ্কার করেছে, ৫৪৮৯০ বর্গ-ফুট মাপের পুকুর থেকে পানা তুলে ফেলেছে, ২২৫০০ বর্গ-ফুট ডোবা ভরাট করেছে। জেলা-বোর্ডের রাস্তা থেকে রেজাপুর গ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তাটি বর্ষাকালে একরকম অচল হয়ে যেত। ধীরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় এবং তাঁর দেওয়া ইটের সাহায্যে ৩৫২০ ফুট পর্য্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার হয়েছে। গ্রামের ভিতর আরও কত রাস্তার সংস্কার হয়েছে। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে, দুর্গতদের সাহায্যের জন্য দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ক'রে, পরস্পরের মেলামেশা ও খেলাধুলার সুবিধার জন্য ক্লাব তৈরি ক'রে ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর বহুমুখী কর্ম্ম-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অথচ তাঁর কাজে আড়ম্বর ছিল না; নীরবে গ্রামের সেবায় তিনি আপনাকে নিয়োজিত করেছেন।

ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন—মিষ্টভাষী, সদালাপী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭। তাঁর পুত্র সত্যকিঙ্কর হাজরা মেদিনীপুর আদালতে মোক্তারী করেন। তাঁর দুই ভাই ওকালতী করছেন।

বিত্তশালী হয়েও তিনি শহরের মোহে ভোলেন নি। গ্রামই তাঁকে নিবিড় ক'রে ধ'রে রেখেছিল। তিনি গ্রামবাসীর অন্তরে পল্লী-উন্নয়নের যে চেতনা জাগিয়েছেন, প্রার্থনা করি, সে যেন স্থায়ী হয়।

তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি দিচ্ছি।

সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দত্ত

মেদিনীপুর লক্ষ্মী প্রেস হইতে শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৪৫

চিনাবাদামের চাষ

চিনাবাদাম অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে শতকরা ৩০ ভাগ ছানা জাতীয়, ৪২ ভাগ মাখন জাতীয় এবং ১৮ ভাগ শর্করা জাতীয় উপাদান আছে। ইহা প্রধানতঃ মাদ্রাজ উপকূল হইতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহা হইতে তৈল বাহির করিয়া রন্ধনের জন্য, সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য এবং কলকব্জা প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়। বঙ্গের বাহির হইতে প্রতি বৎসর ২০,০০০ মণ চিনাবাদাম বঙ্গদেশে আমদানি হয়।

মেদিনীপুর জেলায়, বিশেষতঃ সদর, ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল মহকুমায়, বিস্তৃতভাবে চিনাবাদামের চাষ করা যাইতে পারে। যে সমস্ত অনুর্ব্বর ডাঙ্গা জমিতে কোন শস্যের আবাদ হয় না, অথচ বৎসরের পর বৎসর তাহার খাজনা বহন করিতে হয়, সে সমস্ত জমিতে চিনাবাদামের চাষ করিয়া অর্থাগমের ব্যবস্থা করা যায়। চিনাবাদাম বাতাস হইতে যথেষ্ট পরিমাণ আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হয় বলিয়া অনুর্ব্বর জমিতে বিনা সারে প্রতি বিঘায় তিন চার মণ ফলিয়া থাকে। উর্ব্বর জমিতে বিঘা-প্রতি দুশ বার মণ ফলন পাওয়া যায়। ইহা শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদ বলিয়া যে জমিতে ইহা উৎপন্ন হয় সেই জমিকে যবক্ষার-জান নামক সারে সমৃদ্ধ করিয়া দেয়।

মাটি

বেলে মাটি, বেলে দো-আঁস, দো-আঁস কিম্বা নদীর চর চিনাবাদাম চাষের পক্ষে প্রশস্ত। যে নদীর চর বর্ষায় ডুবিয়া যায়, অথবা যে জমিতে জল দাঁড়ায় তাহাতে বাদাম দিতে নাই। বাদাম জল সহ্য করিতে পারে না। মাটিতে কাদার ভাগ বেশি থাকিলে গাছেরই তেজ হয়, বাদাম বেশি হয় না।

সার প্রয়োগ

মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলেই জমিতে চাষ দিতে হয়। পরে বিঘা-প্রতি চার গাড়ি ছাই সার (পাথর কালার নহে), তিন চার গাড়ি পচা গোবর সার এবং আধ মণ গুঁড়া চূণ জমিতে ২।৩টি চাষ দিয়া লাগাইতে হয়। জমিতে চূণের অভাব হইলে ভূয়ো বাদাম বেশি হয়। বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টি হইলে জমিতে আরও ২।৩টি চাষ ও মই দিয়া জমিকে তৈয়ার করিতে হয়। বাদামের জমিতে বেশি সার দিতে নাই, তাহাতে বাদাম কম হয়, কেবল গাছের তেজ বেশি হয়। একই জমিতে প্রতি বৎসর বাদামের চাষ করা উচিত নয়। তাহাতে ফলন কম হয় এবং গাছেরও ব্যাধি দেখা যায়। বৎসরে দুইবার বাদামের চাষ করা যায়—একবার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং আর একবার আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে। সাড়ে চার কিম্বা পাঁচ মাসের ভিতর এই শস্য পাকিয়া যায়।

বীজ

এক বিঘা জমির জন্য প্রায় ৮ সের (খোসা সমেত) বীজ আবশ্যক। খোসা ভাঙ্গিয়া বীজ লাগাইতে হয়।

বীজ দিবার নিয়ম

জমিতে মই দিয়া সমান করিয়া লইবার পরে এক হাত অন্তর দুই ইঞ্চি পরিমাণ গভীর লাঙ্গল দিয়া লম্বালম্বি জুলী বা নালী করিতে হয়। ঢালু জমির ঢাল দেখিয়া এরূপ নালী করা উচিত। পরে উহাতে এক হাত অন্তর দুইটি করিয়া বীজ ফেলিয়া জুলীর মাটি সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দিয়া মাটি সামান্য (আধ ইঞ্চি) উঁচু করিয়া দিতে হয়। লাইনগুলি সোজা হইলে পরে কাজ করিতে সুবিধা হয়।

গাছের পরিচর্য্যা

জমিতে রস থাকিলে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে গাছ বাহির হয়। গাছগুলি একটু বড় হইলে অর্থাৎ লতা ছাড়িতে থাকিলে গাছের চারিদিকের মাটি কোদাল দিয়া ভালরূপ কোপাইয়া আগাছা ফেলিয়া দিয়া মাটি আল্গা রাখিতে হয়। জমির পরিমাণ বেশি হইলে "প্লানেট জুনিয়র হ্যাণ্ড হো" (Planet Junior Hand Hoe) গাছের লাইনের মধ্যে চালাইলে খরচ কম পড়ে। একজন লোক দৈনিক ৩।৪ বিঘা নিড়াইতে ও মাটি আল্গা করিয়া দিতে পারে। মাটি তুলিয়া গাছে ভেলি করিয়া দিতে নাই। ভেলি করিলে বাদাম কম হয়। গাছ যত লতাইয়া যাইবে বাদাম তত বেশি হইবে।

গাছে প্রথম যে ফুল দেখা যায়, তাহাতে বাদাম ধরে না। পরে গাছের ডাঁটায় প্রায় প্রত্যেক গাঁটে যে ছোট ছোট ফুল ধরে তাহা হইতে বাদাম হয়। গাছে ছোট ফুল ধরিতে আরম্ভ করিলে জমির মাটিকে কোদাল দিয়া আল্গা করিয়া দিলে বাদাম খুব বেশি হয়। এই ছোট ছোট ফুলগুলি ক্রমে ঝাঁটার কাটির মত শক্ত ও লম্বা হইয়া মাটির নীচে যায় ও বাদামে পরিণত হয়। এই সময়ে মাটি শক্ত থাকিলে বাদামের ফুল মাটির নীচে যাইতে পারে না, এবং উহাতে বাদাম না হইয়া ফুল শুকাইয়া যায়।

বাদাম তোলা

বাদাম গাছ হলদে হইয়া আসিলে বাদাম তুলিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ কোদাল কিম্বা কাঁটা কোদাল (Fork Kodali) দিয়া বাদাম গাছের ঝাড়গুলিকে তুলিয়া ফেলিতে হয়। ঝাড় তোলা হইলে একটি ৫।৬ হাত লম্বা বাঁশ মাটিতে পুঁতিয়া তাহাতে একটি ঝাড়ের উপর আর একটি ঝাড় রাখিয়া এক একটি গাদা করিতে হয়। এইরূপ কতকগুলি গাদা করিয়া বাদামের গাছগুলিকে শুকাইয়া লইলে গাদার ভিতরে হাওয়া যায় ও বাদাম শুকাইয়া যায়। গরমেও বাদাম নষ্ট হয় না। এই গাদাকে লাঠি দিয়া পিটিলে সহজে বাদাম খসিয়া পড়ে। তখন সেগুলিকে জলে ধুইয়া রৌদ্রে ৪।৫ দিন ভাল করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। ভালরূপে না শুকাইলে, পরে বাদাম পচিয়া যায়। জলে ধুইবার সময় বেশিক্ষণ বাদামকে জলে রাখিতে নাই।

বাদাম ছাড়ানো বাদামের গাছ গরুর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। উহা ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া গরুকে দিতে হয়। উহার খৈলও গরুর পক্ষে খুব ভাল।

বিঘা-প্রতি বাদাম চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব

ব্যয় :

৬ বার লাঙ্গল ও মই দিবার সময় (প্রতি লাঙ্গল ।০ হিসাবে) ...	১॥০
৪ গাড়ি গোবর, ৬ গাড়ি ছাই ও আধ মণ চূণের দাম ...	৪৲
লাইন করিয়া বাদাম লাগাইবার খরচ ...	২৲
২ বার কোদাল দিয়া মাটি আল্গা করা ও ঘাস ইত্যাদি বাছিয়া ফেলার খরচ ...	৪৲
বাদাম তুলিবার খরচ ...	৮॥০
মোট—	২০৲

আয় :

১০ মণ বাদামের দাম (প্রতি মণ ৫৲ হিসাবে) ...	৫০৲

বিঘা-প্রতি মোট আয় ৩০৲

মেদিনীপুর জেলায় চিনাবাদামের চাষ

এই জেলায় যাঁহারা চিনাবাদামের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল—

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র জানা (কাকড়াসোল)
,, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভাদুতলা)
,, বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (কোলাঘাট)
,, সুরেশচন্দ্র রায় বীরবর (মনোহরপুর)
,, চিত্তরঞ্জন খাঁ (শ্যামগঞ্জ)
,, যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহস রায় (লালগড়)
মিঃ কার্টিস (ঝাড়গ্রাম)
মিঃ মার্টিন (ঐ)

এ. এচ. ১৮ নামক বাদাম এই জেলার জমির উপযোগী। ইহার বীজ মেদিনীপুরে সরকারী কৃষি অফিসে পাওয়া যায়। *

চাঙ্গুয়াল ইউনিয়ন বোর্ডের জনসেবা

দাতব্য চিকিৎসালয়

সদর (দক্ষিণ) মহকুমার অধীন খড়্গপুর থানার এলাকায় চাঙ্গুয়াল ইউনিয়ন বোর্ড মাস দশেক আগে স্থাপিত হয়েছে। গত বৎসর নভেম্বর মাসে, সার্কেল অফিসার যখন এই বোর্ড পরিদর্শন করতে যান, তখন সভ্যগণের সঙ্গে গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। তারপর চাঙ্গুয়াল গ্রামের ৫০টি অধিবাসী মিলিত হয়ে পল্লীমঙ্গল-সমিতি গড়ে তোলেন এবং শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত পাল তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই সমিতি রোগের প্রতিবিধান ও দরিদ্র প্রজার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন। চাঙ্গুয়াল গ্রামেই এই চিকিৎসালয় স্থাপন করবার সংকল্প করা হয়।

তারপর পল্লীমঙ্গল-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন পাল, বি. এল., ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল ও ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার পালের চেষ্টায় বোর্ডের এলাকার ভিতর সমস্ত গ্রামে প্রচারকার্য্য চলতে থাকে। শীঘ্রই সাধারণের নিকট হতে ৪০০৲ চাঁদা পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন পাল এক বিঘা জমি এই চিকিৎসালয়ের জন্য দান করেন।

নূতন উৎসাহে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চিকিৎসালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ আরম্ভ করা হয় এবং মে মাসের প্রথমেই গৃহনির্ম্মাণ শেষ হয়। আবশ্যক-মত ঔষধপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম আনাবার পর পল্লীমঙ্গল-সমিতির অনুরোধে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস., গত ৩০শে মে চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ইউনিয়ন বোর্ড এই চিকিৎসালয়টির খরচ চালাবার ভার নিয়েছেন। জেলা বোর্ড থেকে এই চিকিৎসালয়টির জন্য ৪০০৲ চাঁদা দেওয়া হয়েছে এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় সাহেব দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধনকালে উপস্থিত থেকে পল্লীবাসীকে উৎসাহ দিয়েছেন।

* "পল্লী-শ্রী"তে প্রকাশের জন্য এই প্রবন্ধটি মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকাল্চার্যাল অফিসার লিখে পাঠিয়েছেন।—সম্পাদক, "পল্লী-শ্রী"

গোপালপুর পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির উদ্যম

সদর (উত্তর) মহকুমার অধীন, ডেবরা থানার এলাকায় গোপালপুর, চন্দ্রামেড়, বিষ্ণুপুর, মোহনপুর ও শিমুলহাটি—এই পাঁচটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গত ফেব্রুয়ারি মাসে "গোপালপুর পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি" স্থাপিত হয়েছে। গোলগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ পাল, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দেব প্রমুখ গ্রামবাসীগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং স্বেচ্ছা-শ্রমের ফলে গত মে মাস পর্য্যন্ত ঐ পাঁচটি গ্রামের ১৩৫টি পুকুরের মধ্যে ১২৫টি পুকুর পরিষ্কার হয়েছে, ত্রিশ বিঘা জমির জঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছে, আড়াই মাইল একটি জল-নিকাশী নালা কাটা হয়েছে। ঐ নালায় যাতে বর্ষার সময় কাসাই নদীর জল নিয়ে গিয়ে মাঠগুলিকে ধুয়ে দিতে পারা যায় এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রায় এক মাইল একটি রাস্তাও তৈরি হয়েছে।

কাঁথি মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন

বাখুয়াড়ি

এগরা থানায় বাখুয়াড়ি পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি গ্রামের উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করছেন। গ্রামের ভিতর দু মাইল কাঁচা রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে, ৪৫টি পুকুর পরিষ্কার করা হয়েছে, জঙ্গল কাটা হয়েছে। সমিতি একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত করেছেন। একটি পাঠাগারও খোলা হয়েছে। সমিতির চেষ্টায় গ্রামে একটি খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে। গোসবা পাটনাই ধানের বীজ এবার সাধারণকে বিলি করা হয়েছে এবং নেপিয়ার ঘাসের চাষ আরম্ভ করা হয়েছে। সাধারণকে নূতন শস্যের চাস-আবাদ শেখাবার জন্য শীঘ্রই একটি কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা হচ্ছে।

নয়াপাড়া

এগরা থানার এলাকায় এই পল্লীমঙ্গল-সমিতি গ্রামের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। গ্রামের সমস্ত জঙ্গল কাটা হয়েছে, ২০টি পুকুর ও ডোবা পরিষ্কার করা হয়েছে, আধ মাইল লম্বা একটি কাঁচা রাস্তাও তৈরি হয়েছে। রাস্তার উপরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি কাঠের সাঁকোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ২০০ বিঘা জমির সেচ যাতে ভাল হয় সেজন্য একটা বাঁধ তৈরি হয়েছে এবং এই কাজের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থ পাঁচ জন মজুর দিয়েছেন। বাঁধের ডান ধারের খালটির সিকি মাইল কাটা হয়ে গেছে। গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। এ বৎসর প্রজাদের মধ্যে পাটনাই ধান ও তামাক চাষের প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের চেষ্টায় গ্রামে একটি "পোল্‌ট্রি ফারম" স্থাপিত হয়েছে।

গোনারা-সাহাপুর

পটাশপুর থানায় চিত্তিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের উৎসাহী প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের পরিচালনায় এই পল্লীমঙ্গল-সমিতি অল্প কয় মাসের মধ্যে ৪০টি পুকুর পরিষ্কার করেছেন, ১০ একর জমির জঙ্গল কেটেছেন, এবং আড়াই মাইল লম্বা একটি খালের সংস্কার করছেন। সাহাপুর গ্রামের জুবিলী লাইব্রেরির পরিচালনা ভার নিয়ে সমিতি সেখানে একটি অবৈতনিক পাঠাগার খুলেছেন। গ্রামবাসীরা এখন এই পাঠাগারের জন্য একটি নূতন হল-ঘর তৈরি করছেন। গ্রামে একটি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার চেষ্টা হচ্ছে।

কসবা

এগরা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন কসবা গ্রামে ৫টি নূতন রাস্তা তৈরি হয়েছে, গ্রামের জল-নিকাশী ড্রেনের সংস্কার হয়েছে, ৩৮টি পুকুর ও ডোবা পরিষ্কার করা হয়েছে এবং সমস্ত জঙ্গল কাটা হয়েছে। সম্প্রতি গ্রামে একটি পল্লী-লাইব্রেরি ও অবৈতনিক পাঠাগার খোলা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য মাঝে মাঝে বক্তৃতা ও উপদেশ দেওয়া হয়।

দুর্ম্মুঠ

কাঁথি থানার এলাকায় দুর্ম্মুঠ পল্লীমঙ্গল-সমিতি গ্রামের ভিতর একটি নূতন রাস্তা তৈরি করেছেন, অনেকগুলি পুকুর পরিষ্কার করেছেন, খানাডোবা ভরাট করেছেন। সম্প্রতি দুর্ম্মুঠ গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয় এবং পল্লী-লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে। সমিতির চেষ্টায় সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে। একটি স্লুইসের সংস্কার হয়েছে। প্রজাদের মধ্যে নূতন ধানের বীজ বিলিয়ে চাষের উন্নতির চেষ্টা করা হয়েছে।

বালিসাহি

রামনগর থানায় বালিসাহি গ্রামে তিনটি কাঁচা রাস্তা তৈরি হয়েছে, অনেকগুলি পুকুর পরিষ্কার হয়েছে, একটা বাঁধের সংস্কার হয়েছে, প্রজাদের মধ্যে নূতন ধানের বীজ বিলি করা হয়েছে। কি ক'রে সার রাখতে হয় সে সম্বন্ধে প্রজাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং এর সুফলও দেখা গেছে। সম্প্রতি একটি পল্লী-লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে। একটি অবৈতনিক পাঠশালার গৃহ-নির্ম্মাণও শেষ হয়েছে। খেলার মাঠেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুগবেড়িয়া

ভগবানপুর থানার এলাকায় মুগবেড়িয়া গ্রামে গঙ্গাধর মেমোরিয়েল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এসোশিয়েশন অনেক দিন থেকে জন-সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে আদর্শ স্থাপন করেছেন। এই সমিতির পরিচালনায় ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য দুটি পৃথক অবৈতনিক উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বয়ন বিদ্যালয়ে কাপড় বোনা, রং করা ইত্যাদি শেখাবার ব্যবস্থা রয়েছে। গো-জাতির উন্নতির জন্য সরকার থেকে দেওয়া একটি ষাঁড় এখানে রয়েছে। গঙ্গাধর মেমোরিয়াল পার্কে খেলা-ধূলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি কৃষি ফারম স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে সমিতি সরকারী সাহায্যে পাঁচ একর জমি নেবার ব্যবস্থা করেছেন। খাসমহল থেকে এখানে এইরূপ একটি ফারম খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হাসুয়াখালি খাল সংস্কার

পাঁশকুড়া হইতে তমলুক পর্য্যন্ত জেলা বোর্ডের যে পাকা রাস্তা রহিয়াছে তাহার দক্ষিণে, কাঁসাই নদীর বাঁধের উত্তরে ও পূর্ব্বে এবং খোজার বাঁধের উত্তরে ১৬ বর্গ মাইল জায়গা জুড়িয়া ১০৮টি গ্রাম রহিয়াছে। এই গ্রামগুলি পাঁশকুড়া, তমলুক ও মহিষাদল থানার অন্তর্গত।

এই সমস্ত গ্রামের অন্নসংস্থান ও স্বাস্থ্য কতকগুলি জল-নিকাশী খালের উপর একান্ত নির্ভর করে। এই জল-নিকাশের জন্য কাঁসাই নদীতে তিনটি স্লুইসের বন্দোবস্ত আছে—একটি শ্রীরামপুরে, একটি রাশ গাছতলায় এবং আর একটি টঙ্গতলায়। বিগত ৪৫ বৎসরের ভিতর খালগুলি সংস্কারের অভাবে মজিয়া গিয়াছে। নদী-গর্ভও মাঠের অপেক্ষা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকায় এই অঞ্চলের জল-নিকাশের বাঁধা জন্মিয়াছে। ইহার ফলে, লোকের যাতায়াতের কষ্ট, ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা, হঠাৎ জল-বৃদ্ধিতে শস্য-হানি এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতেছে।

এই অঞ্চলের একটি খালের নাম—হাসুয়াখালি। এই খালটি একদিকে শ্রীরামপুর-স্লুইসের ভিতর দিয়া কাঁসাই নদীতে মিশিয়াছে এবং অন্য দিকে পূর্ব্ব-কোলার ছোট স্লুইসটির ভিতর দিয়া গঙ্গাখালি খালের সঙ্গে মিশিয়া রূপনারায়ণ-নদে পড়িয়াছে। শ্রীরামপুর-স্লুইস হইতে পূর্ব্ব-কোলা-স্লুইস পর্য্যন্ত খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ মাইল।

১৯০৫ সাল হইতে এই অঞ্চলের প্রজাগণ খালগুলির সংস্কারের জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের আবেদন সার্থক হয় নাই। ১৯৩৬ সালের শেষে, তখনকার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি. এ. নরোন্‌হা মহাশয়ের চেষ্টায় এবং শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মাইতি প্রমুখ অধিবাসিগণের উৎসাহে একটি ড্রেনেজ কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটি পূর্ব্ব-

কোলার স্কুলটিকে বড় করার জন্য বিঘা-প্রতি।০ হিসাবে চাঁদা তুলিয়া ২০০০৲ টাকা সংগ্রহ করেন। এই টাকা তমলুক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে জমা থাকে, কিন্তু সেচ-বিভাগের অনুমতির অভাবে কার্য্যটি সম্পন্ন হইতে পারে নাই।

এ বৎসর জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন বোর্ড এবং পল্লীমঙ্গল-সমিতির সভ্যগণের আহ্বানে পূর্ব্বাহ্নথা শীতলা-মাঠে এ অঞ্চলের প্রজাগণ মিলিত হন। সভায় সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, নিজেদের পায়ে ভর করিয়া না দাঁড়াইলে কোন কাজই হইতে পারে না। সভায় স্থির হয় যে, কেবল শ্রীরামপুর ইউনিয়নের ১৭খানি গ্রামের অধিবাসীর মিলিত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে শ্রীরামপুর-স্কুল হইতে গৌরমোহিনীর হাট পর্য্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে চার মাইল খালটির সংস্কার করা হইবে। স্থির হয়, যাহারা এইভাবে স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করিয়া খালটির সংস্কার করিবে, তাহাদের জন্য একবেলা অন্নাহারের ব্যবস্থা করা হইবে।

অতঃপর গ্রামে গ্রামে প্রচারকার্য্য চলিতে থাকে। শ্রমিকগণের আহারের জন্য উক্ত ১১টি গ্রামের জমিদার-গণের নিকট হইতে ২০০/০ মণ চাউল সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণও সানন্দে ১০০/০ মণ চাউল এই কার্য্যের জন্য দান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন।

১৩৪৪ সালের ২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ ১৯৩৮) প্রাতে খাল-সংস্কার আরম্ভ করা হয়। কর্ম্মিগণকে উৎসাহিত করিতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক প্রথম কোদাল ধরিলেন। তমলুকের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সার্কেল অফিসার উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই সঙ্কল্পিত সাড়ে চার মাইল খালের সংস্কার হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার পশ্চিম পার্শ্বে একটি প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইল। ১১ খানি গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসী ৮ দিন করিয়া কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা এই কার্য্যকে অত্যন্ত সহজে সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

এই সংস্কার-কার্য্যে সর্ব্বসমেত ৯৮৭৮ জন স্বেচ্ছা-শ্রমিক ব্যাপৃত ছিল। তাহাদের আহার ইত্যাদিতে মোট ৮৫৬৭৷৷০ ব্যয় করা হইয়াছে। মোট ৩২,৭২,৩৭৫ ঘন-ফুট মাটি কাটা হইয়াছে। এই কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিতে শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র সামন্ত, শ্রীরামপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এবং উক্ত বোর্ডের সভ্য শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দিন্তা যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন।

গত ৬ই মে তারিখে আমাদের সুহৃদয় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ বি.আর. সেন, আই.সি.এস্.—এই কার্য্যটি পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ৮ই মে তারিখে তেরোপেখ্যা ডাক-বাংলাতে কাঁসাই ডিভিশনের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ইঞ্জিনীয়ার, তমলুকের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিকে লইয়া যে আলোচনা করেন, তাহার ফলে স্থির হইয়াছে যে আগামী বৎসর এইরূপ প্রণালীতে হাস্নুয়াখালি খালের অবশিষ্ট অংশ এবং গঙ্গাখালি খালের খারাপ অংশটির সংস্কার করা হইবে। আগামী অক্টোবর মাসে পূর্ব্ব-কোলার স্কুলটিকে বড় করার জন্য সেখানে ইট ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হইবে। *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর
সম্পাদক, ড্রেনেজ কমিটি, শ্রীরামপুর

শ্যামগঞ্জে পল্লী-উন্নয়ন

গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে চন্দ্রকোণার সার্কেল অফিসার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন সিংহ শ্যামগঞ্জ পরিদর্শন করিয়া আমাদের সঙ্গে গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেদিন তিনি চলিয়া গেলেও আমাদের মধ্যে এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। উৎসাহের অপেক্ষা নিরুৎসাহের বাণী বেশী শোনা গিয়াছিল; অনেকে অনেক রকম সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই দিন হইতে আমরা কয়েকজন ভাবিতেছিলাম—আমাদের গ্রামের উন্নতি কিসে সম্ভব হইতে পারে। আমাদের অভাব অনেক। গ্রামে ঢুকিবার জন্য লোকাল বোর্ডের যে রাস্তা আছে তাহাতে বহু বৎসর মাটি পড়ে নাই; ফলে, উহা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে একটিও কূপ বা নলকূপ নাই; পুষ্করিণীর দূষিত জল পান করিয়া লোকে পেটের পীড়ায় কষ্ট পায়। অসংখ্য খানা-ডোবা মশার সৃষ্টি করিতেছে। চারিদিকে মনসা-কাঁটার জঙ্গল; রাত্রে সাপের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। গ্রামের ভিতরের রাস্তা দিয়া বর্ষার সময় যাতায়াতের কষ্ট; অনবরত জল ও কাদার মধ্য দিয়া চলিয়া সর্দ্দি ও জ্বরে অধিকাংশ লোক ভুগিয়া থাকে। দরিদ্র গ্রামবাসী এক ফোঁটা ঔষধ পায় না। জমিতেও পূর্ব্বের মত ফসল হয় না। সকলের

* 'পল্লী-শ্রী'র প্রথম সংখ্যায় হাস্নুয়াখালি খাল সংস্কারের যে বিবরণটি দেওয়া হয়েছে, সেটি পড়ে অনেকেই এই কাজটির বিস্তারিত পরিচয় পাবার জন্য আগ্রহ দেখিয়াছেন। আমাদের অনুরোধে শ্রীরামপুর ড্রেনেজ কমিটির সম্পাদক এই বিবরণটি পাঠিয়েছেন। হাস্নুয়াখালি খাল-সংস্কারের কাজে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সুরেন্দ্রবাবু তাঁদেরই অন্যতম। তাঁদের সকলের চেষ্টা সার্থক হোক।—সম্পাদক, 'পল্লী-শ্রী'

উপর অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, গ্রাম্য দলাদলি—সমস্ত মিলিয়া গ্রামের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে। আমরা ভাবিতে লাগিলাম—এত বড় সমস্যার সত্যই কি সমাধান হইতে পারে? আমাদের অর্থ কোথায়?

অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে পুনরায় সার্কেল অফিসার মহোদয়ের সম্মুখে গ্রামের সকলে মিলিত হয়। পল্লীর উন্নতির জন্য আমাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে কোন কাজই হইতে পারে না—এ কথা গ্রামের সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সেই সন্ধ্যায় শ্যামগঞ্জের পল্লীবাসী সঙ্কল্প করিল—নিজের হাতে পল্লীর সেবা করিবে, পল্লীর উন্নতির জন্য ভেদাভেদ্ ভুলিয়া সকলেই পরিশ্রম করিবে। সঙ্গে সঙ্গে কমিটি গঠিত হইল। গ্রামের সমস্ত কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে পনেরোটি ক্ষুদ্র দলে ভাগ করিয়া প্রতি দলে পাঁচ জন করিয়া কর্ম্মী রাখা হইল। স্থির হইল যে, দলগুলি পালা করিয়া কার্য্য করিবে। সেদিন যে কর্ম্ম-তালিকা আমরা স্থির করিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে—

(ক) অবৈতনিক নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন।
(খ) দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা।
(গ) জঙ্গল পরিষ্কার, খানা ও ডোবা ভরাট করা।
(ঘ) রাস্তা নির্ম্মাণ।
(ঙ) পুষ্করিণীর সংস্কার এবং জলপানের জন্য পুষ্করিণী 'রিজার্ভ' করা।
(চ) বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বাসগৃহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে উপদেশ দেওয়া।
(ছ) বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে শাক্-সব্জী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এবং কৃষির উন্নতি করা।
(জ) ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ তৈয়ারি করা।

নভেম্বর মাসের প্রথমেই কার্য্য আরম্ভ হয়। আমাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য ১৯ নভেম্বর তারিখে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় আমাদের গ্রামে আসিলেন। ইতিমধ্যে নিম্ন-প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে এবং কয়েকটি পুষ্করিণী সংস্কার করা হইয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণও আরম্ভ করা হইয়াছে।

এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত আমরা কি করিতে পারিয়াছি, তাহার মোটামুটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) ৪টি নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে; ৩টি ছয় হাত চওড়া ও একটি ৩ হাত চওড়া;—মোট দৈর্ঘ্য ৮০০ গজ।

(২) গ্রামের মধ্যস্থলে যে বৃহৎ পুষ্করিণী কচুরি-পানা, পদ্মবন ও নানারূপ জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া বিশেষ অস্বাস্থ্যকর হইয়াছিল, তাহার জল বাহির করিয়া দিয়া পুনরায় খনন করা হইয়াছে। সেই মাটিতে ২৫টি ছোট বড় ডোবা ভরাট করা হইয়াছে। এই পুষ্করিণী পানীয় জলের জন্য 'রিজার্ভ' করা হইবে।

(৩) ৫।৬ কাঠা পরিমিত স্থানে মাটি ফেলিয়া খেলিবার ও বেড়াইবার 'পার্ক' প্রস্তুত হইয়াছে।

(৪) ৯টি বৃহৎ পুষ্করিণীর সংস্কার করা হইয়াছে। দুইটি বড় ডোবা বহু দিন অসংস্কৃত থাকায় তাহার জল হইয়াছিল কালো আল্‌কাতুরার মত। দুর্গন্ধে সেদিক দিয়া যাতায়াত করা অসম্ভব হইয়াছিল। সে দুইটি ডোবার জল বাহির করিয়া পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে এবং সেই পঙ্ক জমির সাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ডোবা দুইটি খনন করিতে যে মাটি উঠিয়াছিল, তাহার দ্বারা অন্য দুইটি ডোবা ও ১২টি ছোট বড় খানা ভরাট করা হইয়াছে এবং একটি রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৫) ৮ একর জমির জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে।

(৬) দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে।

(৭) সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে ৫/০ মণ উৎকৃষ্ট ধান্যের বীজ আনাইয়া উৎসাহী চাষিগণকে বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৮) ২০ গ্যালন 'ম্যালেরিওল' কিনিয়া রাখা হইয়াছে; যথাসময়ে ইহা ব্যবহার করা হইবে।

(৯) সাধারণের মধ্যে নূতন চাষের প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন খাঁ সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে নানা প্রকার ধান, চিনাবাদাম, ধৈঞ্চা ও নেপিয়ার ঘাসের বীজ আনাইয়াছেন।

(১০) গ্রামে ঢুকিবার লোকাল বোর্ডের রাস্তায় আগাগোড়া মাটি পড়িয়াছে।

গো-জাতির উন্নতির জন্য এই জেলায় যে চেষ্টা হইতেছে, সেই পরিকল্পনায় আমাদের গ্রাম স্থান পাইয়াছে। সরকারী সাহায্যে এ জন্য যে সুন্দর ষাঁড়টি পাওয়া গিয়াছে তাহার যাবতীয় ব্যয়-ভার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন খাঁ বহন করিতেছেন। গ্রামে যতগুলি অকর্ম্মণ্য ও নিকৃষ্ট ষাঁড় ছিল, সবগুলিকে দামড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লোকাল বোর্ড আমাদের গ্রামে একটি কূপ খনন করিতেছেন। ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকাল্চারাল অফিসার আমাদের গ্রামের জমি পরীক্ষা করিয়া কোন্ কোন্ ফসল সহজে উৎপন্ন হইতে পারে তাহার উপদেশ দিতেছেন। জেলার হেল্থ অফিসার, স্যানিটারি ইন্সপেক্টার আমাদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন খাঁ দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম ও ঔষধ কিনিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত হরিহর হালদার বিনা পারিশ্রমিকে অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য চিকিৎসালয়ের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

পল্লী-উন্নয়নের কার্য্যে আমাদের বড় লাভ হইয়াছে এই যে, আমরা দলাদলি ভুলিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য মিলিত হইতে পারিয়াছি। আমরা হাতে-কলমে কাজ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি—নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইলে ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করা যায়।

আমরা শীঘ্রই একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিব। সাধারণের শিক্ষার প্রসারের জন্য গ্রামে একটি পাঠাগার স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। *

শ্রীহরিহর হালদার
শ্রীচিত্তরঞ্জন খাঁ
শ্যামগঞ্জ পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির সম্পাদক।

খেলা-ধূলা

মেদিনীপুর জেলার অনেক পল্লীতে উৎসাহী যুবকেরা খেলা-ধূলার উদ্যোগ আয়োজন করছেন। কয়েকটি পল্লী-মঙ্গল-সমিতি খেলার মাঠ তৈরি করছেন। স্কুলের ছেলেরাও নিয়মমত দৌড়স্কাঁপ, সাঁতার, হা-ডু-ডু, ফুটবল, বাস্কেট্‌বল, ভলিবল ইত্যাদি খেলায় যোগ দিচ্ছে। এ সব সত্বেও স্বীকার করতে হয় এখনও প্রয়োজনের অনুপাতে আয়োজনের অনেক বাকি। খেলা-ধূলার বিষয়ে কতক-গুলি লেখা প্রতি মাসে এই কাগজে বার করা হবে। কি প্রণালীতে এই সমস্ত খেলার পরিচালনা করা উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা থাকবে।

স্বাস্থ্য জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে হঠাৎ কোন রোগ এসে শরীরকে বিপর্য্যস্ত করতে পারে না। খোলা হাওয়ায় নিয়মিত খেলা-ধূলার চর্চ্চা করলে এই স্বাস্থ্যের বিকাশ হয়। শরীর-চর্চ্চা ও খেলা-ধূলার ফলে মানুষের জীবনী ও কাজ করবার শক্তি বাড়তে থাকে। শরীরের সঙ্গে মনেরও বিকাশ হয়। খেলার ভিতর দিয়ে মানুষ যে সব গুণ আয়ত্ত করতে পারে, সেগুলি হচ্ছে—তৎপরতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিচারবুদ্ধি এবং একাগ্রতা। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হ'তে হ'লে এই সমস্ত গুণ না থাকলে চলে না। আবার দলবদ্ধ হয়ে খেলার ভিতরে আনন্দ আছে অনেক। এতে সহজে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যে ক্রীড়া-কৌতুক প্রচলিত ছিল ধীরে ধীরে সেগুলিকে ফিরিয়ে আনবার সময় এসেছে। এই মেদিনীপুর জেলার মলিঘাটি, মালিগ্রাম প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীদের যে সব দেশীয় ক্রীড়া-কৌতুক দেখতে পাওয়া গেছে, তার সহজ-আনন্দ ভোলবার নয়। গ্রামে গ্রামে এইরকম সহজ ও সরল খেলা-ধূলার ভিতর দিয়ে দেহকে দৃঢ় ও নীরোগ করবার চেষ্টা ফুটে উঠুক।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কথাও যেন ভোলা না হয়। স্কুলে যে সব মেয়েরা পড়ছে, তাদের জন্য সহজ খেলা-ধূলার ব্যবস্থা করা দরকার। তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশে ত্রুটি থাকলে সেটা ভবিষ্যতের জাতির পক্ষে শুভ হবে না।

* গত মে মাসে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস্, শ্যামগঞ্জ পরিদর্শন করেন। এই রিপোর্টটি সে সময় পড়া হয়েছিল। পল্লীবাসীর মিলিত চেষ্টার ফলে অল্প কয় মাসের মধ্যে গ্রামগঞ্জের চেহারা যে ভাবে বদলে গেছে, তা দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। সেখানকার পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির উৎসাহী সম্পাদক তাঁর রিপোর্টের ভিতর সমিতি তৈরি হবার গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে কাজের পদ্ধতিটুকু সুন্দরভাবে বলেছেন। এই কর্ম্মপ্রেরণার আদর্শ সকল গ্রামে জেগে উঠুক। সম্পাদক, "পল্লী-শ্রী"

সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দত্ত
মেদিনীপুর লক্ষ্মী প্রেস হইতে শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/৫, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পল্লী-শ্রী

১ম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৪৫ [৩য় সংখ্যা

গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা

১৯৩১ সালে যে সেন্সস্ (Census) হয়েছিল তার হিসাবে বাংলা দেশের পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা মাত্র দশ এগারো জনের অক্ষর-পরিচয় আছে, বাকি প্রায় নব্বই জনের কোন শিক্ষাই হয় নি। যাদের অক্ষর-পরিচয় হয়েছে, তাদের মধ্যে সবাই যে শিক্ষিত হতে পেরেছেন, এ কথাও জোর করে বলা যায় না। এই থেকে বোঝা যাবে আমাদের দেশে সাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার সমস্যা কত বড়। অথচ এই সমস্যার সমাধানের ওপর আমাদের জাতীয় জীবনের স্থায়ী উন্নতি নির্ভর করছে। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক—যে কোন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হলে প্রথমে দেখতে হয় তাতে জনসাধারণের সহানুভূতি আছে কি না। কিন্তু যতক্ষণ জনসাধারণ সমাজের, রাষ্ট্রের, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের সাধারণ সমস্যাগুলি বুঝতে না পারবে, যে পর্য্যন্ত তাদের মনে পৌর-কর্ত্তব্যবোধ জেগে না উঠবে, ততক্ষণ তাদের সহানুভূতি বা সহযোগিতা আশা করা ভুল। দেশের এই অভাব কেবল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা মেটানো যায় না। প্রত্যেক লোককে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে পারলেও অন্ততঃ পঁচিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে, নইলে সবাইকে শিক্ষিত দেখা যাবে না।

প্রাচীনকালের দিকে ফিরে চাইলে আমরা দেখতে পাই—যাতে সাধারণের মন ও বুদ্ধির সংস্কার হয়, সেরূপ ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল। তখন প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ভার ছিল যাত্রাওয়ালা, কথক ও গায়কের হাতে। যাত্রা, পাঁচালী, পীরের গান, কথকতা—এ সবের সাহায্যেই তখনকার লোকে শিক্ষালাভ করেছিল। কিন্তু প্রাচীন সামাজিক জীবনের এই সমস্ত সহজ ও সুন্দর ব্যবস্থা ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে। এখন নূতন করে সময়ের উপযোগী ব্যবস্থা করতে হবে, আর এ গুরুভার দেশের লোককেই বইতে হবে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এই যে অভিযান সুরু করা হবে—একে বিশেষভাবে সাহায্য করবে—গ্রন্থাগার।

দেশের উন্নতির জন্য যে ব্যবস্থাই করা হোক, সর্ব্বপ্রথম আমাদের মনে করতে হবে পল্লীর কথা। আশার কথা, এখন চারিদিকে পল্লী-সংস্কারের সাড়া পড়েছে, সেই সঙ্গে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য গ্রন্থাগার-আন্দোলন সুরু হয়েছে।

এ বছর মার্চ মাসে মেদিনীপুরে গ্রন্থাগার-সম্মিলন হয়েছিল। তখন জানা গেছল, এ জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা মোট ৪৩টি। এর মধ্যে ৯টি লাইব্রেরিতে সাধারণকে বিনা চাঁদায় পড়তে দেওয়া হয়। কিন্তু তার পর থেকে পল্লী-মঙ্গল-সমিতিগুলির উৎসাহে ও চেষ্টায় অনেক গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এখনও অনেক জায়গায় এই রকম গ্রন্থাগার স্থাপনের চেষ্টা চলছে। যে সব গ্রামে নূতন লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে তাদের নাম নীচে দেওয়া গেল—

আঙ্গুয়া	(দাঁতন থানা)
আমলাগুড়া	(গড়বেতা থানা)
মাণিকপাড়া	(ঝাড়গ্রাম থানা)
গোপালপুর	(ডেবরা থানা)
বাথুয়াড়ি	(এগরা থানা)
কসবা	(এগরা থানা)
দুম্মুঠ	(কাঁথিথানা)
দোহিজুড়ি	(বিনপুর থানা)
বালিসাহি	(রামনগর থানা)

নরঘাট	(তমলুক মহকুমা)
পাঁশকুড়া	(তমলুক মহকুমা)

এগুলি ছাড়া, গড়বেতা, বালিচক ও লোয়াদা গ্রামের লাইব্রেরিগুলির সংস্কার করা হয়েছে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট—আঙ্গুয়া, গোপালপুর, মুগবেড়িয়া ও কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে একশো করে টাকার বই উপহার দিয়েছেন। মেদিনীপুর শহরের বহুপুরাতন সাধারণ পাঠাগারের (Midnapore Public Library) ছেলেদের জন্য পৃথক বিভাগ খোলা হয়েছে। এর জন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ১৭০ টাকার শিশু-সাহিত্য উপহার দিয়েছেন।

নিরক্ষরতা দূর করার জন্য এ জেলায় চলন্ত পাঠাগার (Circulating Library) প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক মহকুমায় বাক্স-বন্দি করে বই পাঠান হবে; সেই সমস্ত বাক্স গ্রামে গ্রামে নিয়ে গিয়ে তা থেকে বই পড়ে সকলকে শোনান হবে। গ্রামের আটচালায় বা চণ্ডী-মণ্ডপে বা আর কোন সুবিধামত জায়গায় সকলে জড়ো হবেন, সেখানে গ্রামের স্কুলের শিক্ষক বা পল্লী-মঙ্গল-সমিতির সভ্যগণ বইগুলি পড়ে শোনাবেন। এক মাস পরে, বাক্সের বই বদলে দেওয়া হবে। এই চলন্ত পাঠাগারের জন্য ১২০টি বাক্স তৈরি করা হবে। মেদিনীপুরের জেলা-বোর্ড পল্লী-উন্নয়নের সাহায্যে ২৫,০০০৲ দান করেছেন। তাই থেকে ১৬,৫০০৲ চলন্ত পাঠাগারের জন্য পাঁচ বছরে খরচ করা হবে।

পাঠাগার পরিচালনায় যে কথা মনে রাখতে হয় সেই কথা এবার বলব। দোকানে যেমন বই সাজান থাকে, সেই রকম বই সাজিয়ে রাখা পাঠাগারের উদ্দেশ্য নয়। জনসাধারণকে পাঠাগারে নিয়ে আসতে হবে; তাদের বই পড়ে শোনাতে হবে। পাঠকের রুচিগঠনে সাহায্য করা এবং শ্রোতার মন ও বুদ্ধির সংস্কার করাই পাঠাগারের সার্থকতা। সেজন্য কেবল উপন্যাস বা গল্পের বইয়ের দিকে না ঝুঁকে—ইতিহাস, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী, কৃষি ও শিল্প এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত বই পাঠাগারে সংগ্রহ করতে হয়। এই সমস্ত বইয়ের পাঠকের সংখ্যা যাতে বাড়ে, তার জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং এই সমস্ত বই সাধারণকে জড়ো করে পড়ে শোনান উচিত।

স্কুল-কলেজে মানুষ যে শিক্ষা পায় তার সীমা আছে; নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে সে শিক্ষা পেতে হয়। কিন্তু গ্রন্থাগার থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে পাঠাগারকে জীবন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়তে হবে। নিরক্ষরতা দূর করবার আগ্রহ নিয়ে পাঠাগারকে ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিতভাবে যাঁরা চাঁদা দেবেন, তাঁদের বই জোগান যেমন পাঠাগারের কাজ, তেমনি যারা বাইরে আছে তাদের কাছে গিয়ে, তাদের জড়ো করে নিয়মিতভাবে বই পড়ে শোনাবার ব্যবস্থা না থাকলে পাঠাগার-প্রতিষ্ঠার সার্থকতা থাকবে না। মেদিনীপুর জেলায় চলন্ত পাঠাগারের প্রতিষ্ঠার সময় এই কথাগুলিই আমাদের মনে রাখা উচিত।

বিদ্যাসাগর-তর্পণ

গত ১৩ই শ্রাবণ ঘাটাল মহকুমার এলাকায় বীরসিংহ গ্রামে পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান হয়েছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন। অনুষ্ঠান-সভায় এবার বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস., মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় সাহেব দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, মেদিনীপুর-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সভ্যগণ, এই অনুষ্ঠানে যোগ

দিয়েছিলেন। মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বঙ্কিমদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রকে নিয়ে সভায় যোগ দিয়েছিলেন। মেদিনীপুর কলিজিয়েট ও টাউন স্কুল থেকেও শিক্ষক ও ছাত্র বীরসিংহে তীর্থ-যাত্রার সুযোগ ছাড়েন নি। ঘাটাল মহকুমার বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় কতকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা পড়া হয়। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রায় সাহেব দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত পঞ্চানন রায় বক্তৃতা করেন। সভাপতির অভিভাষণ বড়ই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। আমরা সেই সুচিন্তিত অভিভাষণ থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের স্বতন্ত্রতা, তেজস্বিতা এবং ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করে সভাপতি বলেন—

"প্রতিভার সহিত, সাহিত্য-বুদ্ধির সহিত এই অসাধারণ চারিত্রিক তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্ব যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাসে'ই তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ নয়; বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ চেষ্টা এবং বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনের বিরাট কীর্ত্তিও তাঁহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় নয়; মধুসূদন-কথিত দয়ার সাগর ও বাঙালী মায়ের স্নেহ-বাৎসল্যের অধিকারী বিদ্যাসাগরও ঈশ্বরচন্দ্রের সংক্ষিপ্ততম বিশেষণ—এ সকল গুণ মিলাইয়া তিনি এ সকলের অনেক ঊর্দ্ধে ছিলেন; এই নিরন্তপাদপ এরণ্ডের দেশে তিনি একক ন্যগ্রোধ-মহিমায় বিরাজিত ছিলেন; শাখাপ্রশাখা সম্বলিত বটবৃক্ষের বিশালতায় সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে আপনাকে উৎসারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাটত্বের পরিমাপ করিতে পারে এমন সমসাময়িক প্রতিভাও কেহ ছিল না। আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে দূর হইতে আমরা তাঁহাকে তাঁহার সম্পূর্ণ মহিমায় প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, এই অঘটন কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল! পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের সন্তান কোন্ প্রতিভাবলে এমন জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জ্জন করিলেন, যাহাতে সমসাময়িক সকল সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না, দৃঢ়হস্তে সকল বাধা অপসারিত করিতে অগ্রসর হইলেন। পাঠ্যপুস্তক ছিল না, পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে বসিলেন, দিকে দিকে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জাতীয় উন্নতির মূল দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্তঃপুরে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের কাজে অগ্রণী হইলেন! এই সংস্কারমুক্ততা, এই সাহস এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর এই নির্ভরশীলতা তাঁহার মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল! তাঁহার পারিবারিক ইতিহাসের মধ্যে—রামজয়-ঠাকুরদাস-ভগবতীর মধ্যে, মেদিনীপুর বীরসিংহের মধ্যে অথবা সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে এই সমস্যার সমাধান নাই। বাংলা দেশের সকল অভাবনীয়ের মত ১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন, (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০) মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব আকস্মিক; আমরা সৌভাগ্যবান্ যে এই আকস্মিকতার ফলভোগ আজিও করিতেছি।

* * *

"নিজের রচনা ছাড়াও অপরকে বাংলা সাহিত্যের সাধনায় উৎসাহিত করিয়াও তিনি বঙ্গবীণাপাণির ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন; অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুসূদন দত্তের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অযাচিত উৎসাহ কতখানি কাজ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' 'সর্ব্বশুভকরী' প্রভৃতি বাংলা সাময়িক-পত্র তাঁহার সর্ব্ববিধ পোষকতা লাভ করিয়াছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনিই প্রথমে 'সোমপ্রকাশ' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতাও সর্ব্বজনবিদিত। সাহিত্য, সমাজ ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে উনবিংশ শতাব্দীতে অপর কোনও এক ব্যক্তিকে এতখানি পরিশ্রম করিতে দেখা যায় নাই।

"বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেকালের পণ্ডিতকুলের অগ্রগণ্য হইলেও তাঁহার মত প্রগতিশীল আধুনিক মন লইয়া কেহ সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী হন নাই। তিনি নিয়মনিষ্ঠা ভালবাসিতেন, ইংরেজী শিক্ষার পোষকতা করিতেন, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেই বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করিতে ভীত হন নাই; বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন; বহুবিবাহ সমর্থন করিতে পারেন

নাই। যে তত্ত্ববোধিনী সভাকে সেকালের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধু সৎপরামর্শ নয়, নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিয়া সেই সভার পোষকতা করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়-সাধনে নবীনকে প্রাধান্য দিয়া তিনি যে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে সমগ্র রক্ষণশীল সমাজের নিকট নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছে; ভূদেব তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাহাতেও টলেন নাই। কারণ, বিদ্যাসাগরের সকল সংস্কারের মূলে শুধু যুক্তিই ছিল না—প্রেমও ছিল। এই প্রেমই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব।"

এই মহাপুরুষের স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া সভাপতি বলেন—

"গত বৎসর পর্য্যন্ত যাঁহারা এই সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অন্ধকারে পথ চলিতে হইয়াছে; অতীতের স্মৃতিমাত্র তাঁহাদের সম্বল ছিল, ভবিষ্যৎ আশার ক্ষীণালোকও তাঁহারা দেখিতে পান নাই। বীরসিংহের পথঘাট কর্দ্দমাক্ত ও দুর্গম ছিল; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি—নাম ও একটি স্তম্ভে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং কিছুদিন পরে সে নামও হয়তো আর থাকিত না। কিন্তু বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির উদ্যোগে এবং বিশেষ করিয়া ঝাড়গ্রামের কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর ও আপনাদের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উৎসাহে আজ আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে, তাঁহার সম্পূর্ণ লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় গ্রন্থাবলীর একটি শোভন সংস্করণ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা পুনরায় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছেন, মেদিনীপুর শহরে তাঁহার সুবৃহৎ স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে এবং আমরা বরাবর সদ্যনির্ম্মিত পাকা সড়ক ধরিয়া তাঁহাকে বিনা আয়াসে পূজা দিতে আসিতে পারিয়াছি।"

সভাপতির অভিভাষণ শেষ হলে সকলে বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সমবেত হন এবং তাঁর স্মৃতি-স্তম্ভে পুজার অর্ঘ্য নিবেদন করেন। তারপর সকলে বিদ্যাসাগরের গৃহ প্রদক্ষিণ করেন।

বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ চূড়বর্ত্তী এই অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সেদিন অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, দরিদ্রনারায়ণের ভোজন দেখবার জিনিস হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংস্করণ-সমিতি এই অল্প সময়ের মধ্যে যে কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, মুক্তকণ্ঠে তার প্রশংসা করতে হয়। সমিতির চেষ্টায় ও মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের সাহায্যে খরার থেকে বীরসিংহ পর্য্যন্ত রাস্তাটি আগাগোড়া পাকা করা হয়েছে। জেলা-বোর্ড এজন্য প্রায় ৫,০০০৲ ব্যয় করেছেন। 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী'র "সাহিত্য"-খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, শীঘ্রই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হবে। মেদিনীপুরে স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের জন্য প্রায় ৩০,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। শীঘ্রই এই স্মৃতি-সৌধের ভিত্তি-স্থাপন করা হবে। বীরসিংহে বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরির জন্য শীঘ্রই ঘর তোলা হবে। যাঁদের অকাতর দানে এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হতে চলেছে তাঁদের ভিতর মহিষাদলের রাণী নলিনী দেবী ও কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ, ঝাড়গ্রামের কুমার নরসিংহ মল্লদেব, মেদিনীপুর জেলা-বোর্ড ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার রজত-জয়ন্তী-পরিচালনা-সমিতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাঁথির জলনিকাশ সমস্যা

মহকুমা-আদালতে পরামর্শ-সভা

গত ১০ই জুলাই, মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. কাঁথি মহকুমা-আদালতে মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট (মিঃ এস. এন. মিত্র, আই. সি. এস.), পূর্ত্তবিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (মিঃ এম. কে. ভট্টাচার্য্য), বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাল ও শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি এবং ভূতনাথ পড়্যা প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের সহিত কাঁথি মহকুমার জলনিকাশ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় মহকুমার নিম্নভূমিতে প্রতি বৎসর বৃষ্টির জল জমিয়া যে অসুবিধার সৃষ্টি করে, কি ভাবে তাহা দূর করিয়া জলনিকাশের সুব্যবস্থা করা যায় সে সম্বন্ধে সভায় আলোচনা হইয়াছিল। পূর্ত্তবিভাগ পানিপিয়া অববাহিকা (Basin), রামনগর-সাপুয়া ও কালিঘাই নালার জলনিকাশের জন্য যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাও আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নের সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) বন্যার সময় জলনিকাশের জন্য হিজলী টাইডাল কেনেলের উভয় পার্শ্বস্থিত বাঁধ কাটিবার অধিকার গ্রামবাসীকে দেওয়া হইবে; কোথায় কোথায় এরূপ বাঁধ কাটা সম্ভব হইবে, তাহা পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারীগণের সহিত পূর্ব্ব হইতে পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে; বাঁধ কাটা ও পুনরায় বন্ধ করার জন্য গ্রামবাসীকে লইয়া কমিটি গঠিত হইবে এবং এই কমিটি পূর্ত্তবিভাগের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া টাকা জমা রাখিবেন।

(২) আবশ্যক হইলে, গ্রামবাসীগণ জলনিকাশের জন্য পরিত্যক্ত বাঁধ কাটিতে পারিবে এবং জল আসা বন্ধ করার জন্য পরিত্যক্ত স্লুইস(sluice)গুলি বন্ধ করিতে পারিবে।

(৩) আগামী শীতকালে রামনগর-সাপুয়া পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা হইবে। ১৯২০ সালের ৬ আইন মতে এই কার্য্যটি সাধিত হইবে। রামনগর রাস্তার পুলের নীচে যেখান দিয়া খালটি বহিয়া গিয়াছে, সেইখানে একটি কবাট করিবার জন্য জেলা-বোর্ডকে অনুরোধ করা হইবে।

(৪) লাঙ্গলকোটা ও শিউলীপুরের মধ্যবর্ত্তী কালিঘাই নদীকে প্রশস্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং এই কার্য্যের জন্য যে সকল জমি লওয়া প্রয়োজন তাহার চকদার ও অন্যান্য স্বার্থসংযুক্ত ব্যক্তিগণকে আপোষে জমি ছাড়িয়া দিতে রাজি করাইতে হইবে। এ কার্য্যটিও আগামী শীতকালে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) পানিপিয়া অববাহিকার জলনিকাশী পরিকল্পনাকেও কার্য্যে পরিণত করা স্থির হয়। দুবদা ও কাঁথি অববাহিকার জলনিকাশ পানিপিয়া খালের দ্বারা সম্ভব কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান করাও স্থির হয়। ইহা সম্ভব হইলে, পানিপিয়া খালকে আরও বিস্তৃত করা যাইবে এবং বর্ত্তমান পরিকল্পনায় সমুদ্রের বাঁধের উপর যে স্লুইস নির্ম্মাণ করার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অতিরিক্ত কবাট সংযুক্ত করা হইবে। এই সকল অনুসন্ধানের জন্য বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যারম্ভ স্থগিত রাখা হইবে না।

পানিপিয়া অববাহিকার জলনিকাশী পরিকল্পনা সম্বন্ধে উন্নয়ন আইন (Development Act) প্রয়োগ করা যাইবে কি না তাহার আলোচনা হইয়াছিল এবং উক্ত আইন ও তাহার ধারাগুলি সভায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই আইন কত দূর প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে গভর্নমেণ্ট ও জনসাধারণ ভাল করিয়া বিবেচনা করিবেন।

তমলুকে জলনিকাশী সভা

গত ১৭ই জুলাই তমলুক লোক্যাল বোর্ডের সভাগৃহে মহকুমার জলনিকাশ সমস্যার আলোচনার জন্য এক পরামর্শ-সভা হইয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তমলুকের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. কে. আচার্য্য, আই. সি. এস., পূর্ত্তবিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এম. কে. ভট্টাচার্য্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য খান বহাদুর আলফাজুদ্দীন আহম্মদ ও ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক, তমলুক লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সরকার, ময়না-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর, এবং পাশকুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সামন্ত রায় ও এন. কে. দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মহকুমার নিম্নভূমিতে জলনিকাশের ব্যবস্থার অভাবে বৎসরের পর বৎসর বর্ষার জল জমায় যে অসুবিধা হইতেছে, তাহা দূর করিয়া কি ভাবে জলনিকাশের সুব্যবস্থা করা যায়, সে সম্বন্ধে সভায় আলোচনা হইয়াছিল। সোয়াদিঘি গঙ্গাখালি, ১৩নং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ১৪নং ভুদ্দা, কসাই ও ক্ষীরাই এবং বক্সী খালের অন্তর্ব্বর্ত্তী ১৩নং ইউনিয়নের জলনিকাশ এবং পাশকুড়া থানার অন্তর্গত টোপা বেসিনের জলনিকাশ সম্বন্ধে পূর্ত্তবিভাগ যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাও সভায় আলোচিত হইয়াছে।

(ক) সোয়াদিঘি গঙ্গাখালি

এ বিষয়ে গভর্নমেণ্ট প্রথমে ১৯১৯ সালে ৫,৩৫,০০০ টাকার এক পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। গভর্নমেণ্ট এই কার্য্যের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন এবং ১৯২০-২১ সালে এজন্য ৫০,০০৫ টাকা বরাদ্দ করেন। হঠাৎ মালমসলা ও সরঞ্জামের দর বাড়িয়া যাওয়ায়, সমস্ত এষ্টিমেটটির কোনরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব কি না, তাহার পরীক্ষা করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় যে অঞ্চলের জলনিকাশের ব্যবস্থা ছিল, তাহারও পরিবর্ত্তন করিয়া বিস্তৃততর ভূভাগের জলনিকাশের জন্য এষ্টিমেট প্রস্তুত করা হয়। পরিশেষে যে পরিকল্পনা করা হয় তাহার জন্য ব্যয়ের হিসাব ছিল নয় লক্ষ টাকা। এই পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত সংস্কার-কার্য্যের ব্যবস্থা ছিল—

(১) জয়গোপাল, সোয়াদিঘি ও গঙ্গাখালি খালের মাটি কাটিয়া সংস্কার করা,

(২) কাল্লা খালের সংস্কার করিয়া ২৫ বর্গ মাইল বিস্তৃত শঙ্করা-(উপর)-বেসিনের সঙ্গে গঙ্গাখালি খালের সংযোগ সাধন করা,

(৩) গঙ্গাখালি ও সোয়াদিঘি খালের মোহানায় স্লুশ নির্ম্মাণ করা,

(৪) এই সমস্ত খালের সহিত সংযুক্ত খালগুলির সংস্কার করিয়া নিম্নভূমিগুলির সহিত জয়গোপাল, সোয়াদিঘি ও গঙ্গাখালি খালকে সংযুক্ত করা, এবং

(৫) আবশ্যকমত চলাচলের সেতু নির্ম্মাণ করা।

১৯২৯ সালে স্থির হয় যে, এই পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত কার্য্যের জন্য গভর্নমেণ্ট আবশ্যক অর্থ অগ্রিম দিবেন এবং কার্য্য শেষ হইলে উপকৃত প্রজার নিকট হইতে এই টাকা আদায় করা হইবে। ১৯৩০ সালে এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করা হয়, কিন্তু শেষে অর্থাভাবে পরিত্যক্ত হয়।

এই কার্য্যটি কি ভাবে সম্পন্ন করা যায়, সে সম্বন্ধে সভাপতি তিনটি উপায় নির্দ্দেশ করেন—

(১) ১৯২০ সালের ৬ আইনের প্রয়োগ,

(২) ১৯৩৫ সালের উন্নয়ন আইন (Development Act) অবলম্বন,

(৩) গ্রামবাসীর স্বেচ্ছাকৃত কায়িক পরিশ্রম। চলাচলের জন্য সেতু এবং স্লুশ নির্ম্মাণ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন গভর্নমেণ্ট ও জেলা-বোর্ড তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

সভাপতি সমস্ত পরিকল্পনাটির বর্ণনা করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান হারে হিসাব করিলে এই পরিকল্পনামত মাটি কাটিতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। গ্রামবাসী যদি স্বেচ্ছায় কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা এই মাটি-কাটার কার্য্য সম্পন্ন করে,

তাহা হইলে চলাচলের সেতু ও স্লুশ নির্ম্মাণের জন্য তাহারা জেলা-বোর্ড ও গভর্নমেণ্টের নিকট অর্থসাহায্যের জন্য দাবি করিতে পারিবে। সভাপতি বলেন যে, গঙ্গাখালি ও সোয়াদিঘি খালের মোহানায় স্লুশ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ইঞ্জিনীয়ারগণের মধ্যে মতভেদ ছিল। এই স্লুশ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা যদি পরিকল্পনা হইতে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমগ্র এষ্টিমেটে আরও দুই লক্ষ টাকা কম লাগিবে। গ্রামবাসীর স্বেচ্ছাশ্রমে এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে, এষ্টিমেটে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি বসাইবার জন্য যে দেড় লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও বাদ দেওয়া যাইতে পারে। খালটিকে রক্ষা করিতে বার্ষিক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামবাসীর দ্বারা এই সংস্কার-কার্য্য সাধিত হইলে এবং জেলা-বোর্ড সেতুগুলি নির্ম্মাণ করিয়া রক্ষা করার ভার গ্রহণ করিলে এই অর্থ-ব্যয়ের হিসাবও বাদ দেওয়া যায়। সভায় স্থির হয় যে, (১) দুইটি স্লুশ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা রাখিয়া এবং (২) দুইটি স্লুশ বাদ দিয়া—১৯২৪ সালে প্রস্তুত এষ্টিমেটটি পরিবর্ত্তন করার জন্য একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে অনুরোধ করা হইবে। ১৯৩৫ সালের উন্নয়ন আইন (Development Act) অনুসারে এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিবার আবশ্যক হইলে বিঘা-প্রতি কিরূপ কর ধার্য্য হইতে পারে, তাহার হিসাব করিবার জন্য একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে অনুরোধ করা হয়। পুনরালোচনার পূর্ব্বে এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং এই কার্য্যটি সহজে সম্পন্ন করা সম্বন্ধে প্রজাগণের মতামত লওয়া স্থির হয়।

(খ) ১৩নং ইউনিয়নের ১৪নং ভুদ্দার জলনিকাশ

সভাপতি বলেন যে, ১৪নং ভুদ্দার জরিপ করার জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট ২,০০০৲ অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর বলেন যে, এই অঞ্চলের জমিদারগণ জলনিকাশের জন্য প্রতি বৎসর ২৫,০০০৲ প্রজার নিকট হইতে আদায় করেন। পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে প্রজাগণ এই বৎসরিক খরচের দায় হইতে অব্যাহতি পায়। সভাপতি মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে জমিদার ও প্রজার পাট্টা-কবুলতি পরীক্ষা করিতে বলেন এবং জমিদারগণ পূর্ত্তবিভাগের পরিকল্পনা মানিয়া লইবেন কি না তাহার অনুসন্ধান করিতে বলেন।

(গ) কসাই ও ক্ষীরাই এবং বক্সীখালের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগের জলনিকাশ

এই অঞ্চলের জলনিকাশ সম্বন্ধে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বুঝাইয়া বলেন যে, এই অঞ্চলটির উপর দিয়া বন্যার জল চলিয়া যায়। সেজন্য ইহার এক পার্শ্ব দিয়া মধ্যে মধ্যে যে বাঁধ নির্ম্মাণ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা গ্রহণ করা যায় না। তবে কতকগুলি খালের সংস্কার করিয়া এই ভূভাগের জলনিকাশের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু ইহাতে কতকগুলি নিম্নভূমির চাষ আবাদ নাও হইতে পারে, অথবা তাহাদের উপযোগী শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইতে পারে। পূর্ত্তবিভাগকে এই ভূভাগটির জরিপ করিতে বলা হয়। গভর্নমেণ্ট যাহাতে এই জরিপের ব্যয়ভার বহন করেন, সেজন্য প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণ দাবি জানাইয়াছিলেন।

(ঘ) টোপা বেসিনের জল-নিকাশ

প্রথমে যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহাতে টোপা খাল হইতে রূপনারায়ণ পর্য্যন্ত একটি নালা কাটিবার ব্যবস্থা ছিল। পরে শঙ্কর পরিকল্পনা যখন পরিবর্ত্তন করা হয় তখন কেবল জলনিকাশের ব্যবস্থা না রাখিয়া যাহাতে সমস্ত অঞ্চলকে জল-বিধৌত করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিবর্ত্তিত পরিকল্পনায় ফকিরবাজারের নিকটে কসাই নদী হইতে জল প্রবেশ করাইয়া খালিচকের নিকটে রূপনারায়ণপুরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম পরিকল্পনার জন্য ৮০,০০০ টাকায় এষ্টিমেট করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনার এষ্টিমেট ছিল ১,৭৪,০০০৲। সমস্ত খরচের এক-তৃতীয়াংশ যদি গভর্নমেণ্ট দান করেন তাহা হইলে প্রজাগণ বাকি অংশ বহন করিতে স্বীকৃত হইবে কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়; কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় গত বৎসর প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। আলোচনা সভায় সভ্যগণ এই মত প্রকাশ

করেন যে, ছোট ছোট পরিকল্পনা না করিয়া বৃহত্তর পরিকল্পনা করা হইলে অধিক অর্থব্যয় হইবে বটে, কিন্তু তাহা হইতে প্রজার অধিকতর উপকার আশা করা যায়। যাহারা আগে এই কার্য্যের জন্য বিনামূল্যে জমি ছাড়িয়া দিতে রাজি ছিল, এখন আর তাহারা সেই সকল জমির মালিক নাই। প্রস্তাবিত খালটির পরিকল্পনা কেবলমাত্র এই অঞ্চলের প্রজার উপকারের জন্যও নহে। মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য সভাপতি বলিয়া দেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত বরুণদা, কলাবেড়িয়া ও ননান্দারি খালের সংস্কারের কথা উত্থাপন করেন। তাহাতে এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বলিয়াছেন যে, আগামী শীতের সময় এই সমস্ত খালের সংস্কার করা হইবে।

কার্পাসের চাষ

শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার কার্পাস-বস্ত্র জগৎবিখ্যাত ছিল এবং এই ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর কার্পাস-বস্ত্রের অভাব পূরণ করিত। কার্পাস ভারতের অতীত সভ্যতার নিদর্শন। আমেরিকায় ইহার চাষ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন সেখানে ইহার এত উন্নতি হইয়াছে যে, জগতের চাহিদার তিন-চতুর্থাংশ কার্পাস আজকাল আমেরিকায় উৎপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে সি-আইল্যাণ্ড (Sea Island) কার্পাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ইহার আঁশ ১½ ইঞ্চি লম্বা হয়। বঙ্গদেশে এখন যে ২২টি কাপড়ের কল আছে, তাহার জন্য প্রধানতঃ আমেরিকা ও মিশর হইতে কার্পাসের আমদানি করিতে হয়; কিছু অংশ বোম্বাই হইতেও আমদানি করা হয়। যে বঙ্গদেশ একদিন সূক্ষ্ম মস্‌লিনের জন্য পৃথিবীবিখ্যাত ছিল সেই বঙ্গদেশের ভূমিতে ২২টি কাপড়ের কলের জন্য ২২ ছটাক লম্বা আঁশের কার্পাস উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না।

এই মেদিনীপুর জেলায় ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ কার্পাস চাষ দেখিতে পাওয়া যাইত। সে কার্পাস জেলার সমস্ত অধিবাসীর বস্ত্রের সংস্থান করিয়া বিদেশে রপ্তানি হইত। এখন এই জেলায় কার্পাসের চাষ নাই বলিলেও চলে। অতি অল্পসংখ্যক সাঁওতাল এবং বেলপাহাড়ীর নিকটে কয়েকটি মাহাতো পরিবার সামান্য কিছু চাষ করিয়া থাকে। তাহাও যত্নের সহিত সম্পন্ন করা হয় না। যে জমি হইতে সাধারণতঃ কোন শস্য পাইবার আশা নাই এবং যাহা অনুর্ব্বর সেরূপ জমিতে দুই তিন বার চাষ দিয়া বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কখনও একবার নিড়ানি দেওয়া হয়, কখনও তাহাও হয় না। কার্পাস-গাছগুলি সাধারণতঃ ঘাসে ভরিয়া যায় এবং ফলনও বেশি হয় না।

কাপড়ের কলওয়ালারা বিশ্বাস করেন যে, সম্যক যত্ন ও চেষ্টা করিলে বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে লম্বা-আঁশ-কার্পাসের চাষ প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। বঙ্গে এই কার্পাস উৎপন্ন হইলে তাঁহারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে অথবা বাহির হইতে কার্পাস কিনিতে ইচ্ছা করেন না। কৃষিবিভাগ গত দুই বৎসর যাবৎ মেদিনীপুর জেলার সদরে ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় লম্বা-আঁশ-কার্পাসের বীজ বিনামূল্যে কৃষকগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া ফলাফল লক্ষ্য করিয়াছেন। এখন বুঝিতে পারা যায় যে, চেষ্টা ও যত্ন করিলে এই জেলায় অর্থকরী শস্য হিসাবে কার্পাসের চাষ পুনরায় প্রচলন করা যাইতে পারে।

যে স্থানে সাধারণতঃ ৩০ ইঞ্চি হইতে ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, সেই সকল জায়গায় কার্পাসের চাষ ভাল হয়। মেদিনীপুরের সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় বৎসরে সাধারণতঃ ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইলেও লম্বা-আঁশ-কার্পাস বেশ ভালই হয়, ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। এই মহকুমায় যে বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা-জমি পতিত রহিয়াছে, তাহাতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলে সুন্দর চাষ হইতে পারে। ক্রমাগত দুইবার সবুজ সার প্রয়োগ করিলে এই সমস্ত ডাঙ্গা-জমিকে কার্পাস চাষের উপযুক্ত করা যায়। বিঘা-প্রতি ১৲ অথবা ১॥০ খরচ করিলে জমিতে একবার সবুজ সার দেওয়া যায়,

এবং ইহা ৪৷৷৫০ মণ গোবর সার প্রয়োগের সমান কার্য্য করিয়া থাকে।

কৃষি-বিভাগ হইতে এই বৎসর শালবনি থানার অন্তর্গত শীতলপুর গ্রামে ৫০ বিঘা জমিতে ২৮৯ নং (No. 289) লম্বা-আঁশ-কার্পাসের চাষ করা হইতেছে। ইহার সুতাতে ৪০ কাউন্টের কাপড় তৈয়ারি হইবে। শীতলপুর মেদিনীপুর হইতে লালগড় যাইবার রাস্তায় ১৭ মাইলের উপর বামভাগে অবস্থিত। যে ভূমিতে এই কার্পাসের বীজ বপন করা হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বে আউস ধানের চাষ হইত। বৃষ্টিপাত কম হইলে আউস ধান সম্পূর্ণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা কার্পাসের পক্ষে হিতকর; অথচ আউস ধান অপেক্ষা কার্পাসের চাষে কত অধিক লাভবান হওয়া যায়। বঙ্গদেশের কাপড়ের কলওয়ালারা বলিয়াছেন যে, যত কার্পাস এ দেশে উৎপন্ন হইবে তাহা তাঁহারা ২৫৲ মণ হিসাবে (বীজ ছাড়ান কার্পাস) ক্রয় করিবেন। আঁশ এক ইঞ্চি হইতে বড় হইলে কার্পাসের দাম সেই অনুপাতে মণ প্রতি ৫০৲ কিম্বা আরও বেশি হইতে পারে। শীতলপুরের জমির মালিক মেদিনীপুরের উকীল শ্রীযুক্ত নবকুমার হাজরা। যাঁহারা কার্পাসের চাষ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে শীতলপুরে গিয়া চাষের প্রণালী দেখিয়া আসিলে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

সি-আইলাণ্ড (Sea Island) কার্পাসের আঁশ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হয়। এ বৎসর মেদিনীপুর জেলায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই চাষ আরম্ভ করিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহস রায়, লালগড়
শ্রীযুক্ত নবকুমার হাজরা, মাইলদা
শ্রীযুক্ত শরেন্দ্রকুমার দেব, মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত উৎপল সরকার, জিলা-কৃষি-কর্ম্মচারী, মেদিনীপুর

কে. টি. ২৫ নং (K. T. No. 25) লম্বা-আঁশ-কার্পাস ভীমপুরের নিকটে নেড়ে নামক গ্রামে লাগান হইয়াছে এবং ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মাহাতো হাতে-কলমে এই চাষ করিতেছেন।

মাটি

প্রায় সব মাটিতেই কার্পাস উৎপন্ন হইতে পারে, তবে দো-আঁশ মাটি কার্পাসের পক্ষে উৎকৃষ্ট। এই মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু-চলাচলের পথ থাকে এবং জমিও রস ধরিয়া রাখে। বেলে মাটিতে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা থাকিলেও মাটির রস শীঘ্রই শুকাইয়া যায় বলিয়া গাছ ভাল বাড়িতে পারে না। এঁটেল মাটিতে বায়ু-চলাচলের সুবিধা না থাকায় এবং বৃষ্টিপাত হইলে জমিতে প্রচুর রস-সঞ্চার হয় বলিয়া কার্পাস ভাল জন্মে না। বেলে মাটিকে কার্পাস চাষের উপযুক্ত করিতে হইলে পূর্ব্বে ধৈঞ্চা অথবা বরবটি সবুজ সার দিয়া জমির বালি-ভাগ কমাইয়া উর্ব্বরা করিতে হয়। বৈশাখ মাসে বিঘা-প্রতি তিন সের ধৈঞ্চা অথবা বরবটি বীজ ছড়াইয়া (৩।৪ বার চাষ দিবার পরে) দেড়মাস পরে গাছগুলিকে চুষিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়। ইহাতে মাটির রস ধরিয়া রাখার শক্তি বাড়ে। এঁটেল মাটিতে কার্পাস লাগাইতে হইলে বিঘা-প্রতি এক মণ গুঁড়া চূণ (জলে না গুলিয়া) মাটির সহিত অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে মিশাইয়া দিতে হয়। ইহাতে মাটি হাল্কা হয় এবং অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দেয়।

কার্পাসের জমিতে অন্ততঃ ৭।৮ বার চাষ দিতে হয়। খনা বলিয়াছেন—

"শতেক চাষে মুলা
তার অর্দ্ধেক তুলা"

মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে জমিকে খুলিয়া মই না দিয়া রাখিতে হয়। পরে বৃষ্টি হইলে জমিতে আবার চাষ দিয়া খুলিয়া রাখিতে হয়। জমিতে সার দিবার এই প্রকৃষ্ট সময়। সার দিবার কিছু দিন পরে আরও গভীরভাবে মাটি ওলট-পালট করিয়া চাষ ও মই দিয়া মাটিকে প্রস্তুত করিতে হয়।

সার

পচা গোবরের সার বিঘা-প্রতি ১০।১২ গাড়ি দিতে হয়। উহা বীজ বুনিবার মাসেক কাল আগে দিতে পারিলে ভাল হয়। জমিতে গোবর সার দেওয়ার পর বিঘা-প্রতি ২।৩ গাড়ি ছাই-সার (পাথুরে কয়লার নহে) দিলে ভাল হয়।

বীজবপন-প্রণালী ও পরিচর্য্যা

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস কার্পাস লাগাইবার প্রকৃষ্ট সময়। কার্পাসের বীজ সাধারণতঃ পরস্পরের সহিত জড়াইয়া

থাকে। সেই জন্য বপনের পূর্ব্বে কাঁচা গোবর ও ঘুঁটের ছাই মিশাইয়া মাটির সহিত ঘষিলে বীজগুলি আলাদা হইয়া যায়। এই ভাবে বীজ ঘষিয়া লইলে শীঘ্রই অঙ্কুর বাহির হয়। কার্পাস বীজ লাইন করিয়া লাগাইতে হয়। এক লাইন হইতে অন্য লাইন দুই হাত তফাতে রাখিতে হয় এবং প্রতি লাইনে ১½ হাত অন্তর ২।৩টি বীজ ১½ ইঞ্চি মাটির নীচে লাগাইতে হয়। বিঘা-প্রতি ২।৩ সের বীজ লাগে। একই স্থানে বীজ হইতে ৩টি গাছ অঙ্কুরিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ গাছটি রাখিয়া বাকি দুইটি তুলিয়া ফেলিতে হয়। চারা বাহির হইবার দশ বার দিন পরে এইরূপ করা উচিত।

গাছ ৮।১০ আঙ্গুল বড় হইলে জমিতে একবার কোপ দিয়া গাছের দুই সারির মধ্যস্থল হইতে মাটি তুলিয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া উচিত। এই নালির দ্বারা ক্ষেত্রের জল শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়। কার্পাস গাছের গোড়া অত্যন্ত নরম। ঝড়ে এবং ডাল-পালার ভারে সহজেই গাছ হেলিয়া পড়ে। প্রতি মাসে একবার করিয়া কোদাল কিম্বা Planet Junior Hand Hoe দ্বারা জমির মাটি আলগা করিয়া দিতে হয়। ঘাস থাকিলে তাহা গোড়া-সমেত বাছিয়া ফেলিতে হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গাছগুলি বড় হইলে গাছের উভয় পার্শ্ব হইতে পুনরায় মাটি তুলিয়া গাছের গোড়ায় দিলে গাছ হেলিতে পারে না। জল সেচনের আবশ্যক হইলে এই নালা দিয়া ক্ষেত্রে জল দিলে গাছের উপকার হইবে। আশ্বিন মাসে বৃষ্টি না হইলে জলসেচনের আবশ্যক হইতে পারে। সে সময় জমিতে রস না থাকিলে ফলগুলি পরিপুষ্ট হয় না।

কার্পাস সংগ্রহ

গাছের সমস্ত কার্পাস একসঙ্গে পাকে না। বর্ষার পূর্ব্বে যে কার্পাস রোপণ করা হয়, তাহা কার্ত্তিক মাস হইতে পাকিতে আরম্ভ করে। তখন প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া তুলা সংগ্রহ করিতে হয়। খোসা সমেত না তুলিয়া খোসার ভিতর হইতে তুলা সংগ্রহ করিতে হয়। তুলা সংগ্রহ করিবার সময় দেখিতে হয় যেন শুক্না পাতার অংশ কিম্বা খোসার অংশ তুলার সহিত লাগিয়া না থাকে। তাহাতে তুলার দাম অনেক কমিয়া যায়। বৃষ্টিতে ভিজা তুলা গাছে না শুকাইয়া সংগ্রহ করা উচিত নয়। সকাল-বেলায় তুলা সংগ্রহ করিতে হয়। সংগ্রহ শেষ হইলে তুলার শুভ্রতা ও পুষ্টি অনুসারে ২।৩টি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া একখানি পরিষ্কার কাপড়ের উপর বিছাইয়া রৌদ্রে ভাল-রূপ শুকাইয়া লওয়া উচিত এবং পৃথকভাবে ঘরে রাখা উচিত।

ফলন

বীজ সমেত কার্পাস সাধারণতঃ বিঘা-প্রতি ৩॥০ মণ ফলে। ইহা হইতে ১॥০ মণ তুলা ও ২ মণ বীজ পাওয়া যায়। জমি ভাল হইলে এবং ভালরূপ সার প্রয়োগ করিয়া যত্ন লওয়া হইলে আরও অধিক ফলন হইতে পারে। গত বৎসর ঢাকেশ্বরী কাপড়ের কলে বিঘা-প্রতি ৬ মণ পর্য্যন্ত ফলন পাওয়া গিয়াছে।

বীজ ছাড়ান

ছোট ছোট কৃষক চরকার সাহায্যে বীজ ছাড়াইবেন। এই ভাবে বীজ ছাড়াইবার পূর্ব্বে কার্পাসকে খুব ভাল করিয়া রৌদ্রে রাখিতে হয়, নচেৎ অনেক বীজ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

কার্পাস তৈল

কার্পাস বীজ হইতে উত্তম তৈল পাওয়া যায়। বীজ শুষ্ক করিয়া ঘানিতে পিষিলেই তৈল বাহির হয়। এক মণ বীজ হইতে ৬ সের হইতে ৮ সের তৈল পাওয়া যায়।

কার্পাস-খৈল

কার্পাস-বীজের খৈল গরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহা গরুকে খাইতে দিলে গরুর স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং দুধ বাড়ে। কার্পাস-বীজচূর্ণ কিম্বা কার্পাসের খৈল জমির পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। ইহা রেড়ির খৈল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। কার্পাস-বীজ ঢেঁকিতে কুটিয়া প্রায় ১০।১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া গরুকে খাইতে দিতে হয়।

চাষের আয়-ব্যয়

এক বিঘা জমি চাষ করিতে ১৫৲ টাকার বেশি খরচ হয় না। উহা হইতে নিম্নমত আয় হইতে পারে :—

১॥০ মণ তুলার দাম (২৫৲ মণ হিসাবে) ...	৩৭॥০
২ মণ বীজের দাম (৩৲ হিসাবে) ...	৬৲
	৪৩॥০

বাদ চাষের খরচ ...	১৫৲
বিঘা প্রতি মোট লাভ ...	২৮॥০ *

* "পল্লী-শ্রী"র জন্য এই প্রবন্ধটি মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকাল্চারাল অফিসার লিখে পাঠিয়েছেন।

সম্পাদক—"পল্লী-শ্রী"

কোটালবেড়ের বাঁধ

শালবনি থানার এলাকায় কোটালবেড়ে গ্রামে লোকের বাস না থাকলেও আশপাশের সাত আটখানা গ্রামের চাষীরা এসে এখানকার মাঠে আবাদ করে। এই সমস্ত জমির মালিক—মেদিনীপুরের উকীল শ্রীযুক্ত নবকুমার হাজরা।

এই বিস্তীর্ণ মাঠের চাষ-আবাদ একমাত্র বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে। যেবার বৃষ্টির পরিমাণ কম হয়, অথবা সময়মত বৃষ্টি না হয়, সেবার চাষীদের দুঃখের সীমা থাকে না। বাঁধ দিয়ে উপরের মাঠের জল আটকাতে পারলে এই বিস্তীর্ণ মাঠের সেচন-সমস্যার অতি সহজে সমাধান হতে পারে। এই ব্যবস্থাটুকু করার জন্য নবকুমার-বাবুকে পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রজাদের ডেকে এরূপ বাঁধের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা স্থির করে যে, তারা দল বেঁধে মাটি কেটে এই বাঁধটি তৈরি করবে। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক চাষী-গৃহস্থ একজন মজুর বিনা-মজুরিতে পাঠাতে স্বীকৃত হয়। এর পর মজুরদের জন্য পালা বেঁধে দেওয়া হয় এবং তাদের উৎসাহে মুগ্ধ হয়ে নবকুমারবাবু নিজে থেকে তাদের জলযোগ করাবার ব্যবস্থা করেন।

পূর্ণ উদ্যমে বাঁধ-কাটা চলেছিল। বর্ষায় মাঠে চাষের কাজ আরম্ভ হওয়ায় সম্প্রতি কাজটি স্থগিত আছে, কিন্তু মাঠের কাজ শেষ হলে আবার বাঁধ-কাটা আরম্ভ করা হবে। এই বাঁধটি শেষ পর্য্যন্ত কাটা হলে লম্বায় প্রায় সিকি মাইল এবং চওড়ায় প্রায় ৬৬ গজ দাঁড়াবে। এতে গ্রামের শালজঙ্গল আর উপরের মাঠ থেকে এত বেশি গড়ান-জল জমা হবে যে তাতে আশপাশের ছোট ছোট বাঁধে ও চাষের জমিতে জল দেওয়া চলবে। ইতিমধ্যেই সেচনের সুবিধার জন্য এই বাঁধ থেকে ছোট ছোট নালা কাটা হয়েছে।

চাষীরা নিজের হাতে বিনা-পারিশ্রমিকে যে কাজটি আরম্ভ করেছে, সেটি শেষ হলে প্রায় চার হাজার বিঘা আবাদী জমির ফসলের ভাবনা থাকবে না। এই রকম বাঁধ অন্যান্য জায়গাতেও হতে পারে; আর তা হলে দুর্দ্দিনে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হবে না।

সদর (উত্তর) মহকুমায় পল্লী-সংগঠন

পাথরা

মেদিনীপুরের উত্তরাঞ্চলে একদিন পাথরা গ্রামের নাম সকলের কাছেই পরিচিত ছিল। এই গ্রামই স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মজুমদার ও রামদয়াল মজুমদারের জন্মভূমি ও বাল্যের ক্রীড়ানিকেতন। গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ-সজ্জনের বাস ছিল। আজ কেবল অতীতের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের বাঁধা ঘাট, দেউল, ভগ্ন অট্টালিকা আর দেবমন্দির।

ধ্বংসোন্মুখ গ্রামটিকে বাঁচাবার জন্য গ্রামে একটি পল্লীমঙ্গল-সমিতি স্থাপিত হয়েছে। সমস্ত গ্রামকে তিন ভাগে ভাগ করে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক গৃহস্থ প্রত্যেক সপ্তাহে একজন কর্ম্মী পাঠিয়ে পল্লী-সংগঠনের কাজে সাহায্য করছেন। বাগ্দী-পাড়ার রাস্তাটি মেরামত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ-পাড়ার রাস্তাটিকে প্রশস্ত করা হয়েছে এবং প্রায় নূতন করেই তৈরি করা হয়েছে। কুড়িটি পুষ্করিণীর কচুরীপানা, পাঁক ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়েছে। অনেক জঙ্গল ও কাঁটাগাছ কেটে ফেলা হয়েছে। সমিতির চেষ্টায় প্রাথমিক স্কুলটির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে; স্কুলের আশপাশের জমি পরিষ্কার করে একটি খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে।

তলকুই ও যমুনাবালি

তলকুই ও যমুনাবালি গ্রামকে কর্ম্মক্ষেত্র করে যে পল্লীমঙ্গল-সমিতি গঠিত হয়েছে, তার চেষ্টায় এই দুটি গ্রামের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রায় আধ মাইল রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে, ১৬টি পুকুরের পানা তোলা হয়েছে। যে সমস্ত বাঁশঝাড় গ্রামে আলো বাতাসের পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল সেগুলি কেটে দেওয়া হয়েছে; পথের ও বাড়ীর পাশের জঙ্গল কাটা হয়েছে। কতকগুলি পুকুরকে আংশিকভাবে গভীর করা হয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডের আপিসে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কগণের শিক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উন্নত ধানের বীজ নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এ পর্য্যন্ত যে ফল পাওয়া গেছে, তা বিশেষ আশাপ্রদ। সাধারণকে নূতন বীজ সম্বন্ধে অবহিত করার ও নূতন প্রণালীতে চাষ-আবাদ শেখাবার জন্য কৃষি-বিভাগ থেকে এখানে একটি ফার্ম্ম স্থাপিত হয়েছে। এর জন্য ৩৭ বিঘা জমি নেওয়া হয়েছে। সার-সংরক্ষণ বিষয়ে গ্রামবাসীকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার সুফল গ্রামের সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম মণ্ডল এই পল্লীমঙ্গল-সমিতির প্রাণস্বরূপ। তিনিই গ্রামবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে এই সমস্ত জনহিতকর কাজ করছেন। তিনি নিজের খরচে একটি হারিয়ানা-ষাঁড় আনিয়েছেন এবং গোজাতির উন্নতির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করছেন। গ্রামের অকেজো ষাঁড়গুলিকে দামুড়া করা হয়েছে। নেপিয়ার ঘাসের চাষ করে গো-মহিষের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নরাবসাৎ

গড়বেতা থানায় এই পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি অল্প কয় মাসের মধ্যে যে কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দিয়েছে, তার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করা উচিত। সমিতির চেষ্টায় গ্রামের অনেক জঙ্গল কাটা হয়েছে। গ্রামে এমন কতকগুলো পুকুর ছিল, যার দুর্গন্ধে সে পাড়া দিয়ে লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। সমিতি সেই পুকুরগুলোর পঙ্কোদ্ধার করে সেগুলোকে গভীর করে দিয়েছে। এই রকম ছোট বড় অনেকগুলো পুকুর পরিষ্কার করে তার পাড়ের রাস্তা বাঁধিয়ে দেওয়ায় গ্রামের চেহারা এখন অনেক বদলে গেছে। গ্রামবাসীর চেষ্টায় গ্রামের ভিতর প্রায় তিন মাইল রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে; রাস্তার পাশে ড্রেন কেটে দেওয়া হয়েছে। গ্রামপথের উপর যাঁরা অন্যায়ভাবে বেড়া দিয়ে অথবা দেওয়াল তুলে পথগুলিকে সঙ্কীর্ণ করে রেখেছিলেন, তাঁদের বুঝিয়ে সে সমস্ত বেড়া ও দেওয়াল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে রাস্তাগুলিও বেশ চওড়া হয়ে গেছে। গ্রামবাসীর চেষ্টায় একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং এখন সেখানে ৩০টি ছাত্র পড়ছে। গ্রামে যে উচ্চ-প্রাথমিক স্কুল ছিল তার জন্য একটি ঘর তোলা হয়েছে।

লোয়াদায় পল্লী-উন্নয়ন

সদর (উত্তর) মহকুমায় লোয়াদা গ্রামখানির খ্যাতি একদিন জেলার গণ্ডি ছাড়াইয়া বিদেশে প্রচারিত ছিল। লোয়াদার মিছরি, চলকন, কাঁসার বাসন, আলতা—দেশ-দেশান্তরে প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই সমস্ত ব্যবসা গ্রামবাসীকে সমৃদ্ধির শিখরে বসাইয়াছিল। আজও বহু পুরাতন ভগ্ন ও ধ্বংসোন্মুখ অট্টালিকা দেবমন্দির গ্রামের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। গত অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস লোয়াদার পক্ষে অতীব শোচনীয়।

লোয়াদা ও নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য পল্লীবাসীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গত এপ্রিল মাসে একটি "পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি" গঠন করিয়াছেন। সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে লোয়াদা এবং তন্নিকটবর্ত্তী ফতেবাড়, নরহরিপুর, তালবেড়্যা, ঘুন্‌ঘুনি পাটনা ও রামচন্দ্রপুর গ্রামগুলি।

কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়া, গ্রামপথ নির্ম্মাণ করিয়া সমিতির উৎসাহী কর্ম্মীগণ এই অল্পকালের মধ্যে যে ভাবে পল্লীর লুপ্ত-শ্রী ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হয়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্য্যের পরিচয় দেওয়া হইল—

(১) এই গ্রামগুলিতে পুষ্করিণী ও ডোবার সংখ্যা মোট ১৯৩; ইহার মধ্যে ১৭১টি পুষ্করিণী ও ডোবা হইতে পানা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। দুইটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে।

(২) তিনটি সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে একটিকে পাকা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই রাস্তাটি পল্লীর নিভৃত প্রান্তে থাকায় মহিলাগণের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে।

(৩) স্থানে স্থানে জলনিকাশী নালা কাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আবশ্যকমত "কাল্‌ভার্ট" নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৪) লোয়াদা গ্রামে দুইটি ডোবাকে মাটি দিয়া ভরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে বর্ষার জল জমিয়া গ্রামের স্বাস্থ্যের হানি না হয়, সেজন্য অনেকগুলি গর্ত্ত ও নীচু জমি ভরাট করা হইয়াছে।

(৫) অর্দ্ধ বর্গ-মাইল পরিমিত জমির জঙ্গল কাটা হইয়াছে।

(৬) নরহরিপুর ও রামচন্দ্রপুর গ্রামে দুইটি বড় নালা কাটা হইয়াছে। ইহাতে বন্যার জল প্রবেশ করাইয়া গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ও কৃষির উন্নতি-সাধন করা যাইবে। নরহরিপুরের নালাটি এক মাইলের উপর কাটা হইয়াছে।

(৭) লোয়াদা গ্রামে সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পুস্তক সংখ্যা ৩০০।

(৮) লোয়াদার বাজার অঞ্চলে একটি Village Hall প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই হলটি নৈশবিদ্যালয় এবং সঙ্গীত-বৈঠকের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

(৯) সরকারী সাহায্যে লোয়াদা গ্রামে যে খেলার মাঠটি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেখানে নিয়মিতভাবে ক্রীড়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। খেলার মাঠের চারিদিক ঘিরিয়া দিয়া Village Park নির্ম্মাণের সংকল্প করা হইয়াছে।

(১০) সমিতির অনুরোধে জেলা-বোর্ড ও লোকাল বোর্ড তাঁহাদের পথপার্শ্বস্থিত ড্রেনগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সমিতির কর্ম্মীগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামেও কতকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ডাঃ প্রফুল্লকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদারের চেষ্টায় গত মে মাসে ষাঁড়পুর গ্রামে একটি অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ মজুমদারের পত্নী বিনা-পারিশ্রমিকে ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেছেন। সমিতির সভাপতি ডাঃ ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় দাবাদাড়ী গ্রামে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে ৩৭টি ছাত্র-ছাত্রী এখানে শিক্ষা পাইতেছে। ডাঃ ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মীর চেষ্টায় মুরাস্থি গ্রামে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য

চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ধনডাঙ্গরা গ্রামের দ্বারকানাথ তুঞার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অনেকেই সার-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছে। উন্নত শ্রেণীর ধানের চাষ প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি ইউনিয়ন-বোর্ড-ডিস্পেন্সারি স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জেলা-বোর্ডের সাহায্যে শীঘ্রই এই প্রস্তাবিত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা আছে। *

* গত জুলাই মাসে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. লোয়াদা পরিদর্শন করেন। লোয়াদা পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির-সভাপতি ডাঃ ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী সেদিন এই রিপোর্টটি পড়েছিলেন।

সম্পাদক "পল্লী-শ্রী"

গো-পালন

আমাদের দেশে গোজাতির শোচনীয় অবস্থা প্রত্যেকেরই চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। গোচারণের মাঠ ক্রমশঃ চাষের জমিতে পরিণত হইতেছে। এখন যে সমস্ত জমিতে কোন শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই কেবল সেই সমস্ত জমিতেই গো-মহিষকে চরিতে দেওয়া হয়। সে সব জমিতে তাহারা চরিয়া বেড়াইলেও কিছুই খাইতে পায় না; গৃহে ফিরিয়াও সামান্য খড় ব্যতীত আর কিছু সচরাচর খাইতে পায় না। এইরূপ অবস্থায় তাহারা যে গড়ে প্রতিদিন ১ সের দুধ দিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এই দুধও গৃহস্বামীর ভোগে আসে না, সংসার-প্রতিপালনের জন্য অধিকাংশ স্থলে বিক্রয় হইয়া যায়। অথচ দুধের মত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে জাতীয় জীবনের যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না।

শরীর-ধারণের জন্য একটি দুগ্ধবতী গাভীকে দৈনিক যেরূপ আহার দিতে হয়, তাহার তালিকা দেওয়া হইল—

ভূষি	...	৪ ছটাক
খুদ	...	১ সের
মাটিকলাই	...	৮ ছটাক
খোল	...	৪ ছটাক
লবণ	...	২ ছটাক

কিন্তু এইরূপ ভাবে হিসাব করিয়া সাধারণতঃ গাভীর আহার দেওয়া হয় না। ইহার ফলে গোজাতি প্রতিদিন খর্ব্বকায় হইয়া ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

গো-জাতির উন্নতিসাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রজননের জন্য উৎকৃষ্ট বৃষ রাখিতে হইবে। সেই বৃষও যাহাতে উপযুক্ত আহার পায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপ একটি ষাঁড়ের দৈনিক আহারের ব্যবস্থা নিম্নমত হওয়া আবশ্যক :—

খড়	৩ বা ৪ সের
কাঁচা ঘাস	১০ সের
খৈল	১ সের
ডাল	১ সের
লবণ	১ ছটাক

গো-জাতির একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য—নেপিয়ার ঘাস। বঙ্গের বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে গো-জাতির আহারের জন্য জোয়ার, ভুট্টা, নেপিয়ার ঘাস, মিলেট, গিনি ঘাস ইত্যাদির যথেষ্ট চাষ দেখা যায়, কিন্তু বঙ্গদেশের জনসাধারণ এ বিষয়ে উদাসীন। এই উদাসীনতার ফলে সমগ্র জাতির যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা আজও তাঁহারা বুঝিতেছেন না।

ভারতের বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো গো-জাতির উন্নতির জন্য যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার কিছু সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারত-সরকার হইতে পল্লী-উন্নয়নের জন্য যে অর্থ-সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার সুবিধা লইয়া অনেক জেলায় গো-জাতির উন্নতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলাতেও এইরূপ প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এজন্য ২৪,৭০০৲ তিন বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। এই টাকায় পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে ৬০টি উৎকৃষ্ট ষাঁড় আনাইয়া কেশপুর, কেশিয়াড়ী, ঝাড়গ্রাম, চন্দ্রকোনা, সুতাহাটা, মহিষাদল ও ভগবানপুর

থানায় বিতরণ করা হইয়াছে। জেলায় একজন লাইভ ষ্টক অফিসার (Live Stock Officer) ও তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা, যে সকল স্থানে এইরূপ ষাঁড় রাখা হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানে ঘুরিয়া অকর্ম্মণ্য ষাঁড়গুলিকে দামড়া করিতেছেন এবং সাধারণকে গোপালন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। গত ছয় মাসে ৯২৯টি অকর্ম্মণ্য ষাঁড়কে দামড়া করা হইয়াছে। এবং ৭১ মণ নেপিয়ার ঘাসের চারা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

এই সকল ষাঁড় হইতে যে সব গাভী বা বলদ উৎপন্ন হইবে, তাহাদের উপযুক্ত আহার দেওয়া রক্ষকের কর্ত্তব্য। এক বছরের গাভীকে নিম্নমত আহার দিতে হয়—

ভূষি	—	২ ছটাক
তিসি	—	৪ ছটাক
মাটিকলাই	—	২ ছটাক
লবণ	—	১ ছটাক

ইহার পর অল্পপরিমাণে এই আহার বাড়াইয়া দিতে হয়। পরে জোয়ান অবস্থায় নিম্নমত আহার দিতে হয়—

খোল	—	৮ ছটাক
খুদ	—	৪ ছটাক
মাটিকলাই	—	৪ ছটাক
লবণ	—	১ ছটাক

একটি সবল ও সুস্থ ষাঁড়কে বৎসরে ৮০ হইতে ১০০ গাভীর প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। গাভীর আকার ছোট হইলে তাহাকে বাঁশ দিয়া ধরিয়া রাখা উচিত। একটি বাঁশ সম্মুখের পায়ের ঠিক পিছনে এবং অপরটি বুকের সম্মুখে ধরিতে হয়। বাঁশের বদলে স্থায়ী কাঠের ফ্রেমও প্রস্তুত করা যায়।

গো-মহিষাদির গোহালঘর পরিষ্কার রাখিতে হয়। যাহাতে সেই ঘরে আলোক ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। গোহালঘর হইতে গোময় ও মূত্রাদি সযত্নে পরিষ্কার করিতে হয়। এই গোময় উৎকৃষ্ট সার, কিন্তু সাধারণে ঠিকমত ইহাকে রক্ষা করে না বলিয়া ইহার 'সার'ত্ব অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যায়। গোহাল হইতে কিছু দূরে একটি গর্ত্ত করিয়া তাহার উপর একটি চালা করিয়া দিতে হয়। সেই গর্ত্তে গোময় রক্ষা করিলে তাহার সহিত রৌদ্র-বৃষ্টির সংস্পর্শ হইতে পায় না। তাহার ফলে সারের তেজ পূর্ণভাবে সঞ্চিত থাকে। *

* মেদিনীপুরের Live Stock Officer এই প্রবন্ধটি "পল্লী-শ্রী"র জন্য লিখে পাঠিয়েছেন।

সম্পাদক "পল্লী-শ্রী"

সাঁতার

শরীরকে সুস্থ রাখতে সাঁতারের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যায়াম আর একটিও নেই। সাঁতারে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়; শরীরের সমস্ত পেশী, শিরা, উপশিরা সতেজ হয়ে ওঠে। নদীমাতৃক দেশে সাঁতার শেখা প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য বলেই ধরা হয়। সচরাচর যে সমস্ত নৌকাডুবির খবর পাওয়া যায় এবং যারা প্রাণ হারিয়েছে বলে শোনা যায়, তাদের প্রাণ হারাবার একমাত্র কারণ—তারা সাঁতার জানত না। সাঁতার শিখলে জলে যেমন নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারা যায়, তেমনই অপরের প্রাণও বাঁচানো যায়। এতটা আমোদের সঙ্গে এত বড় উপকার করার সুযোগ আর কোন খেলা বা ব্যায়ামে পাওয়া যায় না।

সুখের বিষয়, বাংলা দেশে সাঁতারের অনুশীলন চলছে। সাঁতারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। ছেলেদের খেলাধূলা পরিচালনার জন্য মেদিনীপুরে যে ডিষ্ট্রিক্ট ইণ্টার-স্কুল স্পোর্টস্ এসোশিয়েশন্ গঠিত হয়েছে, তার কর্ত্তৃপক্ষ গেল বছর সাঁতার-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন, এবারেও পূজার ছুটির আগে সে রকম ব্যবস্থা করা হবে। ব্যায়ামের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা খুবই ভাল। এতে উৎসাহ আসে এবং নিজেকে উপযুক্ত করবার একটা প্রেরণা পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্যে আজকাল সাঁতার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে

যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। সাঁতারের বিশেষ ভঙ্গি, হাত পা কেমন করে প্রসার করতে হয় এবং কি উপায়ে অতি সহজে জলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়—এসব বিষয়ে আমাদের দেশেও সাধনা চলছে।

প্রত্যেক স্কুলে ছেলেদের সাঁতার শেখাবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত। সাঁতারের জন্য খরচ একেবারে নেই বললেই হয়। এই এক ব্যায়াম যার জন্য 'ডেভেলপার' বা 'চেষ্ট-এক্সপ্যাণ্ডার' কিনতে হয় না, খেলার মাঠও তৈরি করতে হয় না; খোলা হাওয়ায় নীল আকাশের নীচে সর্ব্বত্রই নদী বা পুকুর পড়ে আছে, জলে নামবার ইচ্ছা মনে জাগলেই হয়। আমাদের দেশ গ্রীষ্ম-প্রধান; গা ডুবিয়ে জলে পড়ে থাকায় যে কি বিপুল আনন্দ পাওয়া যায় সে কথা যাঁরাই সাঁতার কাটেন তাঁরা জানেন।

সাঁতার শেখার সহজ উপায় সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। জলে নামার আগে হাত দুটোকে পর পর ঘোরাবার চেষ্টা করে পরে এক বুক জলে গিয়ে ঐ ভাবে জলের ভিতর হাত ঘোরাতে শেখা উচিত। এর পর জলের ভিতর খুঁটি পুঁতে তাতে পায়ের আঙুল আটকে বুকের উপর ভাসতে চেষ্টা করতে হয় এবং হাত দুটোকে পর পর ঘোরাতে হয়। এই অভ্যাসটুকু শেষ হলে, যেখানে অল্প জল আছে, সেই জলের ভিতরে মাটিতে হাত দিয়ে ভাসতে চেষ্টা করতে হয় এবং সেই উপায়ে এগিয়ে যেতে হয়। সাঁতার দেবার সময় বাঁ হাতের সঙ্গে ডান পায়ের আর ডান হাতের সঙ্গে বাঁ পায়ের বরাবর মিল রেখে শরীরকে জলের উপর ভাসিয়ে মাঝে মাঝে মাথা ডুবিয়ে সাঁতার দিতে অভ্যাস করতে হয়। এই অভ্যাস মাটিতে একটা সরু বেঞ্চের উপরেও করা চলে। সাঁতারের এই বিশেষ ভঙ্গিটুকু আয়ত্ত না হলে বড় সাঁতারু হওয়া যায় না। কেন না, বড় সাঁতারু হতে হলে একটা জিনিস থাকা দরকার—দম, যাতে জলের ভিতর দিয়ে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাবার শক্তি পাওয়া যায়।

ছোট ছোট ছেলেদের বেশিক্ষণ জলে থাকতে দিতে নেই। তাদের বেশি দূর সাঁতার কাটতে দেওয়াও উচিত নয়।

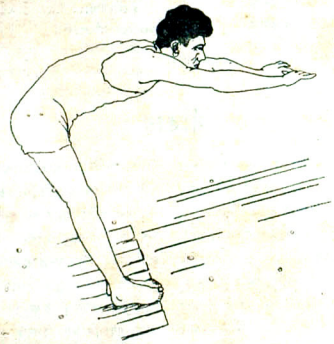

সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দত্ত
মেদিনীপুর লক্ষ্মী প্রেস হইতে শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮ টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পল্লী-শ্রী

১ম বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৪৫ [৪র্থ সংখ্যা

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বিগত ১লা জানুয়ারী হইতে আজ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় পাঁচ শত সভা বাংলা দেশে ও বাংলার বাহিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই সকল সভায় পঠিত প্রবন্ধ এবং কথিত অভিভাষণ ও বক্তৃতা সাময়িকপত্র ও নানা পুস্তিকা মারফত দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া বঙ্কিম সম্বন্ধে বাংলা দেশের সাধারণ পাঠককেও এমন বিশেষজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে যে, নূতন কিছু বলিয়া সভা ভুলাইবার মতন অবস্থা বিশেষ কৌশলী বক্তারও নাই। আমি প্রারম্ভেই এই নিবেদন করিতেছি যে, বঙ্কিমকে শ্রদ্ধা করি বলিয়াই আমি আপনাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিবার বাসনা লইয়া এখানে আসিয়াছি, বঙ্কিম সম্বন্ধে আপনাদিগকে নূতন কিছু শুনাইতে আসি নাই।

তা ছাড়া, এত সহজ আয়ত্তের বস্তু বঙ্কিমচন্দ্র নন; ঘটা করিয়া এক দিনের দুই তিন ঘণ্টা ব্যাপী সভায় কিঞ্চিৎ বক্তৃতা ও সামান্য আবৃত্তির দ্বারা তাঁহার সম্যক পরিচয় হইয়া যাইবে, বাংলা দেশের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র এখনও ততখানি অপ্রয়োজনের ব্যাপার হইয়া উঠেন নাই। তাঁহার প্রভাব দীর্ঘ দিন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে এবং আরও যে দীর্ঘকাল থাকিবে না—বংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে আসিয়াও সে কথা জোর গলায় বলিতে পারিব না। অতীত এবং বর্ত্তমান দুই যুগের মাঝখানে গঙ্গাধর বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিশূল হাতে দাঁড়াইয়া জটায় স্বর্গমন্দাকিনী ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে যে পূতধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, সে ধারা আজিও অব্যাহত আছে, পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু অন্য কোনও প্রবলতর স্রোত আসিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই; বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ জাতি ও সাহিত্য গঠনে অতীত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও কীর্ত্তি এখনও সমাপ্তিতে আসিয়া ঠেকে নাই, ইহা দুর্ভাগ্যের কথা হইলেও এই কটকর সত্য আমাদিগকে মানিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসাধক এবং তাঁহারই প্রদর্শিত আদর্শে এবং সেই ভিত্তির উপরেই তাঁহার অসংখ্য-শীর্ষ বিস্ময়কর উৎসার; পৃথিবীর সাহিত্যে বর্ত্তমান যুগে বাঙালী প্রতিভার তিনি চমকপ্রদ কীর্ত্তি। এই গগনস্পর্শী

শিখরকে সম্যক বুঝিবার জন্যও বঙ্কিম-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক। এ যুগের সাহিত্যিকেরা গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথকেও যে সম্পূর্ণ রূপে পান নাই, সমসাময়িক সাহিত্যে প্রত্যহ তাহার পরিচয় পাইয়া ব্যথিত হইতে হয়; চারিদিকে অসংখ্য মরশুমি ফুল দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য চক্ষু ধাঁধিয়া যায় বটে, কিন্তু সেই নিষ্ফল পুষ্পসম্ভার ঋতু অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যে বিলুপ্ত হইয়া যায়—আধুনিক স্বভ্যতার প্রচণ্ড গতিবেগে তাহার হিসাব রাখিবার সময় পাই না বলিয়াই আমরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠি না; পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য যে দিন নিঃশেষিত হইবে, বর্ত্তমানের ভয়াবহ নিষ্ফলতার শাস্তি সেই দিনই আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিব। 'কিছুদিন হইতে আমাদের সামান্য পুঁজিতে টান পড়িয়াছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইউরোপীয় মহাসমরের নিতান্ত অকারণ এবং গাঁ-পাতিয়া-লওয়া আঘাতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূর্ব্বতন ধারার সহিত আমাদের যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া নানা উৎসবের দ্বারা আমাদের সেই নষ্ট যোগসূত্র আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সেই হিসাবে এই সকল সভার সার্থকতা আমি স্বীকার করি।

আমি প্রথমেই আপনাদিগকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি শান্তিনিকেতনে ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি 'বাংলা ভাষা পরিচয়' নামক একটি পুস্তক রচনা করিতেছেন; এই পুস্তকে তিনি বাংলা ভাষার মূল এবং অন্তঃপ্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিতেছেন। প্রসঙ্গত তিনি বলিলেন, বাংলা ভাষার আসল কাঠামোটা প্রাকৃত অর্থাৎ খাঁটি বাংলা; সংস্কৃত এবং অন্যান্য বৈদেশিক ভাষা হইতে আহৃত শব্দসম্ভারে আমরা তাহাকে যতই সমৃদ্ধ করি না কেন, আজও পর্য্যন্ত তাঁহার দেশী প্রাণপ্রকৃতি অব্যাহত আছে। যে বাঙালী লেখক এই গোড়ার কথাটা বিস্মৃত হইবেন, তিনি যত শক্তিশালীই হউন, বাঙালীর অন্তর্লোকে প্রবেশপথ পাইবেন না। ঈশ্বর গুপ্তের আমলে সংস্কৃতের গহন অরণ্যে দিশা হারাইয়া নানা লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রই এই সত্য প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। ভাষা বিষয়ে বঙ্কিমের ত্রুটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—

"তৎপূর্ব্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধা সহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলাভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই জন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভেরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পূর্ব্বতন এণ্ট্রেন্স পাঠ্য বাংলাগ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য্য, কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

"এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কি যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।...তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধন রত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদর মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।"

এখানে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত প্রাচীনতম গদ্যের নমুনা যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ এপ্রিল তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ১৪ বৎসরের বালক মাত্র। একটু শুনাইতেছি—

"এখন যাহার রাজীব রাজী বিরাজিত শয্যাতেও নিদ্রা হয় না, জীবনান্তে সে ধুলি কর্দ্দম অস্থিকণাকীর্ণ

লক্ষ২ রক্ষো, যক্ষ ভূত প্রেতাদির বাসস্থান শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবেক। এবং যে অঙ্গ কোমল কমল স্পর্শনে বিশীর্ণ হয় সে অঙ্গে গৃধিনী চঞ্চু আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবেক, যে লপনেন্দু শতং শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মৃগাণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অণুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ঠক্ষণে কষ্ট পাইবেক।"

ঐ বৎসরের ১০ই জুলাই 'বর্ষাঋতু' বিষয়ক বঙ্কিমচন্দ্রের যে রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ভাষা আরও মারাত্মক। যথা—

"বিদ্যুল্লতা তুলিতা নবীনা কুমারী মাতৃরঙ্কাবলম্বন সদৃশ নবলতিকামালা মহামহীরুহরাজীকে অবলম্বন করিতেছে বৃক্ষলতা সুশোভিতা বসুন্ধরা সুন্দরী, বহুল কনকালঙ্কার মণ্ডিতা চন্দ্রললনা সঙ্কাশ প্রেক্ষণীয়া হইয়াছে, জলধর রস প্রাপনে পূর্ণ যৌবনা, বিশাল বেগবতী, ভীষণ কল্লোলোন্মত্তা, তরলতরঙ্গরঙ্গিণী, স্রোতস্বতী, স্বনাথ সাগরে শরীর সমর্পণ করিতেছে, হে নয়নযুগল! এতন্মনোরম পদার্থপুঞ্জে সন্দর্শন সার্থক হও।"

এই আদর্শে অগ্রসর হওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভার পক্ষেও কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অবসন্ন হইয়া বাংলা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ১২ বৎসর কাল বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় নীরব ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখিতে পাই, কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'Indian Field' নামক সাপ্তাহিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রচিত মূল ইংরেজী উপন্যাস *Rajmohan's Wife* ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগে পুরাপুরি ইংরেজীনবীশ হইতে চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যে একটা প্রচণ্ড বিপর্য্যয় সুরু হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাঞ্জল ও সুললিত গদ্য বঙ্গদেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'ও রক্ষণশীল পণ্ডিত-সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইংরেজীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠা লাভের লোভ ত্যাগ করিয়া 'তিলোত্তমা' 'মেঘনাদবধ', প্রভৃতি কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাদির সাহায্যে বাংলা সাহিত্য-দরবারে অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটিপদে বাহাল হন। তখন তাঁহার মনোবৃত্তি কিরূপ ছিল, তিনি স্বয়ং পরবর্ত্তী কালে (১৮৭০খ্রীঃ) বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়শনে প্রদত্ত A Popular Literature for Bengal বক্তৃতায় বর্ণনা করেন—

"আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতে অভিলাষী নহেন। যে তীব্র বুদ্ধি, তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক ছিঁড়ে ইংরেজের ভাতন ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারে। সে মনে করে, বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীনবৃত্তি মাত্র...।"

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বেনামি প্রবন্ধে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন—

"অর্দ্ধশিক্ষিত ক্ষিপ্ত লেখকগণই বাঙ্গালাগ্রন্থের প্রণয়নে ব্রতী। এই কার্য্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিজাতীয় ঘৃণা আছে। এবং ইহারা মাতৃভাষায় লেখা নিতান্ত অপমানজনক মনে করেন।"

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে মধুসূদন-প্যারীচাঁদ প্রবর্ত্তিত অভিনবত্বের ঢেউ বঙ্কিমচন্দ্রের গায়েও আসিয়া লাগিয়াছিল। নিষ্ঠার সহিত বিমাতার সেবা করিয়া মাতৃভক্ত বঙ্কিমের তৃপ্তি হয় নাই, *Rajmohan's Wife* রচনা করিয়া তাঁহার মনে ধিক্কার আসিয়া থাকিবে। কল্পনা তখনও দিগন্তবিস্তারী নয়। মূলধনও কম—বঙ্কিমচন্দ্র তথাপি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজেই নিজের ইংরেজী উপন্যাসের অনুবাদ করিতে বসিলেন। এক অধ্যায়, দুই অধ্যায়, তিন অধ্যায়—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে কোনও কিছুর পুনরাবৃত্তি সুখপ্রদ ও সহজসাধ্য নয়। অনুবাদ অগ্রসর হইল না। 'রাজমোহনের স্ত্রী' সূত্রপাতেই বিনিষ্ট হইল।

কিন্তু পাতা কয়টি রহিয়া গেল—সন্দিগ্ধ ক্রীড়াবনতা

প্রতিভার প্রথম লজ্জারুণ বিকাশ। একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই কয়েকটি পৃষ্ঠায় লক্ষণীয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র আদর্শে যে ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন ছিল, 'রাজমোহনের স্ত্রী' লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাকে নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। টেকচাঁদ ঠাকুর—প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা' এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' তখন তিনি দেখিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী কালে নিজেই বলিয়াছেন—

"আলালের ঘরের দুলালে"র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।...উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, এবং বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়...। এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালে"র পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

এই 'বাঙ্গালি লেখক' বঙ্কিমচন্দ্র নিজে। বিষয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যাসাগরী রীতি (কাদম্বরী ইহার চরম) এবং আলালী রীতির সমন্বয় সাধন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। *Rajmohan's Wife*-এর অনুবাদটুকু এই অপূর্ব্ব সমন্বয়-চেষ্টার প্রথম নিদর্শন হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান।

কিন্তু অভ্যাস তখনও প্রবল। অভ্যাস বশে পুরাতন রীতি আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং নূতন রীতি তখনও রপ্ত হয় নাই বলিয়া অনুকরণের দুর্ব্বলতা দেখা যাইতেছে। এই দ্বন্দ্ব দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝানো সহজ।

১। "এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রমণী কুসুম মধুমতী-তীরজ নহে—ভাগীরথী-কূলে রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক। তরুণীর আরক্ত গৌরবর্ণ ছটা মনোহ্যুত বা প্রগাঢ় চিন্তা প্রভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছিল। তথাচ যেমন মধ্যাহ্ন রবির কিরণে স্থলপদ্মিনী অর্দ্ধ প্রোজ্জ্বল, অর্দ্ধশুষ্ক হয়, রূপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরূপ কমনীয় ছিল; অতি বর্দ্ধিত কেশজাল অযত্নশিথিল গ্রন্থিতে স্কন্ধদেশে বদ্ধ ছিল। তথাপি অলক-কুন্তল সকল বন্ধন দশায় থাকিতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাদি ঘিরিয়া বসিয়াছিল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে নির্দ্দোষ বঙ্কিম ভ্রূযুগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নয়নপল্লবাবরণে লোচন যুগল সচরাচর অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখা যাইত; কিন্তু যখন সে পল্লব উর্দ্ধোত্থিত হইয়া কটাক্ষ স্ফুরণ করিত, তখন বোধ হইত যেন নৈদাঘ মেঘমধ্যে সৌদামিনী প্রভাপ্রকটিত হইল।"

২। "মাধব হাসিয়া কহিল, "শুধু এ সকল সুখের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি না, আমার কাজও আছে।

মথুর। কাজ ত সব জানি।—কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন গাড়ি—ঠক্ বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান—তেল পুড়ান—ইংরাজি নবিশ ইয়ারবক্শিকে মদ খাওয়ান—আর হয়ত রসের তরঙ্গে ঢলাঢল। হাঁ করিয়া ওদিকে কি দেখিতেছ? তুমি কি কখনও কন্‌কিকে দেখ নাই? না ওই সঙ্গের ছুঁড়িটা আসমান থেকে পড়েছে?—তাই ত বটে।"

প্রাচীন ও নবীন রীতির এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের আদিপর্ব্বের সমাপ্তি এবং ভবিষ্যৎ বঙ্কিম-প্রতিভার স্ফুরণ। আয়োজন এবং উপকরণ সম্পূর্ণ ছিল; ইংরেজী সাহিত্য ইতিহাস ও ভাষায় অসামান্য দখল, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার, বিদ্যাসাগর ও টেকচাঁদের আদর্শ। যুগান্তরের প্রতিভাস্পর্শে যে সৌধের ভিত্তি পত্তন হইল, সমগ্র বাঙালী জাতিকে যে তাহা একদিন আশ্রয় দিবে, সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে কে তাহা কল্পনা করিতে পারিয়াছিল?

ইহার পরেই বাংলা সাহিত্যের যুগ-পরিবর্ত্তনের শুভ-বৎসর। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

"১৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে এক দিন এক জন

অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষ কালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।"

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দিগন্ত সংস্থিত ঘোরতর অন্ধকারে স্বীয় প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রদর্শিত পথে বঙ্কিমচন্দ্র পথ চলিতে লাগিলেন।

"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।" —রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মোটেই অত্যুক্তি নয়।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম প্রকাশকাল হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র প্রথম ভাগ অনুশীলনের মুদ্রণ কাল পর্য্যন্ত মাত্র এই তেইশ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবন। এই সামান্য তেইশ বৎসরেই কি বিচিত্র সাধনা! অপরিপুষ্ট বাংলা ভাষা এই স্বল্প কালের মধ্যেই কি অপূর্ব্ব সুষমায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে! পূজা-মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি করিয়াই যে কাংস্যখণ্ডের সার্থকতা ছিল, তাহাই আমাদের দৈনন্দিন যাবতীয় প্রয়োজনের তাগিদ মিটাইতে সক্ষম হইল।

আমি নিজে বাংলা সাহিত্যের একজন দীন সেবক। 'আনন্দমঠে'র স্রষ্টা এবং "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রকে, ধর্ম্মতত্ত্ব-কৃষ্ণচরিত্র ও হিন্দুধর্ম্মের বিশ্লেষক বঙ্কিম-চন্দ্রকে, বাংলার সত্যকার ইতিহাস-রচনার পথপ্রদর্শক বঙ্কিমচন্দ্রকে আমি খুব মহৎ ও বিরাট বলিয়া জানি, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমচন্দ্রকে আরও বড় বলিয়া মনে করি। তাঁহার অপর সকল কীর্ত্তি যদি অবলুপ্ত হইয়া যায়, তথাপি শুধু এই এক কীর্ত্তির জোরেই তিনি অনন্তকাল অমর হইয়া থাকিবেন।

শুধু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন ইহার পুষ্টি সাধনে প্রত্যহ চেষ্টিত ছিলেন। বাংলা ভাষাকে সবল এবং প্রাত্যহিক প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য 'বঙ্গদর্শনে' যে আন্দোলন করিয়াছিলেন, আমরা আজিও তাহারই ফল ভোগ করিতেছি। 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'সীতারাম' পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার উত্তরোত্তর জয়যাত্রার ইতিহাস। অকারণ আড়ম্বর এবং অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার বর্জ্জন করিয়া তিনি ভাষাকে মনের ভাব যথাযথ প্রকাশের বাহন মাত্র মনে করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি ভাষা-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি—

"সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায়, আপনার মনের ভাব, সহজে, পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

"যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য। সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথম দেখিবে তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি কীর্ত্তির উল্লেখ করিব। তাহা তাঁহার মানুষ ও মনুষ্যজীবনের প্রশস্তি। মনুষ্যজীবনের রহস্যচিন্তার পরিপূর্ণ আলোকে তাঁহার উপন্যাস-কাব্যগুলি টলমল। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে বা পরে আর কোনও বাঙালী কবি এমন করিয়া দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনের গাথা গান করেন নাই; প্রাকৃতিক প্ররোচনায় মানুষের আত্মা এমন করিয়া দেহের দুয়ারে লুটাপুটি খায় নাই; মনুষ্য-হৃদয়ের চিন্তন আকুতি বিকল্পনায় মণ্ডিত হইয়া দেহ-ধর্ম্মের তাড়নায় এমন সুদুর্লভ দুর্ভাগ্য-মহিমা লাভ করে

নাই। ইউরোপের কাব্যলক্ষ্মী তথাকার সাহিত্যে মানুষের যে পরিচয়টিকে যুগযুগান্তর ধরিয়া দেহ-চেতনার মধ্য দিয়াই অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন, সে সাহিত্যের সেই গভীরতম প্রেরণা এমন করিয়া আর কোনও বাঙালী কবিকে আবিষ্ট করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে কামনার সেই সোমযাগ যে বেদীর উপরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা মনুষ্য-জীবনের রোমান্স; যে উপকরণসমষ্টির দ্বারা তিনি এই বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বাঙালীর জীবনেতিহাসে তাহা নিত্য প্রত্যক্ষ নয়—তথাপি একটু সহানুভূতি, একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়া সেই কবিমানসকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার বাস্তবতা আমাদিগকে বিস্ময়বিমূঢ় করিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসাধারণ মনুষ্যপ্রীতি ছিল বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে' আদর্শ মানবের সন্ধান করিতে পারিয়াছেন; স্বজাতি, স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে মানবের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের জয়গান করিয়াছেন। এই সাধনায় তিনি একক; বাংলা দেশে তাঁহার আর জুড়ি মিলিল না। যে ধর্ম্ম মানুষের সত্যকার প্রকৃতি বা 'চরিত্রগত স্বধর্ম্ম, যাহা জীবনের সর্ব্ববিধ প্রয়াসের মধ্যে সার্থক হইতে চায়—যে ধর্ম্ম জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্ম্মের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব-সাধনের উপায়, বঙ্কিম তাহাকেই বরণ করিয়াছিলেন এবং 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র মধ্য দিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীকে তাহাই বরণ করিতে বলিয়াছিলেন। মানভূম বঙ্কিম শতবার্ষিক সভায় আমি তাঁহার অপ্রকাশিত একটি ইংরেজী রচনা *Letters on Hinduism* সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতেও তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানুষের পূজাই একমাত্র ধর্ম্ম; মনুষ্যত্বের গৌরব তাঁহার সর্ব্বচিন্তার মূলে ছিল; নরনারায়ণকে তিনি উপাস্য জ্ঞান করিতেন। সেদিন শ্রীরামপুরে শতবার্ষিক সভায় আমি 'হিন্দুধর্ম্ম ও দেবতত্ত্ব' নামক বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি বিস্মৃত ও বিলুপ্ত গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছি। এই পুস্তকেও বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনুষ্য-প্রীতিই প্রকাশ পাইয়াছে। আমার বিশ্বাস, আজিকার এই দুর্দ্দিনে ভারতবর্ষের হিন্দুর বাঁচিবার একমাত্র উপায় বঙ্কিম-প্রদর্শিত এই মানবীয়তার আদর্শ অবলম্বন। আমরা যদি এই পথ অনুসরণ করিতে পারি, তবেই বঙ্কিমচন্দ্রের নামে অনুষ্ঠিত এই স্মৃতিসভাগুলি সার্থক হইবে। *

* বঙ্কিম-শতবার্ষিক সভায় পঠিত।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা

২৪এ ভাদ্র শনিবার সকাল ৭টায় মেদিনীপুরে অরোরা-সিনেমা-হলে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অধ্যাপক স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন এবং সভায় বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, শুভার আরম্ভে সে কবিতাটি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক পঠিত হয়। অতঃপর সজনীবাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাণী সভায় পাঠ করেন। পরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন, আই. সি. এস. তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণের পর সভাপতি স্যর রাধাকৃষ্ণণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন" সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর সকলে স্মৃতি-মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইলে সভাপতি কর্ত্তৃক মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এই সংখ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর-প্রশস্তি, বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, সভাপতি স্যর সর্ব্বপল্লীর বক্তৃতার সারমর্ম্ম ও ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করা গেল। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আদর্শ এত মহান যে তাঁর কাছে সমস্ত বাঙালী জাতি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতি এই মহাপুরুষের স্মৃতি-রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে সমস্ত জাতির ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাণী

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যূষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্যগঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি করি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজা তরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি প্রকাশ পেয়েছে মহাক্ষণে।

অধ্যাপক স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

অধ্যাপক স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া তাঁহার গদ্য-রচনার কথা ও তাঁহার শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—ভারতের নব-জাগরণে বিদ্যাসাগরের দানের কথা স্মরণ করিয়া কেবল তাহার জন্মভূমি মেদিনীপুর জেলা অথবা বাংলা দেশ গর্ব্ব করিতে পারে না, তাহা সমস্ত ভারতের গর্ব্বের বিষয়। এই জাগরণের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, এর অর্থ প্রাচীন আদর্শকে পুনরায় ফিরিয়া পাইতে চেষ্টা করা অথবা প্রাচীন কীর্ত্তির পুনরাবর্ত্তন নয়, এর অর্থ প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার সমঞ্জস-সাধন। এ দেশ যে এখনও পিছুনে পড়িয়া আছে, ইহার কারণ তাহার রক্ষণশীলতা। গতি ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে উন্নতিশীল জাতির পরিচয় পাওয়া যায়; যে জাতি উন্নত নয়, কেবল তাহারাই অগ্রগতির পথে বাধা দেয়। হিন্দু-ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, এর আত্মা অগ্রগতিকে স্বীকার করে। এ ধর্ম্মের অন্ধকার যুগ তখনই ছিল, যখন এর রক্ষকেরা প্রগতির বিরোধিতা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকদের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা পুরাতন ও জীর্ণ ভাবধারা বজায় রাখার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না, তাঁহারা নূতন চিন্তা ও কার্য্যের ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। রক্ষণশীল সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া

দাঁড়াইয়া বিদ্যাসাগর হিন্দুর আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যই আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার জীবন হইতে এই শিক্ষা আমরা পাইয়াছি যে, পাশ্চাত্যের সংস্পর্শ ব্যতীতও সমাজ-সংস্কারের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য আমাদের ধর্ম্মকে দোষ দেওয়া হয়। বলা হয়, এই ধর্ম্মবিশ্বাস আমাদের উন্নতির পথে বাধা দিয়া আমাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়াছে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ বলেন, আমরা যে-জীবনে সফল হইতে পারি না, তাহার কারণ আমরা এখনও অধ্যাত্মবাদকে পুরাপুরি স্বীকার করিতে পারি নাই। আত্মা ও জীবনের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়া আমরা কোনমতে উভয়কে মিলাইয়া চলিয়াছি। ধর্ম্ম বলিতে কেবল নিয়ম বা অনুষ্ঠানে বিশ্বাস বোঝায় না; ধর্ম্ম বলিতে শান্তিমূলক ব্যবস্থার অহেতুক ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত অনুজ্ঞার সমষ্টিও বুঝায় না। শান্তি ও প্রেমের জীবনই ধর্ম্ম। মানুষকে দুঃখ পাইতে দেখিলে প্রকৃত ধার্ম্মিক কখনও স্থির থাকিতে পারে না। সে রাজ্য চায় না, অর্থ চায় না, পুনর্জন্মেরও প্রত্যাশা করে না;—সে চায় পরের দুঃখ মোচন করিতে। কিন্তু সমাজের ব্যবস্থা এমনি যে, যে পুরুষ বা যে স্ত্রীলোক জীবন-সংগ্রামে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, অথবা ভাগ্যবিড়ম্বনায় প্রতারিত হইয়াছে তাহার জন্যও আমাদের তত দুঃখ হয় না, যত দুঃখ আমরা পাই পাখীকে ডানা ভাঙিয়া যাওয়ায় উড়িতে না দেখিলে। প্রকৃত ধার্ম্মিক নিষ্পীড়িতের প্রতি সহানুভূতিতে গলিয়া যায়—তাহার কাছে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই—সে নিজের জীবনকে পৃথিবীর দুঃখ সাধ্যমতে দূর করিবার জন্য উৎসর্গ করে। বিদ্যাসাগরের জীবনে আমরা এই ধর্ম্মপরায়ণতার পরিচয় পাই।

দেশের নারীর দুঃখে বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মবিশ্বাস বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। যে জাতির স্ত্রীলোক পুরুষের উপর প্রভুত্ব করে সে জাতি অবনতির পথে, কিন্তু যে জাতির স্ত্রীলোক পুরুষের তৈজসপত্রের অনুরূপ বিবেচিত হয় সে জাতি বর্ব্বর। বিদ্যাসাগর দেখিয়াছিলেন—ভারতে নারীজাতি সমাজে নির্যাতিত, সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের কবলে পড়িয়া নারীজাতির দুঃখের সীমা নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাদের পক্ষে দাঁড়াইলেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার ইহজগতের যা কিছু—সমস্তই তিনি নারীজাতির কল্যাণে নিয়োগ করিলেন। বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া, বহুবিবাহ নিবারণ করিয়া, স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তিনি আজ নারীজাতির প্রকৃত বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। দুর্দ্দমনীয় সাহসে তিনি সকল বাধা ও নির্যাতন অতিক্রম করিয়াছেন।

বাংলা গদ্যের জনক, সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ, বেথুন স্কুলের সম্পাদক, বিখ্যাত পণ্ডিত, বিশিষ্ট সংস্কারক গঠন-ব্রতী দেশপ্রেমিক—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের এই কর্ম্মধারার মধ্যে আমরা তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য আগ্রহের পরিচয় পাই। মেদিনীপুরে যে "স্মৃতি-মন্দির" নির্ম্মিত হইতেছে তাহা যেন বিদ্যাসাগরের গঠনমূলক দেশহিতৈষণার অনুপ্রেরণায় গঠিত ভারতের মঙ্গল-কেন্দ্র হয়, এই আশা প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত সুধীবৃন্দ,

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে আজিকার উৎসবে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।

মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন গৌরব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। মহাভারতের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ যুগ পর্য্যন্ত এই জেলার তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) পূর্ব্বভারতের প্রধান বন্দর ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান দুই বৎসর তাম্রলিপ্তে বাস করিয়া অনেক মূর্ত্তি ও বৌদ্ধ শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ও হিউ এনথ সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে এই জেলার বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও এই জেলা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। ১৫৭৪ সালে মোগল-পাঠানের যে ভীষণ যুদ্ধের পর বাংলায় মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই যুদ্ধ এই জেলারই মোগলমারী গ্রামে হইয়াছিল। আবার, ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যবিস্তারের প্রথম যুগে এই জেলার রসুলপুর নদীর মোহনায় হিজলী বন্দর পর্ত্তুগীজ-ডাচ ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর বাণিজ্য-তরীকে আশ্রয় দিয়াছে।

সাহিত্যের ইতিহাসেও মেদিনীপুর জেলার দান সামান্য নয়। বৈষ্ণব যুগে, এই জেলায় কয়েকজন বিখ্যাত কবির উদ্ভব হইয়াছে। 'চণ্ডী-মঙ্গল'-রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও মহাভারতের কবি কাশীরাম দাস এই জেলার দুই রাজবংশে প্রতিপালিত হইয়াছেন। 'শিবায়ন' রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও 'শীতলামঙ্গলে'র লেখক নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী এই জেলারই অধিবাসী। বাংলার আদি গদ্যলেখকগণের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই জেলাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে সংস্কৃতির যে অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন গৌরবকেও ম্লান করিতে পারে। তাঁহার মনুষ্যত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা জাতীয় জীবনের বহুযুগের তন্দ্রা ভাঙাইয়া তাহার সামাজিক চেতনা জাগাইয়াছে। তিনি বাংলা-ভাষাকে যে নূতন ছন্দ দিয়াছিলেন তাহাই বাঙালীর মনে নূতন ছন্দ ও গতি আনিয়া দিয়াছে। যখন পাঠ্যপুস্তক ছিল না, তখন তিনি বর্ণপরিচয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয় প্রভৃতি রচনা করিয়া ভবিষ্যৎ জাতিগঠনে মন দিয়াছেন। স্কুলের উপর তিনি দেশবাসীর সম্মুখে যে চরিত্রের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সাহস, সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তার দিক দিয়া চিরদিন জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণা যোগাইবে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাবে মেদিনীপুর জেলা তীর্থের গৌরব পাইলেও প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী যাবৎ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় নাই। গত বর্ষে, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মৃত্যু-বার্ষিক সভার পর এ বিষয়টীর আলোচনার জন্য একটি সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতি গঠিত হইয়া নিম্নলিখিত পরিকল্পনা অনুসারে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা স্থির হয়—

(১) বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের বাস্তুভিটার উপর স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করা। এই স্মৃতিমন্দিরে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইবে এবং স্মৃতিচিহ্নাদি রক্ষিত থাকিবে।

(২) বীরসিংহ যাইবার জন্য খড়ার হইতে বীরসিংহ পর্য্যন্ত জেলাবোর্ডের রাস্তাটিকে পাকা করা।

(৩) মেদিনীপুর সহরে "বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির" নির্ম্মাণ করা।

(৪) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত যাবতীয় রচনার একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করা।

(৫) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মৌলিক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধলেখককে প্রতিবৎসর বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক স্বর্ণপদক প্রদানের ব্যবস্থা করা।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এই এক বৎসরের মধ্যেই সমিতি এই সকল প্রস্তাবিত কার্য্যে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের ঐকান্তিক যত্নে বীরসিংহ হইতে খড়্গার পর্য্যন্ত রাস্তাটি আনুমানিক ৫০০০৲ ব্যয়ে পাকা করা হইয়াছে। সঙ্কলিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর 'সাহিত্য' খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'সমাজ' খণ্ডের মুদ্রণ আরম্ভ করা হইয়াছে। বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের বাস্তুভূমি অধিকার করা হইয়াছে এবং স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের জন্য অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছে।

সমিতির পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে যাঁহারা অকাতরে অর্থসাহায্য করিয়াছেন ঝাড়গ্রাম-রাজ নরসিংহ মল্লদেব তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর 'সাহিত্য' খণ্ডের প্রকাশের জন্য একক ২০০০৲ দান করিয়া তাঁহার মহানুভবতা ও সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। "বিদ্যাসাগর-স্মৃতি মন্দির" নির্ম্মাণের জন্য যাঁহারা অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

মহিষাদল রাজ এষ্টেট—	১২০০০৲
মেদিনীপুর জেলা বোর্ড—	৫০০০৲
সাহিত্য-পরিষদ্ জয়ন্তী পরিচালনা সমিতি—	৪০০০৲
সাহিত্য-পরিষদ্—	৩০০০৲
জেলা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি—	৫০০০৲
	৩০০০০৲

সমিতির সভ্যগণের পক্ষ হইতে ইহাদের সকলকেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও মেদিনীপুর জেলা-পল্লী-উন্নয়ন সমিতি যে অর্থসাহায্য করিয়াছেন, সে জন্য এই স্মৃতিমন্দিরে তাঁহাদের প্রত্যেকের ব্যবহারেরর জন্য দুইটি ঘর স্থায়ীভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। "বিদ্যাসাগর হলের" পরিচালনা ও তথায় সাধারণ সভার অধিবেশনাদি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত কমিটিও গঠিত হইতেছে।

এই স্মৃতিমন্দিরে যে হল থাকিবে তাহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৮০ ফুট ও প্রস্থে ৪০ ফুট। স্তম্ভ না করিয়া এরূপ হল নির্ম্মাণ করিতে ইঞ্জিনীয়ারিং নৈপুণ্য ব্যতীত প্ল্যান করা অসম্ভব। Concrete Association of India বিশেষ যত্নের সহিত এই স্মৃতিমন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এ বিষয়ে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট অফিসের শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস ও কলিকাতার ইঞ্জিনীয়ার মিঃ কে. এল. দে সমিতির যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই সৌধ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে যত কিছু Cement ব্যবহৃত হইবে তাহার জন্য Concrete Association যথেষ্ট rebate দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সমিতির পক্ষ হইতে ইহাদের প্রত্যেককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই স্মৃতিমন্দিরের জন্য আট বিঘা জমির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই জমি নামমাত্র খাজনায় ছাড়িয়া দিয়া সমিতির যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য মেদিনীপুরের অধিবাসিমাত্রেই গভর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

মেদিনীপুরের অধিবাসিগণের আজ বড়ই শুভদিন যে এত কাল পরে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের স্মৃতিপূজার উপযুক্ত আয়োজন সম্ভব হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রতি মেদিনীপুরবাসী আজ যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজাইয়াছে, সে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন বর্ত্তমান ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী—স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে মেদিনীপুরে আসিয়া তিনি সমস্ত মেদিনীপুর-বাসীকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আজ সকলের পক্ষ হইতে স্যর সর্ব্বপল্লীকে আমি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন

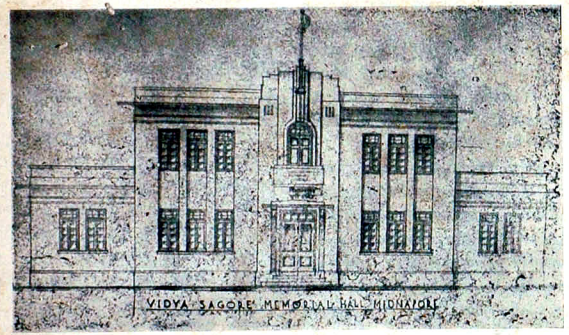

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরের পরিকল্পনা

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ একাত্তর বৎসর কাল বাংলা দেশে বর্ত্তমান থাকিয়া সমাজ, সাহিত্য ও রাষ্ট্র ব্যাপারে বিবিধ যুগান্তর ও মন্বন্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ঘনিষ্ঠভাবে কয়েকটি যুগান্তকারী আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ একমাত্র তিনিই বাংলা দেশের অতীত এবং বর্ত্তমান কাল-সমুদ্রের মাঝখানে নগাধি-রাজ হিমালয়ের মত মান-দণ্ডস্বরূপ অবস্থিত ছিলেন; বৃহৎ আয়তনের জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ মহিমায় দেখিতে পাই না বলিয়াই তাঁহার বিরাটত্ব সম্বন্ধে আমরা সজাগ নহি; আমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে তাঁহাকে দেখি এবং খণ্ডিত ভাবেই চমৎকৃত হই।

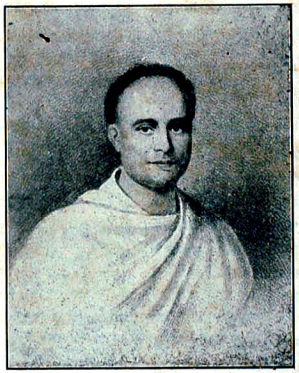

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সম্পূর্ণভাবে না দেখিতে পাওয়ার অপরাধ আমাদের নহে; তাঁহার যে-কয়টি জীবনী এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনটিতে তাঁহার সমগ্র জীবন অথবা সর্ব্ববিধ কীর্ত্তি আলোচিত হয় নাই; উপকরণের অভাবেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক মধ্যে মধ্যে বড় ফাঁক আছে। বিংশ শতাব্দীতে জীবনী-রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এই ফাঁক পুরাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত জীবনচরিতে তাঁহার বাল্যজীবন অর্থাৎ কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জীবনের পরিচয় পাই। আমি আমার 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে' সরকারী কাগজপত্র হইতে তাঁহার কর্ম্মজীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তাঁহার প্রচলিত জীবনচরিতগুলিতে তাঁহার শৈশবজীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার ছাত্রজীবনের সঠিক ইতিহাস এত দিন প্রায় অলিখিতই থাকিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সুযোগ্য শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগর-জীবন-চরিত' প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রজীবনের যে বিবরণ আছে, পরবর্ত্তী জীবনীকার-দের তাহাই উপজীব্য হইয়াছে। ইহাদের কেহই মূল উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করেন নাই, ফলে বিদ্যা-সাগরের ছাত্রজীবনের ইতিহাস নির্ভুল ও যথাযথ হইতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২৯ সনের ১লা জুন হইতে ১৮৪১ সনের মে মাস পর্য্যন্ত কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দ্বাদশ বৎসর পাঁচ মাস ব্যাপী ছাত্রজীবনের সঠিক ইতিহাস জানিতে হইলে সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র সযত্নে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এই কাজ ইতিপূর্ব্বে কেহ করেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংস্কৃত কলেজের পুরাতন চিঠিপত্র, মাহিনা ও বৃত্তির রসিদ-বই প্রভৃতির সাহায্যে বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিবার চেষ্টা করিলাম।

ব্যাকরণ-শ্রেণী—

১ জুন ১৮২৯ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া ১৮৩৩ সনের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার দেড় বৎসর পরে ১৮৩১ সনের মার্চ হইতে মাসিক ৫৲ বৃত্তি লাভ করেন। তিনটি বার্ষিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় তিন বারই নগদ টাকা ও পুস্তক পারিতোষিক পান।

ইংরেজী-শ্রেণী—

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৩০ সনে ইংরেজী-শ্রেণীতেও যোগ দেন। ১৮৩৩-৩৪ সনের ও পর বৎসরের বার্ষিক পরীক্ষায় পুস্তক পারিতোষিক পান।

সাহিত্য-শ্রেণী—

১৮৩৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এই শ্রেণীতে প্রবেশ করেন ও ১৮৩৫ সনের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এই দুই বৎসর মাসিক ৫৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৩৪-৩৫ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় কয়েকখানি পুস্তক পারিতোষিক পান। দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্যও স্বতন্ত্র পারিতোষিক পান।

অলঙ্কার-শ্রেণী—

১৮৩৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন এবং পূর্ব্ববৎ মাসিক ৫৲ বৃত্তি পান। ১৮৩৫-৩৬ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক পান।

জ্যোতিষ-শ্রেণী—

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রগণকে অন্ততঃ এক বৎসর জ্যোতিষ পড়িতে হইত। ঈশ্বরচন্দ্র এই শ্রেণীতেও অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন।

বেদান্ত-শ্রেণী—

অলঙ্কার-শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া ১৮৩৬ সনের মে মাসে ঈশ্বরচন্দ্র এই শ্রেণীতে যোগদান করেন। ১৮৩৭ সনের মে মাস হইতে তাঁহার বৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়া ৮৲ নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৮৩৭-৩৮ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় তিনি ১০৲ মূল্যের পুস্তক পারিতোষিক পান।

স্মৃতি-শ্রেণী—

১৮৩৮ সনের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র এই শ্রেণীতে প্রবেশ করেন ও এক বৎসর অধ্যয়ন করেন। ১৮৩৮-৩৯ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া নগদ ৮০৲ পুরস্কার পান এবং সংস্কৃত গদ্য-রচনার জন্য ১০০ টাকার আর একটি পুরস্কার পান। পরের দুই বৎসরও পদ্য-রচনার জন্য পারিতোষিক পান।

হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা—

সংস্কৃত কলেজে রীতিমত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করেন। সেকালে যাঁহারা জজ-পণ্ডিত হইতেন, তাঁহাদিগকে এই পরীক্ষা দিতে হইত। ১৮৩৯ সনের ২২ এপ্রিল এই পরীক্ষা হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী মে মাসে প্রশংসাপত্র পান।

ন্যায়-শ্রেণী—

১৮৩৯ সনের প্রথম ভাগে এই শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই বৎসর রচনা-প্রতিযোগিতায় তিনি ৫০৲ টাকার একটি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর অনধিক তিন বৎসর কাল ন্যায়-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন; বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি নানা বিষয়ে পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নগদ ১০০৲, পদ্য-রচনার জন্য নগদ ১০০৲, দেবনাগর-হস্তাক্ষরের জন্য ৮৲ এবং বাংলায় কোম্পানীর রেগুলেশন বিষয়ে পরীক্ষায় নগদ ২৫৲—সর্ব্বসাকল্যে ২৩৩৲ পাইয়াছিলেন।

বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে বিদ্যাসাগর কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

মেদিনীপুরে বঙ্কিম-শতবার্ষিকী

১০ই সেপ্টেম্বর, শনিবার বিকাল ৩টার সময় মেদিনীপুর-অরোরা-সিনেমা-হলে রিপন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্কিম শতবার্ষিক সভার অধিবেশন হয়।

উদ্বোধন সঙ্গীত ও অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বক্তৃতার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—এই মেদিনীপুরেই "বাল্যের স্মৃতির পুলকময় প্রতিবেশ হইতে বঙ্কিম তাহার অমর রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বগ্রাহিকাশক্তি অতি নগণ্য উপাদানকে সুন্দরতর শোভনতর করিয়াছে। বাল্যের লীলাচঞ্চল দিনগুলি তাঁহার এদেশেই কাটিয়াছে, আমরা তাহা স্মরণে আনিয়া কতই না গর্ব্ব অনুভব করি! তাহার 'কপালকুণ্ডলা' বাঙ্গালা সাহিত্যের অতুল সম্পদ; তাহার সূচনা এই মেদিনীপুরেই। এই মেদিনীপুরের রহস্যময়ী প্রকৃতি বঙ্কিমকে কতই না সম্ভার যোগাইয়াছে!

"যে সাধনা বঙ্কিম বিদায়ের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত জাতি করিয়াছে তাহা বিশ্বের দরবারে মোটেই অপ্রচুর নয়। যিনি অনাগত জনের জন্য প্রথম বাণী রচনা করিয়া যান, তাঁহার কল্পনায় অনাগত সৃষ্টির কিরীট হিসাবেই প্রতীয়মান হয়। বঙ্কিম চাহিয়াছিলেন আমাদের এই জাতিকে সৃষ্টির কিরীটতুল্য করিতে। তাঁহার সে কল্পনা তাঁহার সে বাণী বিশ্বের দরবারে বরণীয় হইয়াছে।"

সভাপতি মহাশয় অতঃপর তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

তিনি অভিভাষণে বলেন—

"বঙ্কিমচন্দ্রের উপর মেদিনীপুরের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের আরও দাবী আছে এবং বিশেষ ঘনিষ্ঠ দাবীই আছে। কারণ আপনারা বোধ করি অনেকেই জানেন বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশবজীবনে শিক্ষার প্রথম উন্মেষ এই মেদিনীপুরেই হইয়াছিল। যে অলৌকিক প্রতিভা উত্তরজীবনে সমগ্র বাঙ্গালাকে উদ্ভাসিত ও চমৎকৃত করিয়াছিল, তাহার প্রথম শৈশবের স্ফুরণ এই মেদিনীপুরেই হইয়াছিল, ইহা মেদিনীপুরের কম গৌরবের কথা নহে; এবং বঙ্কিমের উপরে এই নিবিড় স্নেহবন্ধনের দাবী হইতে কেহই মেদিনীপুরকে বঞ্চিত করিতে পারে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে সভাপতি বলেন—"কৈশোর বয়স হইতেই বঙ্কিমের সাহিত্যরচনার দিকে ঝোঁক ছিল, পনের ষোল বৎসর বয়সেই তিনি "ললিতা ও মানস" পদ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ছাব্বিশ বৎসরের সময়ে তাঁহার এক ইংরাজী উপন্যাস "Rajmohan's Wife" নামে প্রকাশিত হইতেছিল; সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পরেই তিনি রীতিমত সাহিত্য-চর্চ্চাতে মনোনিবেশ করিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকেই স্বভাবতঃ তাঁহার মন প্রথমেই ঝুঁকিল; কারণ জাতীয় চেতনাকে জাগাইতে অতীত ইতিহাসকে মানসপটে ফুটাইয়া তুলিতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ন্যায় বোধ করি আর দ্বিতীয় অস্ত্র নাই; জাতীয়তার পূজারী বঙ্কিমচন্দ্র তাই ইতিহাসের নানান্ স্তর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন—জাতীয় গৌরবের কি কি অধ্যায় তিনি উদ্ঘাটিত করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে। মাত্র যখন তাঁহার সাতাশ বৎসর বয়স তখন বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের এই প্রথম উপন্যাসেই বঙ্গীয় সমাজ চমৎকৃত হইল, সমগ্র জাতির মধ্যে এক বিষম চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "যখন 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল।" তারপর এক বৎসর দুই বৎসর অন্তর অন্তরই বঙ্কিমের এক একখানি প্রাণোন্মাদক উপন্যাস বাহির হইতে লাগিল আর বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের এক একখানি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা লোকচক্ষের সমুক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। "কপালকুণ্ডলা" বাহির হইল, "মৃণালিনী" বাহির হইল, কিছু দীর্ঘ অবকাশের পরে "চন্দ্রশেখর" বাহির হইল; আরও পরিণত বয়সে "রাজসিংহ" "আনন্দমঠ" "দেবীচৌধু-

রাণী" ও "সীতারাম" প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালায় রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে বঙ্কিমের এই ঐতিহাসিক উপন্যাস-পরম্পরা এক অভিনব বিপ্লব আনয়ন করিল। * *

"কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল নবনবোন্মেষশালিনী—শুধু এক দিকেই ইহা আবদ্ধ ছিল না। মনীষা ছিল তীক্ষ্ণ, চিত্ত ছিল পৌরুষপূর্ণ, মেরুদণ্ড ছিল দৃঢ়। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে, চিন্তারাজ্যের বিভিন্ন দিকে তাই স্বতঃই তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইত।

"বঙ্কিমের এই যে বহুমুখী প্রতিভা ইহা প্রথম প্রকটিত হইল 'বঙ্গদর্শনে'। 'বঙ্গদর্শন' পত্র যখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহার বয়স কত? চৌত্রিশ বৎসর মাত্র। ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, এই বয়সেই বাঙ্গালী জাতি বঙ্কিমচন্দ্রকে চিন্তা ও ভাবের জগতে অন্যতম নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। প্রতিভার বাস্তবিকই অদ্ভুত শক্তি। এই 'বঙ্গদর্শন' পত্র বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র চারি বৎসর কাল সম্পাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই পত্রিকা তাঁহার বিচিত্র প্রবন্ধসম্ভারে, তাঁহার সমালোচনার নিপুণতা ও অকুতোভয়তায়, তাঁহার সাহিত্যিক গৌরবে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ও যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা বোধ হয় অন্য কোন এবংবিধ সাময়িক পত্রিকার ভাগ্যে ঘটে নাই। মাসিক পত্রের রাজ্যে উহা যেন একটা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। বঙ্কিম নিজে তো বহু প্রবন্ধ উপন্যাস, সমালোচনাদি উহাতে লিখিতেনই; আর তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল নূতন নূতন শক্তিশালী লেখককে উৎসাহ দান করিয়া তাহাদের সাহিত্যিক প্রতিভা স্ফুরিত করিতে। কত নবীন লেখক বঙ্কিমের আহ্বানে 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়া হাত পাকাইয়াছেন এবং উত্তরজীবনে যশস্বী সাহিত্যিক হইয়াছেন।

"বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের নানা বিভাগেই লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উপন্যাস "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "ইন্দিরা" প্রভৃতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন; 'বঙ্গদর্শন' পত্রে যুগপৎ সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্য সমালোচনা করিতে লাগিলেন, কত বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, রস-রচনাই বা কত লিখিলেন, তাহার "ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল", তাঁহার "ইংরাজ-স্তোত্র", তাঁহার "সুবর্ণগোলক", তাঁহার "ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করা"র ব্যবস্থা ইত্যাদি পাঠক সমাজে হাস্যের তরঙ্গ তুলিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার খোরাকও যোগাইল কিছু কম না, তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি "কমলাকান্তের দপ্তর" দেশবাসীকে উপহার দিলেন। সম্ভবতঃ ঔপন্যাসিক ও কথা-শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে তাঁহার দানকে কিয়ৎ পরিমাণে নিষ্প্রভ করিয়াছে, কিন্তু আমার তো মনে হয় প্রবন্ধকার হিসাবে বঙ্কিমের স্থান অতি উচ্চে। "বাঙ্গালীর বাহুবল", "ভারত-কলঙ্ক", "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার", "বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা", "সাম্য", "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রভৃতি রচনার সরসতায় ভাবের গাম্ভীর্য্যে যুক্তির স্বচ্ছতায় এবং ভাষার স্পষ্টতায় অপূর্ব্ব উপভোগ্য সামগ্রী; আর এই সমস্ত লেখার ভিতরেই মাঝে মাঝে কৌতুক রসের সমাবেশ রচনাকে অতীব উপাদেয় করিয়া তুলে।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত রাধারমণ কর, শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিতা পাঠ করেন। পরে ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাল-পরিবেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের "সুবর্ণগোলক" আবৃত্তি করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। পরে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সাহার নেতৃত্বে গান-বাজনার ও শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বঙ্কিমের পুস্তক হইতে কয়েকটি দৃশ্য নাট্যাভিনয় হয়।

বঙ্কিম-উৎসবের সঙ্গে বঙ্কিমের প্রায় সমস্ত পুস্তকের প্রথম সংস্করণ, বঙ্কিমের লেখা পত্র, বঙ্কিমের ব্যবহৃত দোয়াত প্রভৃতির একটি প্রদর্শনী হয়।

পল্লী-উন্নয়ন

মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মেমোরিয়েল এসোসিএশন

কার্য্য-বিবরণী

কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত মুগবেড়িয়া গ্রামের পরোপকারী ও দানশীল জমিদার স্বর্গগত গঙ্গাধর নন্দের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গ "গঙ্গাধর মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিএশন" (Gangadhar Memorial Social Welfare Association) নামে এক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ছয় বৎসর কার্য্য করার পর, গত ১৯৩৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, শতাধিক কর্ম্মী ও সুগঠিত নিয়মাবলী সহ প্রতিষ্ঠানটিকে ১৮৬০ সালের সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন আইনের ২১ ধারা অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত করা হয়।

এ পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা জনসেবা, লোকশিক্ষা পল্লী-উন্নয়ন সংক্রান্ত যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

১। রিলিফ (Relief) ও সেবা-কার্য্য।

(ক) ১৯৩১ সালে বন্যা-বিধ্বস্ত উত্তর পূর্ব্ববঙ্গের নরনারীর সাহায্যে ৮২৭৶০ ও ১০০০ খানি কাপড় সংগ্রহ করা হয় ও স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করা হয়।

(খ) ১৯৩৩ সালে কাঁথি মহকুমায় অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য শস্যহানি হইলে, ৪৬টি গ্রামের প্রজাগণকে মাসাধিক-কাল চাউল ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করা হয়।

(গ) ১৯৩৭ সালে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়া কেলেঘাই নদীর বন্যা হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিকে রক্ষা করা হয়।

(ঘ) বর্ত্তমান বর্ষে, ভগবানপুর থানার অন্তর্গত পাথরবেড়্যা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে বিপন্ন ২১টি পরিবারকে মাসাধিক কাল আহারাদি দেওয়া হয় এবং গৃহনির্ম্মাণের জন্য আবশ্যক সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করা হয়।

(ঙ) স্থানীয় মেলায় প্রতি বৎসর পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হয়।

২। গঠন-মূলক কার্য্য

(ক) আট বিঘা জমির মধ্যস্থলে প্রায় চার বিঘা আয়তনের একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া এবং দুই দিকে পাকা ঘাট বাঁধাইয়া সুন্দর পার্ক (Park) নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পার্কের এক পার্শ্বে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

(খ) সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পুস্তকাগারে মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। বর্ত্তমানে পুস্তকের সংখ্যা ১২৫০। এখানে কাহাকেও চাঁদা দিতে হয় না।

(গ) বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে বালিকাগণ ভবিষ্যতে আদর্শ-গৃহিণী হইতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে সূচিকার্য্য, রন্ধন, পশম ও কার্পেটের কাজ, বয়ন, সীবন, গোপালন, সঙ্গীত ও ব্যায়াম বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম্ম ও শিশু-পালন বিষয়ে উপদেশ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, বিনা-বেতনে, মশারি, শাড়ী, দড়ির আসন, জ্যাকার্ড মেসিনে (Jacquard machine) কাপড়বোনা, রং করা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঙ) একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

(চ) শারীরিক উন্নতি ও মানসিক আমোদ-প্রমোদের জন্য একটি "ক্লাব" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ছ) পানীয় জল সরবরাহের জন্য, দুইটি নলকূপ খনন করা হইয়াছে।

৩। শিক্ষামূলক প্রচার-কার্য্য

প্রতি বৎসর "গঙ্গাধর মেলা" নামে সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইতেছে। ইহাতে কৃষি, শিল্প,

স্বাস্থ্য, সমবায়, গোপালন, শিশুমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণকে চার্ট, চিত্র, পুতুল ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছায়াচিত্র, সিনেমা, কীর্ত্তন, কথকতা, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদির আয়োজন করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মূল নীতি প্রচার করা হয়।

১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং পরে চার বৎসর বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা দিয়া প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করিয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, প্রতিষ্ঠানটি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী নির্ব্বেদানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হইয়াছে। গত ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত এই এসোসিএশন-র খরচ হইয়াছে ১৫৯৬৫।১৫। ইহার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের দান—৭০৫৲; বাকী সমস্তই সভ্যগণের চাঁদা ও সাধারণের অর্থসাহায্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীশরৎচন্দ্র মিশ্র,
সম্পাদক।

মাণিকপাড়ায় পল্লী-সংস্কার

গত ১৯৩৭ সালের ৩১এ অক্টোবর তারিখে ঝাড়গ্রাম মহকুমা পল্লী-সংগঠন-সমিতি স্থাপিত হইয়া যে কয়েকটি কেন্দ্রে পল্লী-মঙ্গল-কার্য্য আরম্ভ করা স্থির হয়, মাণিকপাড়া তাহাদের অন্যতম। এই গ্রামের কার্য্য-পরিচালনার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত বনবিহারী রাণা তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সমিতি গ্রামের অবস্থা আলোচনা করিয়া একটি পরিকল্পনা স্থির করেন এবং তদনুসারে প্রথমেই গ্রামের নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়কে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টার সহিত জেলা বোর্ডের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার সংযোগ হওয়ায় ইহা সহজেই সম্পন্ন হইয়াছে। সমিতির চেষ্টায় গ্রামে একটি পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির সভ্যগণ কায়িক পরিশ্রম করিয়া গ্রামের ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছেন এবং পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য একটি কূপ খনন করিয়াছেন। শেষোক্ত কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের নিকট হইতে যথাক্রমে ৪০০৲ ও ২০০৲ অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। গ্রামে যে দাতব্য চিকিৎসালয়টি পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল সেখানে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জন্য সমিতি ৪০০৲ অর্থ-সাহায্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। গ্রামবাসী যাহাতে নির্ম্মল আমোদ ও ক্রীড়াকৌতুক উপভোগ করিতে পারে সেজন্য সমিতির চেষ্টায় একটি খেলার মাঠ ও ক্লাব-ঘর স্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন্য গ্রামবাসিগণ ৪০০৲ ও গভর্ণমেণ্ট ৮০০৲ অর্থসাহায্য দিয়াছেন।

শ্রীযামিনীকান্ত বক্সী
সম্পাদক, ঝাড়গ্রাম মহকুমা-পল্লী-সংগঠন সমিতি।

সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দত্ত
মেদিনীপুর লক্ষ্মী প্রেস হইতে শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পল্লী-শ্রী

১ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৪৫ [৫ম সংখ্যা

চলার বেগ

অনেক শতাব্দী আগের কথা। মানুষ তখন হেঁটেই চলাফেরা করত। তখন রাস্তাঘাট তৈরী হয় নি—পদে পদে ঝোপ ঝাড়, খানা পাথর, নালা ডোবা প্রভৃতি চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত। তখন মানুষের সাধ্য ছিল না ঘণ্টায় গড়ে দু'মাইলের বেশি চলবার। ক্রমে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে আস্তে আস্তে রাস্তাঘাট তৈরী হ'তে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে চলার বেগও গেল বেড়ে। সভ্যতা যত বাড়তে লাগল—মানুষেরও তত উন্নতি আরম্ভ হ'ল। মানুষ ঘোড়া রাখতে শিখল, গাড়ী তৈরী হ'ল, রাস্তায় রাস্তায় সাঁকো তৈরী হ'ল। মানুষের চলার বেগ এখন ঘণ্টায় ৮।১০ মাইল পর্য্যন্ত সম্ভব হইল।

এমনি ক'রে কয়েক শতাব্দী কেটে যাবার পর এল—রেলগাড়ী। যখন রেলগাড়ী চালাবার ব্যবস্থা করা হয়, তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় ১২।১৩ মাইল হবে শুনে সেকালের লোক তো অস্থির। তাদের ধারণা হ'ল, এত জোরে গাড়ী চললে আশেপাশের লোক পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রমে সব ভয় কেটে গেল, দেখতে পেলে রেলগাড়ী হওয়ার ফলে তার গতিবেগ অনেক বেড়ে গেছে।

উনিশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে মানুষের চলাফেরার বেগ অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে চলে। জাহাজ তৈরী হওয়ায় জলের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু তবু সে বেগ স্থলে চলার বেগের কাছে কিছু নয়। রেল ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বেগে চলতে লাগল। এখন মোটর গাড়ীরও সৃষ্টি হয়ে গেছে, মোটরও রেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে সুরু করল।

তার পরের শতাব্দীর কথা। মানুষ এখন আকাশে ওড়বার বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে। এখন সৃষ্টি হ'ল এরোপ্লেনের। এরোপ্লেন আসার সঙ্গে বেগেরও নূতন যুগ এসে গেল। প্রথম প্রথম এরোপ্লেন বেশি দূর যেতে পারত না; তার ডানা রেশম দিয়ে ঢাকা থাকত ব'লে ঝড় বৃষ্টিতে তার বিপদের আশঙ্কা ছিল, আগুন লাগার ভয় ছিল। কিন্তু মানুষের অদম্য উৎসাহের কাছে এ সমস্ত বাধা দূর হ'তে কয়দিন লাগে? ক্রমে এরোপ্লেনের জন্য ধাতু নির্ম্মিত ডানার সৃষ্টি হ'ল, তার ইঞ্জিনের উন্নতি হল। এখন ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে এরোপ্লেন চালানো নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। রেল, মোটর প্রভৃতিও এরোপ্লেনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে নিজেদের গতি বাড়াতে আরম্ভ করলে। মোটরের গতি ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১৫০ মাইল হওয়া সম্ভব হ'ল, রেলও ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে চলতে লাগল।

কিন্তু এরোপ্লেনের বেগ বেড়েই চলেছে। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে তৈরী এরোপ্লেন ঘণ্টায় ১০।২০০ মাইল চলতে আরম্ভ করল। রেলগাড়ী, মোটরও পেছিয়ে যাবে কেন? মোটরওয়ালারা পরীক্ষা ক'রে দেখলে বাতাসের বাধায় গাড়ীর বেগ অনেক কমে যায়, অমনি মোটরের চেহারা বদলে গেল। টায়ার ভাল হ'ল, ইঞ্জিনেরও উন্নতি হ'ল। রাস্তা ভাল না হ'লে যথেষ্ট বেগে মোটরগাড়ী চালান নিরাপদ নয় ব'লে রাস্তার অনেক উন্নতি হ'তে লাগল। শেষে একটা বড় রেসে ২১৫ মাইল বেগে চ'লে মোটরগাড়ী সকলকে তার গতি জানিয়ে দিল। মোটরের দেখাদেখি রেলগাড়ীর চেহারাও বদলে যেতে লাগল। হাল্কা ধাতু দিয়ে গাড়ী তৈরী হ'ল, দরজা-জানালা এঁটে বন্ধ করার ব্যবস্থা হ'ল, চারিদিকে রবার আর স্প্রিং দিয়ে ঝাঁকানি আর আওয়াজ কমাবার ব্যবস্থা করা হ'ল।

স্বাস্থ্য, সমবায়, গোপালন, শিশুমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণকে চার্ট, চিত্র, পুতুল ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছায়াচিত্র, সিনেমা, কীর্ত্তন, কথকতা, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদির আয়োজন করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মূল নীতি প্রচার করা হয়।

১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং পরে চার বৎসর বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা দিয়া প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করিয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, প্রতিষ্ঠানটি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী নির্ব্বেদানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হইয়াছে। গত ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত এই এসোসিএশন-র খরচ হইয়াছে ১৫৯৬৫।১৫। ইহার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের দান—৭০৫৲; বাকী সমস্তই সভ্যগণের চাঁদা ও সাধারণের অর্থসাহায্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীশরৎচন্দ্র মিশ্র,
সম্পাদক।

মাণিকপাড়ায় পল্লী-সংস্কার

গত ১৯৩৭ সালের ৩১এ অক্টোবর তারিখে ঝাড়গ্রাম মহকুমা পল্লী-সংগঠন-সমিতি স্থাপিত হইয়া যে কয়েকটি কেন্দ্রে পল্লী-মঙ্গল-কার্য্য আরম্ভ করা স্থির হয়, মাণিকপাড়া তাহাদের অন্যতম। এই গ্রামের কার্য্য-পরিচালনার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত বনবিহারী রাণা তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সমিতি গ্রামের অবস্থা আলোচনা করিয়া একটি পরিকল্পনা স্থির করেন এবং তদনুসারে প্রথমেই গ্রামের নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়কে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টার সহিত জেলা বোর্ডের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার সংযোগ হওয়ায় ইহা সহজেই সম্পন্ন হইয়াছে। সমিতির চেষ্টায় গ্রামে একটি পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির সভ্যগণ কায়িক পরিশ্রম করিয়া গ্রামের ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছেন এবং পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য একটি কূপ খনন করিয়াছেন। শেষোক্ত কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের নিকট হইতে যথাক্রমে ৪০০৲ ও ২০০৲ অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। গ্রামে যে দাতব্য চিকিৎসালয়টি পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল সেখানে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জন্য সমিতি ৪০০৲ অর্থ-সাহায্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। গ্রামবাসী যাহাতে নির্ম্মল আমোদ ও ক্রীড়াকৌতুক উপভোগ করিতে পারে সেজন্য সমিতির চেষ্টায় একটি খেলার মাঠ ও ক্লাব-ঘর স্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন্য গ্রামবাসিগণ ৪০০৲ ও গভর্ণমেণ্ট ৮০০৲ অর্থসাহায্য দিয়াছেন।

শ্রীযামিনীকান্ত বক্সী
সম্পাদক, ঝাড়গ্রাম মহকুমা-পল্লী-সংগঠন সমিতি।

সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দত্ত
মেদিনীপুর লক্ষ্মী প্রেস হইতে শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পল্লী-শ্রী

১ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৪৫ [৫ম সংখ্যা

চলার বেগ

অনেক শতাব্দী আগের কথা। মানুষ তখন হেঁটেই চলাফেরা করত। তখন রাস্তাঘাট তৈরী হয় নি—পদে পদে ঝোপ ঝাড়, খানা পাথর, নালা ডোবা প্রভৃতি চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত। তখন মানুষের সাধ্য ছিল না ঘণ্টায় গড়ে দু'মাইলের বেশি চলবার। ক্রমে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে আস্তে আস্তে রাস্তাঘাট তৈরী হ'তে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে চলার বেগও গেল বেড়ে। সভ্যতা যত বাড়তে লাগল—মানুষেরও তত উন্নতি আরম্ভ হ'ল। মানুষ ঘোড়া রাখতে শিখল, গাড়ী তৈরী হ'ল, রাস্তায় রাস্তায় সাঁকো তৈরী হ'ল। মানুষের চলার বেগ এখন ঘণ্টায় ৮।১০ মাইল পর্য্যন্ত সম্ভব হইল।

এমনি ক'রে কয়েক শতাব্দী কেটে যাবার পর এল—রেলগাড়ী। যখন রেলগাড়ী চালাবার ব্যবস্থা করা হয়, তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় ১২।১৩ মাইল হবে শুনে সেকালের লোক তো অস্থির। তাদের ধারণা হ'ল, এত জোরে গাড়ী চললে আশেপাশের লোক পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রমে সব ভয় কেটে গেল, দেখতে পেলে রেলগাড়ী হওয়ার ফলে তার গতিবেগ অনেক বেড়ে গেছে।

উনিশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে মানুষের চলাফেরার বেগ অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে চলে। জাহাজ তৈরী হওয়ায় জলের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু তবু সে বেগ স্থলে চলার বেগের কাছে কিছু নয়। রেল ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বেগে চলতে লাগল। এখন মোটর গাড়ীরও সৃষ্টি হয়ে গেছে, মোটরও রেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে সুরু করল।

তার পরের শতাব্দীর কথা। মানুষ এখন আকাশে ওড়বার বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে। এখন সৃষ্টি হ'ল এরোপ্লেনের। এরোপ্লেন আসার সঙ্গে বেগেরও নূতন যুগ এসে গেল। প্রথম প্রথম এরোপ্লেন বেশি দূর যেতে পারত না; তার ডানা রেশম দিয়ে ঢাকা থাকত ব'লে ঝড় বৃষ্টিতে তার বিপদের আশঙ্কা ছিল, আগুন লাগার ভয় ছিল। কিন্তু মানুষের অদম্য উৎসাহের কাছে এ সমস্ত বাধা দূর হ'তে কয়দিন লাগে? ক্রমে এরোপ্লেনের জন্য ধাতু নির্ম্মিত ডানার সৃষ্টি হ'ল, তার ইঞ্জিনের উন্নতি হ'ল। এখন ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে এরোপ্লেন চালানো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। রেল, মোটর প্রভৃতিও এরোপ্লেনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে নিজেদের গতি বাড়াতে আরম্ভ করলে। মোটরের গতি ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১৫০ মাইল হওয়া সম্ভব হ'ল, রেলও ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে চলতে লাগল।

কিন্তু এরোপ্লেনের বেগ বেড়েই চলেছে। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে তৈরী এরোপ্লেন ঘণ্টায় ১৫০।২০০ মাইল চলতে আরম্ভ করল। রেলগাড়ী, মোটরও পেছিয়ে যাবে কেন? মোটরওয়ালারা পরীক্ষা ক'রে দেখলে বাতাসের বাধায় গাড়ীর বেগ অনেক কমে যায়, অমনি মোটরের চেহারা বদলে গেল। টায়ার ভাল হ'ল, ইঞ্জিনেরও উন্নতি হ'ল। রাস্তা ভাল না হ'লে যথেষ্ট বেগে মোটরগাড়ী চালান নিরাপদ নয় ব'লে রাস্তার অনেক উন্নতি হ'তে লাগল। শেষে একটা বড় রেসে ২১৫ মাইল বেগে চ'লে মোটরগাড়ী সকলকে তার গতি জানিয়ে দিল। মোটরের দেখাদেখি রেলগাড়ীর চেহারাও বদলে যেতে লাগল। হাল্কা ধাতু দিয়ে গাড়ী তৈরী হ'ল, দরজা-জানলা এঁটে বন্ধ করার ব্যবস্থা হ'ল, চারিদিকে রবার আর স্প্রিং দিয়ে ঝাঁকানি আর আওয়াজ কমাবার ব্যবস্থা করা হ'ল।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল ঘণ্টায় ১২০-১৩০ মাইল বেগে রেলগাড়ী চালানো সম্ভব। ভবিষ্যতে এর গতি আরও বাড়তে পারবে।

এরোপ্লেনের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। জলে, স্থলে যেখানে ইচ্ছা নামানো যায়—এমন ভাবে নূতন এরোপ্লেন তৈরী হচ্ছে; শূন্যে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকতে পারে, ছাতের ওপরও আবশ্যক হ'লে নামতে পারে এমন এরোপ্লেনও তৈরী হচ্ছে।

এ সব কথার আলোচনা করলে মনে হয়, যে ভাবে চলাফেরার বেগ বেড়ে চলেছে, শেষটায় না জানি কি দাঁড়াবে গিয়ে!

কথায় বলে "বিংশ শতাব্দী বেগের যুগ।" সব কাজ তাড়াতাড়ি করবার নেশা মানুষকে পেয়ে বসেছে। বেগের নেশার সঙ্গে রেকর্ড সৃষ্টি করার নেশাও রয়েছে। খেলাধূলার জগতে প্রতিদিন এর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য অনেক বিষয়েও সকলের ওপরে হবার একটা নেশা সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। কে কতক্ষণ সাইকেল চালাতে পারে, কতক্ষণ সাঁতার কাটতে পারে, কতক্ষণ নাচতে পারে, কতক্ষণ দাঁড় টানতে পারে, কতক্ষণ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—এমনই কত প্রতিযোগিতার খবর প্রতিদিনই পাওয়া যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার ফলে কলকারখানার কত উন্নতি হচ্ছে এবং এই সমস্ত কলের কাজ করার ক্ষমতাও বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। এখানেই কিন্তু মানুষের আবিষ্কার মানুষকে কাবু ক'রে ফেলেছে। সে কথা আজ আর নয়। পরে কোন এক প্রবন্ধে আলোচনা করা যাবে।

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় বেতারের, অস্ত্র-চিকিৎসার, ফোটোগ্রাফির এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এ সমস্ত বিষয়ের উন্নতি এখনও হচ্ছে। যে দিক দিয়েই দেখা যায়, মানুষের চলার বিরাম নেই। তবে প্রকৃতির খেয়ালে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা ইত্যাদি এসে মানুষের অহঙ্কারকে চূর্ণ ক'রে দেয়। আজও মানুষ এ সব জয় করতে শেখে নি।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য

আমাদের শরীর একটি ইঞ্জিনবিশেষ। ইঞ্জিনের কলকব্জা পরিষ্কার না থাকলে যেমন ইঞ্জিন চলতে পারে না, তেমনি দেহের কলকব্জা খারাপ হ'লে দেহও অচল হয়ে পড়ে। শরীর ভাল রাখবার যা কিছু উপাদান সে সমস্তই আছে রক্তের ভিতর। খাদ্য থেকেই এই রক্তের সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ এই রক্ত নির্ম্মলভাবে শরীরের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, ততক্ষণ কোন রোগ দেখা যায় না, রক্তের মধ্যে ময়লা এসে জমলে শরীরে রোগ দেখা দেয়।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে, খাদ্য থেকেই রক্ত তৈরী হয়। যা খাওয়া যায় সে সব সম্পূর্ণ জীর্ণ হ'লে, পরিপাক রসের সঙ্গে মিলে তার এক প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। ক্রমশ এর রূপান্তর হয়ে রক্তের সৃষ্টি হয়। অতএব আমাদের এমন সব জিনিস খাওয়া উচিত যা সহজে জীর্ণ হয়;—প্রচুর খেলে অম্ল উদ্গার হয়ে শরীরে অবসাদ আসে, রক্ত খারাপ হয়ে শরীরে ব্যাধি দেখা দেয়।

এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, সাধারণ বাঙালী আজকাল যা খায় তাতে পুষ্টিকর অংশ খুব কম থাকে। দুধ ঘি মাছ এখন সাধারণ বাঙালীর ভাগ্যে জোটে না। এর ওপর অজ্ঞতা ও অনিয়মের ফলে জাতীয় স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি হয়েছে।

সাধারণ বাঙালীর প্রতিদিনের খাদ্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। বাঙালীর প্রধান খাদ্য—চাল। যাঁরা শহরে থাকেন তাঁরা কলে ছাঁটা মিহি চালের ভাত পছন্দ করেন, কিন্তু এতে যে খাদ্যপ্রাণ ভাইটামিন নষ্ট হয়েছে, সে কথা তাঁরা মনেও করেন না। গ্রামে অবশ্য ঢেঁকি-ছাঁটা চাল পাওয়া যায়। কিন্তু কি শহরে কি গ্রামে যে পদ্ধতিতে ভাত রাঁধা হয় তাতে ভাতের যেটুকু সার সেটুকুও ফেলে দেওয়া হয়। ফলে যে ভাত খাওয়া যায় তার খাদ্য-মূল্য কিছুই থাকে না। অসিদ্ধ আলো-চালের ভাত যদি ফেনসুদ্ধ খাওয়া হয়, তা হ'লে দেহের পুষ্টি-

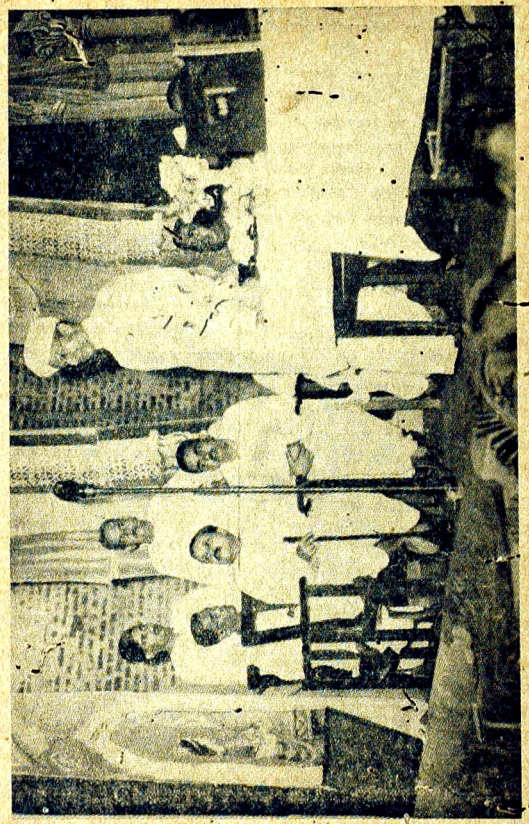

[আলমবাজার পল্লীশ্রী কর্ত্তৃক বিদ্যাধরী-তটে-নদীয়া প্রাইমারী উচ্চতর স্কুল সংস্কারী মাননীয় বক্তৃতা দিচ্ছেন]

সাধনের পক্ষে যথেষ্ট উপকার হয়—এই কথাটা এখন প্রত্যেকেরই বোঝা উচিত।

তারপর আমাদের বেশি পরিমাণে ফলমূল, শাকসব্জী ব্যবহার করা দরকার। ফলের মধ্যে নারিকেল, লেবু, আঁক, কলা বিশেষ উপকারী। ফল সহজে হজম করা যায় এবং তাতে মাটির ও আলোর তেজ সঞ্চিত থাকে। সেই তেজ শরীরে স্ফূর্ত্তি এনে দেয়। তরকারির মধ্যে পালং, পুঁইশাক, চাঁড়স, বিলিতী বেগুন, সিম প্রভৃতি ভাইটামিনে ভরা। মূল-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে আলু যথেষ্ট উপকারী। তারপর পিঁয়াজ ও রসুন। এগুলি ফুস্‌ফুসের শক্তি বাড়িয়ে থাকে।

ভাতের সঙ্গে মাছ খাওয়ার বিধি বরাবর আছে। চাঁটকা তাজা জাওলা কই মাগুর বা রুই কাৎলা প্রত্যহ খেতে পারলে শরীরের স্নায়ু সতেজ হয়, মস্তিষ্কের কাজও ভাল হয়।

তারপর দুধ। দুধ সত্যিই মানুষের পক্ষে 'অমৃতে'র তুল্য। পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোকেরা এ কথা বেশ বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা ঘরে ঘরে গরু রাখতেন। প্রত্যেক সংসারে দুধ থেকে নিত্য মাখন উঠানো হ'ত, দই, ছানা, সন্দেশ তৈরী হ'ত। আজ আমরা দুধের কাঙাল। দুধ ও দই আমাদের রোজ খেতে হবে। দই থেকে ঘোল ক'রে পান করলে শরীরের যথেষ্ট উপকার হয়। শাস্ত্র বলেন—

"ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিৎ
ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণামমৃতং সুখায়
তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ॥"

যাঁরা ঘোল পান করেন তাঁদের কখনও কষ্ট হয় না, তাঁদের দেহে ব্যাধি দেখা দেয় না। দেবতাদের পক্ষে যেমন অমৃত তেমনি মানুষের পক্ষে ঘোলপান সুখপ্রদ।

মাংস ডিম বেশি না খাওয়াই ভাল। ডিম খেতে হ'লে কাঁচা বা আধ-সিদ্ধ খাওয়া উচিত। লাল চিঁড়া, গুড়, আদা, ছোলা উৎকৃষ্ট জলখাবার।

আহারের সঙ্গে শরীর-পালনের দিকে যত্ন রাখতে হবে। কোন না কোন ব্যায়াম বা দল বেঁধে খেলা করা শরীর-রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। শরীরকে দৃঢ়, কষ্টসহিষ্ণু, কর্ম্মপটু করবার জন্য যে ধরণের ব্যায়াম যার পক্ষে সুবিধা, সেই ধরণের ব্যয়াম বেছে নিয়ে প্রতিদিন চর্চ্চা করা তার কর্ত্তব্য। কিন্তু কতকগুলি ব্যায়াম আছে যা সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক। যেমন সাঁতার দেওয়া, দৌড়ানো, ডন-বৈঠক দেওয়া, দাঁড় টানা। শরীর ঠিক রাখার জন্য ব্যায়াম আহারের মতই প্রয়োজন, এবং এই প্রয়োজনীয় অভ্যাসটি ছোটবেলা থেকেই শিখতে হয়।

শরীর-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে শরীরকে সংক্রামক রোগের হাত থেকে মুক্ত রাখবার জন্য প্রতিষেধক ওষুধ নেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। স্নান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য।

আমাদের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করুন। রাজার ছেলের মত থাকলেও বাল্যে তিনি মাঠে মাঠে বেড়িয়েছেন, গায়ে খোলা জায়গার হাওয়া ও রোদ অনবরত লাগিয়েছেন। এই আদর্শ অনুসরণ করে কিছুক্ষণ খোলা গায়ে রোদ লাগিয়ে আমাদের শরীরকে শক্ত করা উচিত।

ম্যালেরিয়া

মেদিনীপুর জেলার সব খানাতেই কম বেশি ম্যালেরিয়া জ্বরহয়, কিন্তু ঘাটাল মহকুমায় এবং কেশপুর, ডেবরা, পিংলা, সবঙ্গ, খড়গপুর, নারাণগড়, কেশিয়াড়ি, দাঁতন, মোহনপুর, এগরা, পটাশপুর, পাঁশকুড়া, ময়না এবং গড়বেতা ও সদর থানার কতক অংশে এর প্রকোপ ভয়াবহ। এ সব জায়গায় মৃত্যুসংখ্যা বেড়েই চলেছে; জন্মসংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তা ছাড়া বার বার জ্বরে ভুগে লোকের কাজ করবার শক্তি কমে যাচ্ছে। কত

আবাদী জমি মজুর অভাবে পড়ে থাকে। যারা খরচ করতে পারে তারা ঝাড়গ্রাম অঞ্চল থেকে সাঁওতাল আনিয়ে চাষ করিয়ে নেয়। এ জীবন-মরণ সমস্যার প্রতিকার কি? প্রতিকারের উপায় পল্লীবাসীর নিজের হাতে, সে উপায় অবলম্বন করতে হ'লে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সকল তথ্য জানতে হবে। তারপর সঙ্ঘবদ্ধভাবে সকলে চেষ্টা করলে গ্রাম থেকে ম্যালেরিয়া তাড়ানো অসম্ভব হবে না।

প্রথমে ধরা যাক—ম্যালেরিয়া জ্বর কেন হয়! যার জ্বর হয়, তার রক্তে খুব ছোট ছোট পোকা জন্মায়। এই পোকার স্ত্রী-পুরুষ দুইই থাকে রক্তের মধ্যে। মশা যখন এই রোগীকে কামড়ায় ও রক্ত চুষে নেয় তখন তার পেটে স্ত্রী-পুরুষ পোকা চলে যায়। তারা সেখানে ডিম পাড়ে, আর সেই ডিম থেকে বাচ্চা হয়। এই বাচ্চারা মশার হুলের কাছে জমে থাকে। সেই মশা যখন সুস্থ লোককে তার হুল বিঁধিয়ে দেয় তখন বাচ্চাগুলি লোকটির রক্তে চ'লে যায়। দুধে যেমন এক ফোঁটা দইয়ের সাজা দিলে দইয়ের বীজ লাখে লাখে বেড়ে যায়, তেমনি এই সব বাচ্চা লাখে লাখে বেড়ে গিয়ে রক্তের কণার মধ্যে ঘর ক'রে থাকে। তারা রক্তের কণা নষ্ট ক'রে দেয় আর সেই বিষে জ্বর হয়।

কি উপায়ে ম্যালেরিয়া জ্বর গ্রাম থেকে তাড়ানো যায়? তিনটি কাজ করলে সুফল ফলতে বাধ্য :—

(১) রোগীর রক্তের পোকাগুলি মেরে ফেলতে হবে। তখন মশা রক্ত নিয়ে গেলেও তার পেটের মধ্যে বাচ্চা জন্মাবে না; কেন না, স্ত্রী ও পুরুষ পোকা আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। এই পোকা নষ্ট করতে হ'লে রোগীকে কুইনাইন খাওয়াতে হবে। যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয় সেখানে যদি প্রত্যেক লোককে সপ্তাহে একবার ৮।১০ গ্রেন কুইনাইন খাওয়ানো হয়, তা হ'লে ম্যালেরিয়ার ভয় থাকে না। প্লাজমোকুইন নামে যে নতুন ওষুধ বেরিয়েছে তাতেও রক্তের স্ত্রী ও পুরুষ পোকা একেবারে নষ্ট হয়। মশা জন্মায় বর্ষার ঠিক পরে। অতএব জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে যদি সকলে প্লাজমোকুইন খেয়ে রক্ত পরিষ্কার ক'রে রাখে, তা হ'লে মশা কামড়ালেও জ্বর হবার ভয় থাকে না।

(২) ম্যালেরিয়া বন্ধ করার আর একটি উপায়—মশাকে ভিটা ছাড়া করা।

মশা মেরে কমানো যায় না। ধোঁয়া দিয়ে বার ক'রে দিলে তারা আবার আসে। তবে ডিম পাড়বার জায়গা না দিলে তাদের ভিটা ছাড়া করা যায়। প্রজাপতি যেমন গুটির মধ্যে থাকে, তার আগে সবুজ পোকা হয়ে পাতা খেয়ে বেড়ায়,—মশাও তেমনি ডিম পাড়ে জলে, ডিম থেকে পোঁকা হয়, পোকা পরে গুটি হয়, গুটি থেকে মশা বেরিয়ে রক্ত খাবার জন্য ছুটোছুটি করে। কলসী, হাঁড়ি, টিনের ভিতরে, পানা ও হদভরা পুকুরে এবং ডোবা, খানা বা নদীর ধারে যেঁষানে ঘাঁসে ভ'রে আছে, তারই আড়ালে মশা ডিম পাড়ে। কাজেই মশাকে নির্ব্বংশ করতে হ'লে গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থকে খাটতে হবে—

(ক) ঘরের আশেপাশে হাঁড়ি, কলসী, টিন ও আবর্জ্জনা রাখা চলবে না। এগুলো যে কোন ডোবায় জমা ক'রে সেই ডোবা ভরাট করতে পারা যায়।

(খ) বাড়ির ধারের ডোবা বা ছোট পুকুর আর তার পাড়ে আগাছা ও জঙ্গল, পুকুরের পানা, দল, ঘাস—এই সমস্তই মশার আড্ডা। আষাঢ় মাসের আগেই প্রত্যেক গৃহস্থকে নিজের পুকুরের বা ডোবার পানা বা হদ তুলে পরিষ্কার করতে হবে। ছোট বড় খানা, গর্ত্ত ভরাট করতে হবে। গ্রামে ৩।৪টি বড় পুকুর বা বাঁধ খুঁড়ে সেই মাটি দিয়ে সমস্ত ডোবা, খানা, গর্ত্ত, ছোট পুকুর ভরাট করা যায়। এতে গ্রামের চেহারাও ভাল হয়।

(গ) নিকটে নদী বা খাল থাকলে, বন্যার সময় তার লাল জল নালা দিয়ে ডোবা-পুকুরে আনতে পারলে এবং সমস্ত জল নিঃশেষে নালা দিয়ে বার ক'রে দিতে পারলে মশার জন্ম কম হতে বাধ্য।

(ঘ) ভিটার জঙ্গল কাটিয়ে সাফ করতে হবে। ডোবা কি পুকুরের পাড়ে জঙ্গল রাখা চলবে না এবং তার জলে পানা বা ঘাস হ'তে দেওয়া বন্ধ করতে হবে। জলের ধারে বকচর এমন ভাবে কাটতে হবে যাতে সে ঘাস জলে এসে না পড়ে।

(ঙ) ছোট ছোট মাছ মশার ডিম ও বাচ্চা খেয়ে ফেলে। পুকুর, ডোবা, খাল ছোট মাছে ভর্ত্তি ক'রে রাখলে মশা জন্মায় না।

(চ) মশার বাচ্চা মারবার আর এক উপায়—জলের উপর কেরোসিন তেলের সর ফেলে রাখা। একটা ন'টের খুপি কমদামী কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে পাড়ের ধার দিয়ে টানতে হয়। আষাঢ় মাস থেকে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সপ্তাহে একদিন এইভাবে ডোবা পুকুর ইত্যাদিতে কেরোসিন দিতে হয়।

(ছ) রাস্তা করার সময় একপাশে বরাবর খাল রেখে মাটি নেবার ব্যবস্থা করতে হয়। ঘর তোলার সময় গ্রামের ভিতরে ডোবা ক'রে মাটি না নিয়ে গ্রামের বাইরের খাস জায়গা থেকে মাটি আনা উচিত।

(৩) মশা যাতে কামড়াতে না পারে সেজন্য মশারি ব্যবহার করা উচিত। হাতে পায়ে নেবুর তেল অথবা পূর্ব মৈশানো সর্ষের তেল মেখে থাকলে মশা বসে না।

এখন অনেক গ্রামে পল্লীমঙ্গল-সমিতি গ'ড়ে উঠছে। এই রকম সমিতি প্রত্যেক গ্রামে থাকা উচিত। পল্লীবাসী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষায় মন না দিলে বাংলার পল্লী শ্মশান হয়ে যাবে। ইটালী, পানামা, ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশে ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য যে চেষ্টা হয়েছে সেরূপ চেষ্টা বাংলাতেও হওয়া উচিত। এই চেষ্টা করতে হ'লে চাই—

(১) মনের দৃঢ়তা

(২) সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ।*

---

* মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক হেলথ অফিসার ক্যাপ্টেন অনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম. বি., ডি. পি. এচ. 'পল্লী-শ্রী'র জন্য এই প্রবন্ধটি লিখেছেন।—সম্পাদক, 'পল্লী-শ্রী'

নেপিয়ার ঘাস

আগে আমাদের দেশে যথেষ্ট গো-চর ভূমি ছিল; গবাদি পশু এই সমস্ত মাঠে চরিয়া প্রচুর কাঁচা ঘাস খাইতে পারিত। এইভাবে পুষ্টিকর আহার পাইয়া তাহারা সুস্থ সবল থাকিত এবং যথেষ্ট দুগ্ধ দিতে পারিত। ক্রমে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। আয়বৃদ্ধির চেষ্টায় জমিদারগণ গো-চর ভূমি বিলি করিতে লাগিলেন এবং এই সমস্ত জমিতে ফসলের চাষ হইতে লাগিল। কিন্তু গো-চারণের মাঠ লোপ পাওয়ায় গো-জাতির যে অবনতি আরম্ভ হইল, তাহা রোধ করিতে বাংলার চাষী বা জমিদার কেহই মনোযোগ দিলেন না। অযত্নে ও উপযুক্ত আহারের অভাবে আজ বাংলার গো-জাতির শোচনীয় অবস্থা।

গো-জাতির উন্নতি করিতে হইলে দুইটি ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়—প্রজনন অর্থাৎ উপযুক্ত পন্থায় গো-জাতির বংশ-বৃদ্ধি করানো, এবং গো-পালন অর্থাৎ উপযুক্ত স্থান, আহার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, গো-জাতির পুষ্টিকর খাদ্যস্বরূপ নেপিয়ার ঘাসের চাষের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। এরূপ চাষের বিধান না করিলে অচিরাৎ গো-কুল বাংলা হইতে লোপ পাইবে।

বাংলা দেশে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘাসের চাষ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নেপিয়ার ঘাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলন দিয়াছে। পশু-খাদ্য হিসাবে এই নেপিয়ার বা হাতী ঘাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৯২৭ সালে এই ঘাস সিংহল হইতে বাংলায় আসে। ঢাকার কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—এই ঘাসের জীবনীশক্তি খুব বেশি। বাড়িতে দিলে ইহা ১০ ফিট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহা দেখিতে আখ গাছের মত, চাষও প্রায় ঐরূপ। ২।৩ ফিট বড় হইলেই কাটিয়া লইলে ঘাসের পক্ষে ভাল হয়। তখন দণ্ডগুলি নরম ও রসাল থাকে বলিয়া গো-মহিষাদি সমস্ত অংশই খাইতে পারে। ইহাপেক্ষা বড় হইলে দণ্ডগুলি কাটিয়া কুচাইয়া দিতে হয়।

আবাদ

যে জমি হইতে সহজেই জল বাহির হইয়া যায় এবং যেখানে বন্যার জল প্রবেশ করে না, এইরূপ জমিতেই

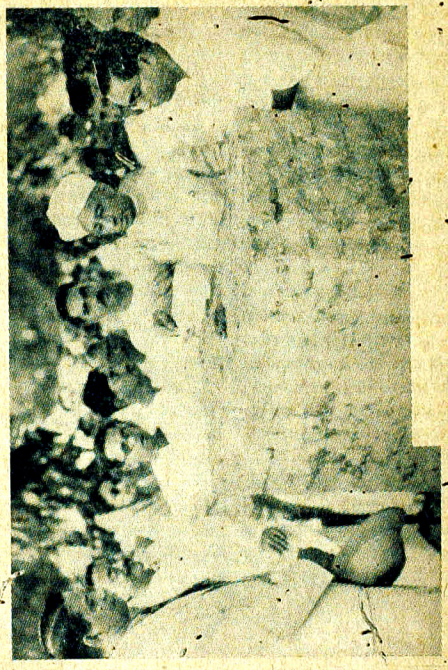

স্বর্গীয় রাজাগঞ্জ বিদ্যাধর-কৃষি-সমিতির ডিস্ট্রিবাগান কাছারি। [আনন্দ-বাজার পত্রিকার সৌজন্যে]

নেপিয়ার ঘাস ভাল হয়। নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি—এই কয়মাস মাটিতে রস থাকে না বলিয়া এবং জুলাই আগস্ট মাসে মাটি অতিরিক্ত ভিজা থাকে বলিয়া এই সময় ব্যতীত অন্য যে কোন কালে নেপিয়ার ঘাসের 'কাটিং' লাগানো যায়। এক ফুট লম্বা করিয়া দণ্ডগুলিকে কাটিয়া লইয়া আখের মত রোপণ করিতে হয়। বিঘা-প্রতি প্রায় ৪০০০ 'কাটিং' লাগে। একবার লাগাইলে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ঘাস পাওয়া যায়। এক একটি 'কাটিং'এ তিনটি গাঁট থাকা আবশ্যক।

মেদিনীপুর জেলায় গ্রীষ্মকালে জলসেচের ব্যবস্থার অভাবে যাহাতে ঘাসগুলিকে বাঁচাইয়া রাখা যায়, সে বিষয়ে ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচ্যারাল অফিসার পরীক্ষা করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এক ফুট গভীর ও এক ফুট চওড়া করিয়া তিনি ফিট অন্তর এক একটি নালা কাটিতে হইবে। নালার ভিতরে চার কি ছয় ইঞ্চি পরিমাণ গোবর-সার দিয়া ভরাট করিয়া কোদাল দিয়া মাটির সহিত এই সার মিশাইয়া দিতে হইবে। নালার ভিতরে তিন আঙুল মাটির নীচে শায়িত অবস্থায় একটির পর একটি কাটিং লাগাইয়া যাইতে হইবে। লাগাইবার পরও নালাটি ৪।৫ ইঞ্চি গভীর থাকিবে। অতঃপর নালার দুই দিকের মুখ খুলিয়া দিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

ঘাস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জমি নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। প্রত্যেক বর্ষণ বা সেচনের পর জমি খুলিয়া দিতে হয়। বর্ষাকালে ঘাস দ্রুত বাড়িয়া উঠে, তখন ২০।২৫ দিন অন্তর প্রায় ১৮ ইঞ্চি ঘাস কাটিয়া লওয়া যায়।

এই ঘাস মাটি সমান করিয়া কাটিতে হয় যাহাতে ঘাসের গোড়া মাটির উপরে না থাকে। গোড়া লম্বা হইলে শিকড় ভাঙিয়া যায় এবং ফলন কমিয়া যায়। বর্ষার শেষে ঘাস কাটার পর জমিতে বিঘা প্রতি ৩০ গাড়ী গোবর-সার দিতে হয় এবং পরে জমি খুঁড়িয়া আগাছা নিড়াইয়া দিতে হয়।

ফলন

এই প্রথায় আবাদ করা হইলে জলসেচ ব্যতীত প্রতি বিঘায় দুই মাস অন্তর গড়ে ১২০ মণ বা বৎসরে ৬৬০ মণ উৎকৃষ্ট ঘাস পাওয়া যাইবে। সেচনের ব্যবস্থা করা হইলে এই ফলন দ্বিগুণ হইতে পারে। একটি পূর্ণাবয়ব গাভীকে দৈনিক আধমণ নেপিয়ার ঘাস খাইতে দিলে তাহার জন্য বৎসরে ১৮০ মণ ঘাস আবশ্যক হয়। এক বিঘা জমিতে ৬৬০ মণ নেপিয়ার ঘাস উৎপন্ন হইলে সাড়ে তিনটি পূর্ণাবয়ব গাভীর সারা বৎসরের পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান হয়।

চাষ

এ বৎসর মেদিনীপুর জেলায় কেশপুর, চন্দ্রকোনা, কেশিয়াড়ি, ঝাড়গ্রাম, পিংলা, মেদিনীপুর, রামনগর, এগরা ও মহিষাদল থানায় ১৫৪½ মণ নেপিয়ার ঘাসের 'কাটিং' বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে। সদর (উত্তর) মহকুমার অধীন তলকুই ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত খুদিরাম মণ্ডল মাত্র দুই কাঠা জমিতে নেপিয়ার ঘাসের চাষ করিয়া উৎকৃষ্ট ফলন পাইয়াছেন। যাঁহারই কিছু জমি ও গরু আছে তাঁহার পশুখাদ্যহিসাবে নেপিয়ার ঘাসের চাষ করা কর্ত্তব্য।

দ্বারিবেড়্যা শ্রীশ্রী৺ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া সমবায় পল্লী-সংস্কার সমিতি লিমিটেড

কার্য্যবিবরণী

তমলুক মহকুমার সুতাহাটা থানার অধীন দ্বারিবেড়্যা গ্রামটির আয়তন ৫½ বর্গ মাইল। গ্রামে গৃহের সংখ্যা প্রায় ৪০০; লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০০।

এই গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক ও স্বর্গীয় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র মাইতি মহাশয়দ্বয়ের উদ্যোগে একটি সমবায় ঋণদান-সমিতি ও সমবায় কৃষি-সমিতি লিমিটেড পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে সমবায় বিক্রয়-সরবরাহ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। গত বৎসর সমবায় পল্লী-সংস্কার-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিকে ১৯২২ সালের সমবায়-আইনের বিধানমতে রেজিস্টার্ড (registered) করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সমিতির সভ্য-সংখ্যা ৩৩। সমিতির পরিকল্পনা নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

১। **স্বাস্থ্য :** (ক) চিকিৎসালয় স্থাপন, (খ) পল্লী-সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন।

২। **কৃষি :** (ক) খাল ও বাঁধ সংস্কার, (খ) বীজ সংগ্রহ ও বীজ বিতরণ, (গ) গো-পালন ও গো-জাতির উন্নতি বিধান।

৩। **শিল্প :** (ক) বয়ন (তাঁত ও চরকা), (খ) কুটীর-শিল্প হিসাবে নারিকেল ছোবড়ার শিল্প প্রবর্ত্তন।

৪। **শিক্ষা :** (ক) বালক ও বালিকাদিগের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, (খ) নৈশবিদ্যালয় স্থাপন, (গ) পাঠাগার প্রতিষ্ঠা।

৫। **বাণিজ্য :** (ক) ক্রয়-বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, (খ) ধান্য-গোলা স্থাপন।

৬। **সাধারণ :** স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন।

উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে এ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়

গত ১৯এ ডিসেম্বর তারিখে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ডাঃ তারিণীচরণ সামন্ত অবৈতনিকভাবে এই চিকিৎসালয়েরভার গ্রহণ করিয়াছেন। চিকিৎসিতের সংখ্যা এ পর্য্যন্ত ৩৮৪ জন।

(খ) সমিতি দুইটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়াছে।

(গ) দ্বারিবেড়্যা গ্রামের পূর্ব্বখালের দক্ষিণাংশ খনন করা হইয়াছে। ইহাতে জমির জলনিকাশের সুবিধা হইয়াছে। কৃষিবিভাগ হইতে ৬৷০ (ছয় মণ) গোসবা পাটনাই ধানের বীজ আনাইয়া সমিতির [illegible] বিতরণ করা হইয়াছে। সময়োপযোগী শাকসব্জী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) গ্রামে একটি বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয় বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগ ও মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সাহায্য পাইয়াছে এবং এখানে ৯টি তাঁত ও একটি জ্যাকার্ড মেসিনের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের বয়ন-কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সূতা প্রস্তুত করার জন্য ১৯টি চরকা নিয়মিতভাবে চালিত হইতেছে। বর্ত্তমানে স্থানীয় ৩৬টি ছাত্র-ছাত্রী ও বাহিরের ১১টি ছাত্র বয়ন ও সূতাকাটা শিখিতেছে। ইহাদিগের কোন বেতন দিতে হয় না। শিক্ষকগণও সমিতির সভ্য।

গত বৎসর মাননীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের অনুগ্রহে Commissioner's Discretionary Grant হইতে ১৪০৲ অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে ১০০৲ ব্যয় করিয়া বয়ন-বিদ্যালয়ে জ্যাকার্ড মেসিন স্থাপনের উপযোগী গৃহ-নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

(ঙ) গ্রামের উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৮৯৫ সালে স্থাপিত এবং সেখানে এখন ৮৮ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। সমিতি এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপযোগী একটি পাঠাগার স্থাপন করিয়াছে। গত ২৭এ জানুয়ারি তারিখে সমিতি একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে ২১টি ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে এবং সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ঝুঁঝ মহাশয় অবৈতনিকভাবে ছাত্র-দিগকে শিক্ষা দিতেছেন। গ্রাম্য সমবায়-সমিতি এই

বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ২০৲ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদের হারিকেন লণ্ঠনটি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

(চ) সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত তরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক মহাশয় তাঁহার স্বর্গগত পিতা ৺মহেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের স্মৃতিরক্ষার জন্য ৫৬ ডেসিমেল (decimal) জমির উপর একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই গৃহে "মহেন্দ্র পাঠাগার" নামে একটি পাঠাগার শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। তরেন্দ্রবাবু পাঠাগারের উপযোগী পুস্তক ক্রয়ের জন্য ২৫৲ সাহায্য দিয়াছেন।

(ছ) ধর্ম্মালোচনার জন্য দ্বারিবেড়্যা গ্রামে শ্রীশ্রী৺ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম ও শ্রীশ্রী৺ চৈতন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত আছে। সমিতির চেষ্টায় গ্রামে একটি নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং পানীয় জলের জন্য একটি পুষ্করিণী 'রিজার্ভ' (reserved) করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে সমিতির নিকট মাত্র ১৮৸৶৩ মজুত আছে।

দ্বারিবেড়্যা, শ্রীফণীন্দ্রনাথ সামন্ত
২৩এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সম্পাদক

গোপালপুর পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির কার্য্যবিবরণী

গত ফেব্রুয়ারি মাসে, সদর (উত্তর) মহকুমার অন্তর্গত ডেবরা থানার অধীন গোলগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডের অধিবাসীগণ মিলিত হইয়া "গোপালপুর পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি" গঠন করেন। গোপালপুর, চন্দ্রামেড়, বিষ্ণুপুর, মোহনপুর ও শিমুলহাটি—এই পাঁচখানি সংলগ্ন গ্রাম লইয়া সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এই পাঁচটি গ্রামই আজ হত-শ্রী। ১৯৩১ সালের আদম-সুমারীর হিসাবে এ অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল—৬২৫, এখন কমিতে কমিতে লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে—৩৪২। এই ধ্বংসের মুখ হইতে গ্রামগুলিকে রক্ষা করিতে পাঁচটি গ্রামের সমস্ত সমর্থ অধিবাসী বদ্ধপরিকর হন।

মাননীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে ভাবে পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্যপদ্ধতি স্থির করা হয়। প্রথম হইতেই লোয়াদার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেন আমাদের সাহায্য করেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ পাল ও সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দেব বিশেষ উৎসাহের সহিত কর্ম্মীদলকে পরিচালনা করিতে থাকেন। এই ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিয়া সমিতি যাহা কিছু সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—

(ক) পাঁচখানি গ্রামে ১৩৫টি পুষ্করিণীর মধ্যে ১২৫টি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও সংস্কার করা হইয়াছে।

(খ) ১৯০০ ঘন-ফুট ডেন কাটিয়া উহাতে বর্ষাকালে মাঠে ও গ্রামগুলিতে কাংসাবতী নদীর জল প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থায় রোগের বীজাণু ধৌত হইয়া চলিয়া যাইবে এবং গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে।

(গ) কাঁটা বাঁশের ঝাড় কাটিয়া ও পুড়াইয়া এবং অন্যান্য উপায়ে প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে।

(ঘ) চন্দ্রামেড় হইতে মোহনপুর যাইবার জন্য এক মাইল ব্যাপী রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রামের অন্যান্য রাস্তার সংস্কার করা হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে কাঠের 'কালভার্ট' (culvert) করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ঙ) শিমুলহাটি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার করা হইয়াছে। একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

(চ) ৩৫০২০০ বর্গ-ফুট বকচর পরিষ্কার করা হইয়াছে।

সমিতির সাহায্যকল্পে গোলগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ড ৫০৲ এবং জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগ ১৫০৲ দান করিয়াছেন। এই দুই শত টাকার মধ্যে অনিবার্য্য ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ব্যয় করিতে হইলেও সমিতির সভ্যগণ পূর্ব্বোক্ত সকল কার্য্যই স্বেচ্ছাকৃত কায়িক পরিশ্রমে সম্পন্ন করিয়াছেন।

পল্লীবাসী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে সকলের মনেই আশা হইয়াছে যে, এই কার্য্যের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিলে শীঘ্রই এই পল্লী-অঞ্চল তাহার নষ্টস্বাস্থ্য ও লুপ্তশ্রী ফিরিয়া পাইবে।

শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক,
গোপালপুর-পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি*

* জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. যখন এই গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন সে সময় রিপোর্টটি পঠিত হয়েছিল।
—'পল্লী-শ্রী'-সম্পাদক

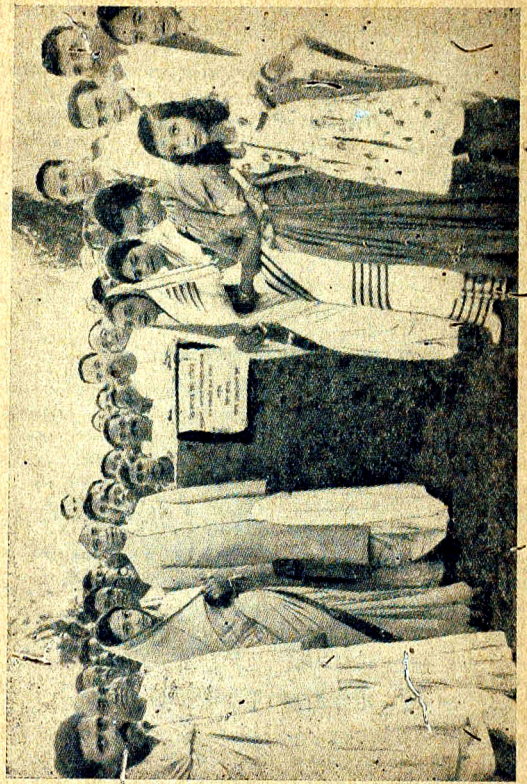

[আনন্দ-বাজার পত্রিকার ফটোগ্রাফ]

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তির সম্মুখে সমবেত স্থধীবৃন্দ

জালিমান্দা ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়

সদর (উত্তর) মহকুমায় ডেবরা থানার অধীন জালিমান্দা ইউনিয়ন বোর্ড ও শ্যামচক পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির চেষ্টায় গালিমপুর গ্রামে "জালিমান্দা ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপিত হয়েছে। গত ১লা আশ্বিন, মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. এই চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন।

চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইনের ৩৭(খ) ধারামতে ৩০০৲ অতিরিক্ত কর ধার্য্য করেছেন। জেলা বোর্ড থেকে ৪০০৲ অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে। আপাতত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়িতেই এই চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে। পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি ও ইউনিয়ন বোর্ড শীঘ্রই উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করবেন। ডাক্তারের থাকবার বাড়িও সেই সঙ্গে তৈরি হবে।

দরিদ্র গ্রামবাসীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে জালিমান্দা ইউনিয়ন বোর্ড জনসেবার যে আদর্শ স্থাপন করলেন, অন্যান্য বোর্ড তার অনুসরণ করুক।

ডেবরায় দাতব্য চিকিৎসালয়

তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের স্বর্গীয় হরপ্রসাদ দাস নিজগ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া এবং মেদিনীপুরে কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ২৫০০০৲ দান করিয়া পূর্ব্বেই যশস্বী হইয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি এই জেলায় আর একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৭০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের একান্ত উৎসাহে এবং জেলা বোর্ডের সাহায্যে এই পুণ্যাত্মার মৃত্যুকালীন সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সদর (উত্তর) মহকুমার এলাকায় ডেবরা গ্রামে এই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বিপুল জনতার সম্মুখে, গত ২১এ ভাদ্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস.—এই চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ দাসের পত্নীদ্বয়ের নামে এই চিকিৎসালয়টির নামকরণ হইয়াছে। "অম্বিকাসুন্দরী-গিরিবালা দাতব্য চিকিৎসালয়" এবং এই প্রতিষ্ঠানের ভার ডেবরা ইউনিয়ন বোর্ড গ্রহণ করিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ডেবরা থানার দরিদ্র পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যসংরক্ষণে সাহায্য করিয়া এই চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠুক।

শ্যামগঞ্জে দাতব্য চিকিৎসালয়

চন্দ্রকোণা থানার এলাকায় শ্যামগঞ্জ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। শ্যামগঞ্জ পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির সভ্যগণ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা এই চিকিৎসালয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন খাঁ নিজব্যয়ে যাবতীয় ঔষধপত্র ও সরঞ্জাম আনিয়া দিয়াছেন। গত ১১ই আগস্ট তারিখে মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট—মিঃ আর. এস. ত্রিবেদী, আই. সি. এস.—এই চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

খেলাধূলা

জুলাই মাস থেকে মেদিনীপুর শহরে ফুটবল খেলা সুরু হয়। প্রথমেই আরম্ভ হয় ফুটবল লীগ। এতে শহরের এগারোটি দল খেলেছিল এবং চ্যাম্পিয়ান (champion) হবার জন্য মেদিনীপুর কলেজ, জেল ও বার্জ মেমোরিয়াল মহমেডান স্পোর্টিঙের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা দেখা গেছল। ভাগ্যবিধাতা মহমেডান দলের উপর প্রসন্ন না থাকায় তারা কলিজিয়েট স্কুলের সঙ্গে খেলায় 'ড্র' ক'রে ফেলে। এতে তাদের লীগ বিজয়ের আশা চ'লে যায়। শেষ পর্য্যন্ত কলেজ ও জেল দলের পয়েন্ট সমান হওয়ায় তাদের আর একবার খেলতে হয়েছিল। সে খেলায় কলেজ দল প্রতিপক্ষকে হারিয়ে "বি. আর. সেন লীগ" বিজয়ের গৌরব পেয়েছে।

লীগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর দুটি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়—"ব্রাড্‌লেবার্ট শীল্ড" ও "ক্যামেরা কাপ"। "ব্রাড্‌লেবার্ট শীল্ড" প্রতিযোগিতার খড়গপুরের বি. এন. আর. দল এবং ঝাড়গ্রামের রঘুনাথমল্ল স্পোর্টিং ক্লাব যোগ দেওয়ায় খেলায় বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। ঝাড়গ্রামের দল বি. এন. আর. দলকে সেমি-ফাইনালে হারিয়ে দেয়, কিন্তু ফাইনালে তারা কলেক্টর্স ইলেভ্‌নের কাছে এক গোলে হেরে যায়। কলেক্টর্স ইলেভ্‌ন এবার নিয়ে পর পর দুবার "ব্রাড্‌লেবার্ট শীল্ড" বিজয়ের গৌরব পেল।

"ক্যামেরা কাপ" এখনও শেষ হয় নি। কলেজ ও খড়গপুর এক্স-স্টুডেন্টস ক্লাব ফাইনালে রয়েছে। পূজার ছুটির পর কলেজ খুললেই এই খেলাটির আয়োজন করা হবে।

এই সমস্ত খেলার সঙ্গে ডিষ্ট্রিক্ট ইণ্টার-স্কুল স্পোর্টস এসোসিএশনের উদ্যোগে সাঁতার এবং বড় ও ছোট ছেলেদের ফুটবল খেলা চলেছিল। বড় ছেলেদের খেলায় খড়গপুরের বি. এন. আর. ইণ্ডিয়ান হাই স্কুলের দল কাঁথি মডেল ইন্‌স্ট্রিশনের দলকে পাঁচ গোলে হারিয়ে বি. আর. সেন শীল্ড পেয়েছে। এই পর্য্যায়ে যতগুলি খেলা হয়েছিল তাতে শীল্ড-বিজেতাগণের সঙ্গে সেমি-ফাইনালে তমলুক হ্যামিল্টন হাই-স্কুলের খেলা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। তমলুকের দল মাত্র এক গোলে হেরে যায়, কিন্তু তাদের খেলা প্রশংসনীয়। বি. এন. আর. স্কুলের ছাত্রদল চমৎকার খেলেছে; তাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ভাল, প্রত্যেকে বুট পায়ে দিয়ে খেলে এবং তারা খেলার কৌশল ভালভাবেই আয়ত্ত করেছে।

ছোট ছেলেদের খেলায় কাঁথি হরিসভা মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় মেদিনীপুরের হার্ডিঞ্জ স্কুলকে এক গোলে হারিয়ে "বি. আর. সেন কাপ" পেয়েছে। কাঁথির দল খুব ভাল খেলেছে এবং এবার নিয়ে পর পর দুবার কাপ-বিজয়ী হ'তে পেরেছে।

সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়েছিল ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে, নাড়াজোল কাছারির পুকুরে। এবারের প্রতিযোগিতায় তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলের ছাত্রগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এই স্কুলের ছাত্র ১০০ গজ সাঁতারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান, ৭৫ গজ সাঁতারে প্রথম স্থান, ৫০ গজ সাঁতারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান, ৭৫ গজ 'ব্যাক স্ট্রোক' সাঁতারে দ্বিতীয় স্থান, ৩০ গজ 'ব্যাক স্ট্রোক' সাঁতারে প্রথম স্থান পেয়েছে। তমলুক ছাড়া গোদাপিয়াশাল মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ও ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাই-স্কুলের ছাত্রও কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

এবারের ফুটবল খেলা দেখে কয়েকটি মন্তব্য না করে থাকা যায় না। এবার কতকগুলি ব্যাপারে আমরা ব্যথিত হয়েছি। এগুলি দূর ক'রে খেলার মাঠের আবহাওয়াকে নির্ম্মল করতে না পারলে ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিএশনের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। খেলার উত্তেজনা সংযত আকারে থাকলে ভাল হয়, উত্তেজনার মাত্রা শোভনতার সীমা অতিক্রম করলেই দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। আমাদের প্রধান অভিযোগ দর্শকদের বিরুদ্ধে। খেলার সময়ে রেফারীর অভিমতের বিরুদ্ধে কটূক্তি করা অথবা খেলার পর রেফারীর লাঞ্ছনা করা সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। এর প্রতিকার হতে পারে যদি দর্শক খেলায় আধুনিকতম নিয়মকানুনের সঙ্গে পরিচয়

রাখেন এবং রেফারীর উপর বিশ্বাস রাখেন। খেলোয়াড়দের আচরণও সব সময় সমর্থনযোগ্য হয়নি। খেলায় হারজিতই বড় কথা নয়—ভালভাবে খেলাই সর্ব্বাগ্রে দরকার। এই সত্যটি ভুলে গিয়ে এবার একটি দল নিতান্ত অসংযত ব্যবহার করেছে এবং সেজন্য ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিএশনকে তার বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। যাঁরা খেলা দেখতে যান নিছক আনন্দ পাবার জন্য, তাঁদের কাছে এসব ব্যাপার নিতান্তই মর্ম্মান্তিক। আশা করি, এসব ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে এবং খেলার মাঠে খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাবে।

সঙ্কলন

জনসংখ্যায় মেদিনীপুর

বিগত আদমসুমারীর বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি ভারতের লোকসংখ্যা ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯৩১ সালে শতকরা ১০·৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটিশভারত এবং দেশীয় নৃপতিগণকর্ত্তৃক শাসিত ভারতের মোট লোকসংখ্যা ৩৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮ শত ৭৬ জন। ভারতের লোকসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অনেকেই মনে করেন, ১৯৪১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা চল্লিশ কোটিকেও ছাড়াইয়া যাইবে। বিগত লোক-গণনা অনুসারে দেখা যায়, বাংলার লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুসারে দেশীয় রাজ্যসহ বাংলার লোকসংখ্যা ৫ কোটি ১২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৫৮ জন। সর্ব্বপ্রথম লোকগণনা আরম্ভ হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। ১৮৮১ সালে বাংলার লোক-সংখ্যা শতকরা ৬·৭ জন, ১৮৯১ সালে শতকরা ৭·৫ জন, ১৯০১ সালে শতকরা ৭·৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯০১ হইতে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বাংলার জনসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৮ জন হিসাবে। ১৯১১ সন হইতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা ২·৮ জন। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বাংলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৭·৩ জন। এই হিসাব হইতে দেখা যায়, বাংলার লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। তথাপি সমগ্র ভারতে বাংলা যে ক্ষয়িষ্ণুতম প্রদেশ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৯৩৪ সালের সরকারী স্বাস্থ্য-রিপোর্ট হইতে আমরা জানিতে পারি, ঐ বৎসর বাংলাদেশে জন্মের হার ছিল হাজার করা ২৯·৩ এবং মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা ২৩·৬ জন। সমগ্র ভারতে বাংলাদেশে জন্মের হার সর্ব্বাপেক্ষা কম। মৃত্যুর গড়পড়তা হিসাবে ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলার স্থান সপ্তম। মৃত্যুর হার বেশী না হইলেও জন্মের হার হইতে মৃত্যুর হার বাদ দিলে দেখা যায়, স্বাভাবিক লোকবৃদ্ধির দিক দিয়া ১৯৩৪ সালে বাংলাদেশ সমগ্র ভারতে সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করিয়াছিল। সমগ্র বাংলার এই ক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জিলাগুলির অবস্থাই যে প্রতিফলিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতাকে একটি জিলা ধরিয়া বাংলাদেশ মোট ২৭টি জিলা লইয়া গঠিত। আয়তনের দিক দিয়া ২৭টি জিলার মধ্যে মেদিনীপুর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু জনসংখ্যার দিক দিয়া মেদিনীপুরের স্থান পঞ্চম। জনসংখ্যার হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে ময়মনসিংহ, দ্বিতীয় স্থান ঢাকা, তৃতীয় স্থান ত্রিপুরা এবং চতুর্থ স্থান বাখরগঞ্জ জিলা। বাংলাদেশে প্রতি বর্গ মাইলে গড়পড়তা লোকসংখ্যা ৬১৬ জন, বর্দ্ধমানে ৬১৮ জন এবং মেদিনীপুর জেলায় ৫৩৪ জন। বাংলাদেশে লোক-গণনা আরম্ভ হইবার সময় হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জিলার প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যার হিসাব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ১৮৭২ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৫০৩ জন এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯১১ সালে দাঁড়াইয়াছিল ৫৫৮ জন। কিন্তু ১৯২১ সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায়, মেদিনীপুর জিলার

প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা কমিয়া ৫২৮ জনে পরিণত হইয়াছিল। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে আবার বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩৪ হইয়াছে।

বাংলার বিভিন্ন জিলার গড়পড়তা জনসংখ্যা হিসাব করিলে দেখা যায়, গড়ে প্রতি জেলার লোকসংখ্যা ১৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭ শত ৮৬ জন। একমাত্র ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের উপর। ত্রিশ লক্ষের উপর লোক আছে মাত্র দুইটি জেলায়, একটি ঢাকা, অপরটি ত্রিপুরা। ১৯২১ সালের লোকগণনায় বাংলার জিলা-গুলির মধ্যে বাখরগঞ্জ জিলার স্থান ছিল ষষ্ঠ। কিন্তু ১৯৩১ সালে বাখরগঞ্জ চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। বাখরগঞ্জের লোকসংখ্যা ২৯ লক্ষের উপর। বাখরগঞ্জ জিলা বাদে যে সকল জিলার লোকসংখ্যা কুড়ি লক্ষের উপরে, এরূপ জিলা আছে মাত্র চারিটি। এই চারিটি জিলার নাম মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, রংপুর এবং ফরিদপুর। জনসংখ্যার হিসাবে এই চারিটি জিলার মধ্যে মেদিনীপুরের স্থান সর্ব্বপ্রথম। ১৯২১ সালের তুলনায় ১৯৩১ সালে মেদিনীপুরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু ১৯১১ সালের সমান এখনও হইতে পারে নাই। তবে ১৯০১ সালের লোকসংখ্যা অপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছে বটে।

মেদিনীপুর জিলা পাঁচটি মহকুমায় বিভক্ত। এই পাঁচটি মহকুমার মধ্যে বিগত সেন্সাস অনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ঝাড়গ্রাম মহকুমায়। ঝাড়গ্রাম মহকুমা গঠিত হইয়াছে ১৯২১ সালের পর। ঝাড়গ্রাম মহকুমা সহরে পরিণত হওয়া এবং বি. এন. আর.-এর প্রধান লাইন ঝাড়গ্রাম দিয়া যাওয়ায় এই মহকুমায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে হয়। এই মহকুমার দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ জঙ্গলে পূর্ণ। এই অঞ্চলে অনাবাদী জমির পরিমাণও বেশী। কাজেই ঝাড়গ্রাম মহকুমার এই অঞ্চল জনবসতি-বিরল। তবে সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতি এই অঞ্চলে যাইয়া বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির দিক দিয়া ঝাড়গ্রামের পরেই কাঁথি মহকুমার স্থান। তমলুকের স্থান কাঁথিরও পরে। সদর এবং ঘাটাল মহকুমার জনসংখ্যা অতি সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তমলুক মহকুমার সুতাহাটা এবং নন্দীগ্রাম থানার অধীনস্থ গ্রামগুলি স্বাস্থ্যকর বলিয়া এই দুইটি থানাতেই জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী বাড়িয়াছে। পাঁশকুড়া থানার গ্রামগুলি ম্যালেরিয়া-প্রধান। এই অঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি শতকরা ৪·৪ জন। এই মহকুমার অন্তর্গত অন্যান্য থানার জনসংখ্যার বৃদ্ধি সম্পর্কে ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, "স্বাভাবিক কারণেই এই অঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে, কারণ, ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই, বাহির হইতে লোক আসিয়াও এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে নাই।

সদর মহকুমার দেবরা, সবঙ্গ, পিঙ্গলা এবং মোহনপুর থানায় জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। এই অঞ্চলগুলিতে ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রাদুর্ভাবই ইহার কারণ। অন্নসংস্থানের অভাবে সাঁওতাল, কুরমী প্রভৃতি আদিম জাতির লোকেরা অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় মোহনপুর অঞ্চলে জনসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মহকুমায় খড়্গপুর থানাতেই লোক খুব বেশী বাড়িয়াছে। খড়্গপুরে রেলওয়ে ওয়ার্কশপ থাকায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহুলোক কার্য্যোপলক্ষে এখানে বাস করিতেছে। ইহাই খড়্গপুরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। ম্যালেরিয়ার জন্য ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোণা ও দাঁসপুর থানায় লোকসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ঘাটাল থানায় অনেকগুলি টিউবওয়েল হওয়ায় এবং বহু সাঁওতাল ক্ষেতমজুর হিসাবে কাজ করিতে আসায় এই অঞ্চলের জনসংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে।

১৯২১ সালে মেদিনীপুর জিলায় মৃত্যুর হার জন্মের হারকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ঐ সালে জন্মের হার ছিল হাজার-করা ২৬·৫ জন আর মৃত্যুর হার ছিল হাজার-করা ৩০·৯ জন। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে গড়ে জন্মের হার ছিল হাজার-করা ২৮·৯ জন, আর মৃত্যুর হার ছিল হাজার-করা ২৪·১ জন। এই দশ বৎসরে মেদিনীপুর জিলায় লোকসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হইয়াছে হাজার-করা ৪·৮ জন। ১৯৩২ সালে মেদিনীপুর জেলায় স্বাভাবিক লোক-বৃদ্ধির হার ছিল হাজার-করা ৪·৭ জন। ১৯৩৩ সনে স্বাভাবিক

লোকবৃদ্ধির হার বাড়িয়া হাজার প্রতি ৭.২ জন হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৪ সালে আবার কমিয়া হাজার-করা ৫.৭ জন হয়। সুতরাং মেদিনীপুর জেলার স্বাভাবিক লোক বৃদ্ধির হার ক্রমবর্দ্ধমান, একথা বলা চলে না। বাংলার বিভিন্ন জিলাগুলির স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনা করিলে একমাত্র নদীয়া ও যশোহর জিলাতেই জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪
নদীয়া জিলা—	+১.৯	+৫.১	+৫.৯
যশোহর জিলা—	−৫.৯	−৪.০	+৩.৩

কিন্তু দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, নোয়াখালি এবং বাঁকুড়া জিলার জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

কলিকাতাকে বাদ দিয়া বাংলার ২৬টি জিলার মধ্যে সাতটি জেলায় জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কমিয়া যাইতেছে। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার মাত্র দুইটি জিলায় ক্রমবর্দ্ধমান। অবশিষ্ট ১৯টি জিলায় জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রসমানও নয়, ক্রমবর্দ্ধমানও নয়। এই ১৯টি জিলার মধ্যে মেদিনীপুরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হইতেছে না, পড়ে প্রায় সমানই থাকিয়া যাইতেছে।

মেদিনীপুর জিলার মোট ভূমি-পরিমাণের শতকরা ৮০.৫ ভাগ আবাদযোগ্য। ইহার মধ্যে চাষ আবাদ করা হয় মাত্র ৫৯.৮ ভাগ ভূমিতে। অর্থাৎ মোট আবাদযোগ্য ভূমির শতকরা ৭০.২ ভাগ ভূমিতে চাষ আবাদ চলিতেছে। চাষবাসের প্রসার ঘটিলে আবাদযোগ্য ভূমি আর খুব বেশী পাওয়া যাইবে না। আবাদযোগ্য ভূমির মধ্যে এক চতুর্থাংশই অনাবাদী রহিয়াছে। সুতরাং যেমন সমগ্র বাংলাদেশে তেমনি মেদিনীপুর জিলায় অন্নসংস্থানের জন্য ভূমির উপরেই অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে। কৃষিকার্য্যদ্বারা প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র ২৫০ জন লোকের অন্নসংস্থান হইতে পারে, ইহাই ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অভিমত। এই মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, বাংলার কোন কোন অঞ্চলে প্রতি বর্গ মাইলে, ইহার তিন চার গুণ লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালি জিলাকে যদি একটি অঞ্চল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে এই অঞ্চলে প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা এক হাজার হইতে দুই হাজারের মধ্যে। ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ এবং হুগলী এই তিনটি জিলায় প্রতি বর্গ মাইলে আট শত হইতে এক হাজার লোকের বাস। রংপুর, পাবনা, বগুড়া এবং চট্টগ্রাম জিলায় প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ৬৫০ হইতে ৮০০ আট শত পর্য্যন্ত। বর্দ্ধমান, বীরভূম এবং মালদহ জিলায় প্রতি বর্গ মাইলে ৫৫০ হইতে ৬৫০ জন লোকের বাস। মুর্শিদাবাদ জিলার প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ইহার কিঞ্চিৎ বেশী অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে ৬৫৬ জন। যশোহর জেলায় লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ৫৭৬ জন। বাংলা দেশের মধ্যভাগে উত্তর ও দক্ষিণে লম্বভাবে যদি একটি অঞ্চল কল্পনা করা যায় তাহা হইলে এই অঞ্চলে দিনাজপুর, রাজসাহী, নদীয়া এবং চব্বিশ পরগণা এই চারিটি জিলা পড়িবে। এই চারিটি জিলায় প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা চারি শত হইতে পাঁচ শতের মধ্যে। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জিলা লইয়া একটি অঞ্চল ধরিয়া লইলে এই অঞ্চলেও প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা উপরোক্ত দিনাজপুর, রাজসাহী, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা লইয়া গঠিত অঞ্চলের সমান। দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং খুলনা জিলায় প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম—মাত্র ২৫০ হইতে ৪০০-এর মধ্যে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মেদিনীপুরের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ৫৩৪ জন। আহার্য্য সংস্থানের জন্য মেদিনীপুরের ভূভাগের উপর কিরূপ চাপ পড়িয়াছে শুধু উল্লিখিত সংখ্যা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিব না। ১৯৩২-৩৩ সালের সরকারী কৃষি বিভাগের বিবরণীতে দেখা যায়, ঐ সালে মেদিনীপুর জিলায় ১৮৮৪১০০ একর অর্থাৎ ২৯৪৫ বর্গ মাইল ভূমি আবাদ করা হইয়াছে। মেদিনীপুর জিলার মোট আবাদ জমির প্রতি বর্গ মাইলে ৯৫১ জন সংখ্যা অর্থাৎ প্রায় ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জ জিলার অনুরূপ। এই জিলার মোট ভূভাগের শতকরা ৮০.৫ ভাগ আবাদযোগ্য ভূমি। মোট ভূভাগের শতকরা ৫৯.৮ ভাগ ভূমি অর্থাৎ মোট আবাদযোগ্য জমির

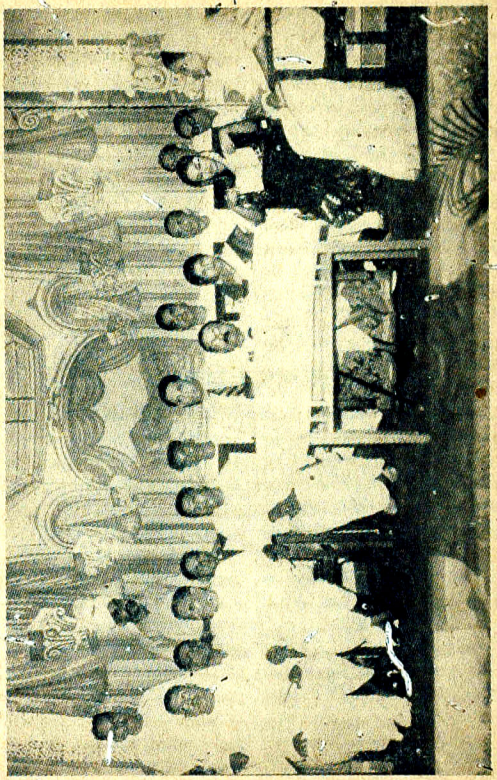

বাঙ্গি-শহরাদিক উৎসবে সভাপতি ও সভাবৃন্দ [আনন্দ বাজার পত্রিকার সৌজন্যে]

শতকরা ৭৪·২ ভাগ রীতিমত আবাদ হইতেছে। সুতরাং আবাদযোগ্য জমির মাত্র এক চতুর্থাংশ এখনও অনাবাদী রহিয়াছে। আবাদী জমি, আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি এবং আবাদী হইয়াও কোন-না-কোন বৎসর পতিত থাকে, এইরূপ জমি লইয়া চাষবাসের যোগ্য মোট জমির পরিমাণ ২৪৫৪৪৬৫ একর অর্থাৎ ৩৮৪১ বর্গ মাইল ভূমি মাত্র। মোট আবাদযোগ্য জমির হিসাবে মেদিনীপুর জিলায় প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ৭২১ জন।

যেমন বাংলার অন্যান্য জিলায় তেমনি মেদিনীপুর জিলাতেও শুধু ভূমির উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, জনসংখ্যার সেই সীমা ইতিপূর্ব্বেই অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই আমাদের দেশের চিন্তানায়কগণ জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে চিন্তিত হইয়া পড়িতেছেন। অথচ বাংলার তথা মেদিনীপুরের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, একথা কিছুতেই বলা চলে না। বস্তুতঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চিন্তা অপেক্ষা বর্দ্ধিত জনসংখ্যার ভরণপোষণের কি ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তাহারই জন্য আমাদের চিন্তা ও চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত। বাংলাদেশে মেদিনীপুর জিলায় শিল্প-বাণিজ্যের এত সম্ভাবনা রহিয়াছে যে তাহাকে সফল করিয়া তুলিতে পারিলে বর্দ্ধিত জনসংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তিত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না। দেশের সমগ্রশক্তি এই শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের জন্যই আজ নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক।

("মেদিনীপুরবাসী")

সঙ্কলন

চন্দ্রকোণার বিবরণ

চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত স্থান হইলেও ইহার ইতিবৃত্ত এ পর্য্যন্ত বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই।

পূর্ব্বে চন্দ্রকোণা হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকোণা ও বরদা—এই দুইটি পরগণা হুগলী জেলা হইতে পৃথক হইয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে।

প্রাচীন চন্দ্রকোণা নদীবেষ্টিত ছিল এবং আয়তনেও বেশ বড় ছিল। ইহার উত্তর, ঈশান ও পূর্ব্বে 'শীলাবতী' নদী, বায়ু কোণে প্রান্তর ও বারাজি, নৈঋত, পশ্চিম, দক্ষিণ এবং অগ্নিকোণে দনাই নদী।

প্রাচীনকালে চন্দ্রকোণার উত্তর দিকস্থ প্রান্তরে সৈন্যাবাস এবং দক্ষিণ দিকস্থ ভূখণ্ডে দেবগিরি ও নয়নগিরি বিদ্যমান ছিল। চন্দ্রকোণা সহরের দক্ষিণে 'বড়বালা' নামে একটি পল্লী আছে। এই 'বড়বালা' গ্রামের দক্ষিণে গড়-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিয়াগেড়ে পল্লীতে 'নানক পুকুর' 'রাণীর পুকুর', 'ঝাঁকরার দীঘি', 'পাঁমার বাঁধের ডাঙ্গা' (সৈন্যাবাস), 'বাজার বুড়ীর ডাঙ্গা' (সৈন্যাবাস) অবস্থিত। উক্ত কিয়াগেড়ে পল্লীর পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বহুপুরাতন কয়েকটি শালবৃক্ষ এখনও দেবগিরি নামের সাক্ষ্য দিতেছে। সহরের দক্ষিণে ৫ মাইল লম্বা ও ৪ মাইল চওড়া ময়দানটি রাজার অশ্বশালা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা অদ্যাপি 'ঘোড়ামাঠ' নামে খ্যাত। চন্দ্রকোণার প্রাচীন নাম ছিল 'মানা'।

চন্দ্রকোণার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্যপত্তনের ইতিহাস বেশ উপভোগ্য। জনশ্রুতি এই যে, পশ্চিম দেশীয় প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত (রাজপুতানার 'চৌহানবংশীয়') রাজা চন্দ্রকেতু পুরুষোত্তম দর্শনাভিলাষে এই স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য 'শীলাবতী' তীরস্থ বৃক্ষছায়ায় শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। 'শীলাবতী'তীরস্থ এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি এখানে একটা নগর স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন। পথশ্রান্ত, ক্লান্ত অনুচরগণকে এখানে রাখিয়া কয়েকজন মাত্র রক্ষী লইয়া রাজা চন্দ্রকেতু পুরুষোত্তম দর্শনে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, দেবদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া এখানে রাজ্য স্থাপন করিবেন।

রাজা চন্দ্রকেতুর প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার অনুচরগণ বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এদিকে রাজা ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন, তাঁহার মনোমত কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তখন মহানন্দে তিনি পৌরবর্গ আনাইয়া নগর নির্ম্মাণ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

চৌহানবংশীয় রাজগণের মধ্যে চন্দ্রকেতু একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে তিনি এ অঞ্চলে রাজত্ব করেন এবং নিজ নামানুসারে 'চন্দ্রকোণা' নামে ইহাকে অভিহিত করেন। বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে মল্লবংশীয় রাজগণের সহিত কোনও সূত্রে বিবাদ উপস্থিত হইলে চন্দ্রকেতু তাহাতে জয়লাভ করেন। তাঁহাদিগকে করদানে বাধ্য করিয়া নিজ রাজধানীর নামানুসারে বাঁকুড়া জেলায় "চন্দ্রকোণা" নামে তিনি একটি গ্রাম স্থাপন করেন। অদ্যাপি উহা 'ওন্দা চন্দ্রকোণা' নামে খ্যাত।

চন্দ্রকেতু যে বীর, ধার্ম্মিক এবং প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল শ্রেণীর সকল জাতীয় প্রজায় তাঁহার রাজধানী পরিপূর্ণ ছিল। প্রজাবৃদ্ধির জন্য স্থান-সঙ্কুলান না হওয়ায় তাঁহাকে শীলাবতীর তীর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে রাজ্যবিস্তার করিতে হইয়াছিল। চন্দ্রকেতুর রাজ্যের চতুর্দ্দিকে পরিখা, গড়, সুবৃহৎ অট্টালিকা, দুর্গ, দেব-মন্দির প্রভৃতি যথেষ্টই ছিল। যে স্থানে নরপতির বাসস্থান ছিল তাহা দ্বাদশ-দুয়ারী বা বারদুয়ারী নামে অভিহিত হইত। এই দুর্গের (রাজপ্রাসাদের) একটি স্থানকে লোকে নৃপতির কোষাগার বা কর্পূরতলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহা পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। আজ পর্য্যন্ত তাহার স্বতিচিহ্ন বিদ্যমান। আজও বনজঙ্গলপূর্ণ প্রাচীন গড়-গুলির ধ্বংসাবশেষ অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। এই গড়-প্রাচীরের সানুদেশসকল ও মধ্যে মধ্যে গড়সকল খনন করিয়া সমতল জমিতে পরিণত করা হইয়াছে। খননকালে বহু মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শোনা যায়।

চন্দ্রকেতুর সৈন্যসামন্ত, অমাত্য, গুরু-পুরোহিত, কথক, পাঠক, ভাস্কর, গায়ক—সমস্তই ছিল। দৌত্যকার্য্যের জন্য সুশিক্ষিত পারাবতও ছিল।

রাজার অভিযানে বহির্গত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে শিক্ষিত পারাবত সকল ফিরিয়া আসিলে অমঙ্গল সূচিত হইত। অন্তঃপুরের রমণীগণ ইহা জানিয়া সতর্ক হইতে পারিতেন।

মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর চন্দ্রকেতু কিছুতেই তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বা কর দিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং তাঁহার সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধ বাধিল। চন্দ্রকোণার ৬ মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব্ব কোণস্থ সমতলক্ষেত্রে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। উহা বর্ত্তমানে পলাশচাবড়ী, বাচকার ডাঙ্গা বা পোলমন ডাঙ্গা নামে খ্যাত। পোলমন নামে চন্দ্রকেতু রাজার এক বীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে ১২৩৮ খৃঃ অব্দে এই প্রান্তরের নাম পোলমন ডাঙ্গা হয়। অন্যান্য একটি দুর্গের ভার এই বীর সেনাপতির উপর অর্পিত ছিল।

ক্রমাগত তিন দিন যুদ্ধের পর পোলমন নিহত হন। একে একে তাঁহার প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে হত হইতে দেখিয়া পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও চন্দ্রকেতু সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন না। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তিনি শত্রুদিগের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই পারাবত সকল অন্তঃপুরে পৌছিল। রাজমহিষীগণ একেই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সংবাদ না পাইয়া উৎকণ্ঠিতা ছিলেন, তদুপরি অদূরে মুসলমানদিগের হর্ষধ্বনিতে এবং পারাবতের আগমনে শত্রু-নিপীড়িতা হইবার ভয়ে জহর-ব্রতে প্রাণত্যাগ করেন। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে যে বৃহৎ সরোবরের তীরস্থিত অট্টালিকায় অন্তঃপুরচারিণীগণ তৎকালে বসবাস করিতেছিলেন এবং যেখানে জহরব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তাহা এখন 'জহর পুকুর' নামে খ্যাত। এই পুষ্করিণীর তীরে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও পাওয়া যায়। এবাদ, এখনও ঐ পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরা হয় না এবং সাঁতার দিয়া কেহ পারাপার হয় না।

রাজকুমার বসন্ত বাহাদুর মুসলমানদের কর দিয়া কিছুদিন রাজত্ব করতঃ পরলোকগমন করেন। তারপর তদীয় পুত্র সূর্য্যভানু, চন্দ্রভানু এবং তাঁহাদিগের কনিষ্ঠগণ —বীরভানু, হরিনারায়ণ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। চন্দ্রকেতুবংশীয় শেষ রাজকুমার মিত্রসেন ১৪শ খৃষ্টাব্দের

শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার নাম লক্ষ্মণাবতী। ইতি মল্লরাজবংশ-দুহিতা, নারায়ণ মল্লের ভগিনী। রাজমাতা লক্ষ্মণাবতীর তিনটি কীর্ত্তি আজিও বর্ত্তমান। ইনি দ্বাদশ-দুয়ারী দুর্গমধ্যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে 'গিরিধারীজি' নামে অভিহিত করেন। ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গস্থ মন্দিরের পাদদেশে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত শিলালিপি এখনও বর্ত্তমান। শিলালিপিটুকু নিম্নে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৭৭

শাকেহস্থ মুনিবাণচন্দ্রো বৈশাখে শুক্লপক্ষকে
তৃতীয়ায়াং তৃণ্ডদিনে শ্রীযুক্তস্য বভূব হঃ
হরিনারায়ণভূপস্য পত্নী শ্রীলক্ষ্মনাবতী
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যৈ নবরত্নমিদং দদৌ।
রাধাকৃষ্ণপাদারবিন্দরসিকা শ্রীবীরভানোর্বধূঃ
খ্যাত শ্রীহরিভূপতেশ্চ বনিতা শ্রীহোলরাজাত্মজা।
মাতা শ্রীযুক্ত মিত্রসেনসুপতের্বিখ্যাতকাত্যেস্থিতৌ
শ্রীনারায়ণ মল্লভূপ-ভগিনী রম্যং দদৌ মন্দিরং॥
গিরিধারীপদাম্বুজে নবরত্নমিদং শুভং
নির্ম্মায় বহু যত্নেন সমর্পিতবতীমুদা—

—গোকুল দাস *

* পৌরাণিক—শ্রীমোহন চক্রবর্ত্তী

রাণী লক্ষ্মণাবতী একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহা "রাজার মায়ের" পুকুর নামে খ্যাত। তাঁহার আর একটি কীর্ত্তি—কালীপূজা। বর্ত্তমান চন্দ্রকোণা সহরের অন্তর্গত মিত্রসেনপুর নামক পল্লীতে প্রতি বৎসর শ্যামাপূজার দিন মৃত্তিকানির্ম্মিত এক বিরাট কালীমূর্ত্তির পূজা হয়। এক্ষণে উহা "রাজার মায়ের কালী" নামে অভিহিত।

চৌহানবংশীয় রাজগণের রাষ্ট্রে দেবতা ও ধর্ম্মের প্রতি ভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের নির্ম্মিত দুর্গ সমূহে আরও অনেক দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বাদশ-দুয়ারী দুর্গের অনতিদূরে দুইটি শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে একটি ১৯০ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। কিছুকাল পরে নগরের পশ্চিমপ্রান্তে রামগড় ও লালগড় নামক দুইটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ইহাদের মধ্যে রঘুনাথ মূর্ত্তি শালগ্রাম প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৫২২ খৃঃ অব্দে দ্বাদশ-দুয়ারী দুর্গস্থ গিরিধারীজি মূর্ত্তি লালগড় দুর্গে আনীত হয়। মিত্রসেন অপুত্রক থাকায় ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে দৌহিত্র সূত্রে মল্লবংশীয়গণ রাজত্বের উত্তরাধিকারী হন। মল্লবংশীয় রাজগণ চৌহান-বংশীয় রাজগণের সমুদয় কীর্ত্তি সজীব রাখিয়া গিয়াছেন।

কালাপাহাড় যখন প্রবল পরাক্রমে উড়িষ্যা জয় যাত্রা করেন, হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি যখন দেব-মন্দির ও দেবমূর্ত্তিসমূহ ভগ্ন করিয়া পিতৃধর্ম্মের লাঞ্ছনা করিতেছিলেন, তখন (১৫৬৭ খৃঃ) ৯৯০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত পূর্ব্বোক্ত শিবলিঙ্গের পূজকগণ—তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে দেবতা কলুষিত হইবার আশঙ্কায়—বিগ্রহটিকে প্রস্তরাবরণে আবৃত করেন। কালাপাহাড় এখানে আসেন নাই বটে, কিন্তু শিবলিঙ্গটি অদ্যাপি সেই অবস্থায়ই রহিয়াছে। মল্ল রাজগণ ইহার জন্য একটি বৃহৎ প্রস্তর-মন্দির নির্ম্মাণ ও একটি ইঁদারা খনন করান। তদবধি এই শিবলিঙ্গ মল্লেশ্বর নামে অভিহিত। এই স্থানের নাম মল্লেশ্বরপুর। মল্লেশ্বরের নিত্য পূজা যথারীতি অদ্যাপি সম্পন্ন হয়। শারদীয় পূজার সময় মহাসমারোহে ইহার পূজা হইয়া থাকে। মল্লেশ্বরের দৈব মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এ অঞ্চলে মল্লনাথের তোপ শুনিয়া সন্ধিপূজা হয়।

মল্লেশ্বরের অনতিদূরে প্রাচীন বটবৃক্ষতলে অপর শিব-লিঙ্গটি বর্ত্তমানে 'উজননাথ' নামে অভিহিত। এখানে যথারীতি গাজন উৎসব হইয়া থাকে।

মল্লবংশীয় রাজগণের রাজত্বের শেষভাগে চন্দ্রকোণার উত্তর প্রান্তে একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হয়। রামগড় নামক দুর্গে যে রঘুনাথমূর্ত্তি শালগ্রাম ছিলেন, তাহা লুপ্ত হওয়ায় মল্লবংশীয়গণ এই নূতন দুর্গের অনতিদূরে একটি সুদৃশ্য বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে অষ্টধাতু নির্ম্মিত রঘুনাথমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রঘুনাথজী বিগ্রহের পাদদেশে নির্ম্মাতা গঙ্গারাম ভাস্করের † নাম লিখিত রহিয়াছে। এই নাম লেখা সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে রাজারাণীর নাম না লিখিয়া ভাস্কর মুক্তি কামনায়

* গোকুল দাস এই মন্দিরের ভাস্কর ছিলেন। মোহন চক্রবর্ত্তী উপরোক্ত কথা রচনা করেন।

† ইহার পৌত্রিগণ ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন কর্ত্তিত বলিয়া 'কীর্ত্তনীয়া' উপাধি পাইয়াছিল—আসল উপাধি 'গ্রণী'।

ভগবানের পাদপদ্মে নিজ নাম লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। এজন্য ভাস্কর রাজক্রোধে পতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শাস্তির পূর্ব্বেই তাহার আত্মা রঘুনাথ-পদে লীন হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। রাম-চন্দ্রের এই প্রতিমূর্ত্তি চন্দ্রকোণার তৎকালীন ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্যের সুন্দর পরিচয়।

লালগড় দুর্গস্থিত গিরিধারীজিকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া রঘুনাথজীউর মন্দির মধ্যে আর এক নূতন মন্দিরে স্থাপন করা হয়। সেই অবধি উক্ত বিগ্রহ লালজী নামে খ্যাত। রঘুনাথজীউর স্থাপয়িতা এই নূতন দুর্গের নাম রঘুনাথগড় রাখিয়াছিলেন। আজিও উহা রঘুনাথগড় নামে খ্যাত। যে স্থানে রঘুনাথজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানটি অযোধ্যা নামে খ্যাত। এই রঘুনাথগড় দুর্গের মধ্যে 'সীমাসাগর', 'রণসাগর' নামে দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে। পুষ্করিণী চন্দ্রকোণার উত্তরসীমায় নিপাত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম সীমাসাগর। চন্দ্রকোণায় হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের তিনটি অস্থল (আস্তানা) এবং নানক সম্প্রদায়ের একটি মঠ আছে।

অস্থল বা মঠ তিনটি বড়, মেজ ও ছোট অস্থল নামে খ্যাত। পূর্ব্বতন প্রথানুসারে আজিও উহা মোহান্তগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। মঠটি 'নানক মঠ' নামে খ্যাত। চৌহানবংশীয় ও মল্লবংশীয় রাজগণ ও তৎকালীন প্রজারা যে কেবল ধর্ম্মের জন্যই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, ধর্ম্মই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল এবং দেবতার দেবকীর্ত্তিতে চন্দ্রকোণা যে দিবারাত্র মুখরিত ছিল তাহা অতীত ইতিহাস হইতে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে। উপরোক্ত দেব-মন্দির ভিন্ন আরও বহু দেব-মন্দির—বহু অট্টালিকা আজিও চন্দ্রকোণার অতীতস্মৃতি বুকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মল্লবংশীয় রাজবংশের সহিত বর্দ্ধমান রাজবংশের বিরোধের ফলে এই প্রদেশ বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচাঁদ বাহাদুরের শাসনাধীনে চলিয়া যায়। চন্দ্রকোণা বর্দ্ধমান রাজ্যের জমিদারীভুক্ত হইবার পর বর্দ্ধমানাধি-পতি উক্ত দেবতাগণের উত্তমরূপে সেবা-পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে তদীয় পৌত্র তেজচাঁদ বাহাদুর দেবতাদিগের সেবাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইবার জন্য নানারূপ সুব্যবস্থা করেন এবং প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া ঠাকুরবাড়ীগুলিকে সুশোভিত করেন। সেই অবধি বর্দ্ধমান-রাজগণের আনুকূল্যে চৌহান ও মল্ল বংশীয় রাজগণের দেবকীর্ত্তি সকল বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমানে চন্দ্রকোণায় বারদুয়ারী, লালগড়, রামগড় ও রঘুনাথগড় নামক গড়, সীমাসাগর, রণসাগর, লালসাগর, রাজমাতা পুষ্করিণী, জহর পুষ্করিণী নামক কয়েকটি বৃহৎ পুষ্করিণী এবং রঘুনাথজী, লালজী, মল্লেশ্বর ও উজননাথ বিগ্রহ বর্ত্তমান। লালজীউর রথ ও ঝুলন, রঘুনাথজীউর পুষ্যাভিষেক, বিজয়ার রথ, অস্থলের ঝুলন উৎসব ও রথযাত্রা, মল্লেশ্বরের শারদীয় পূজা এবং উজননাথের গাজন উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে এখানে খুব বড় মেলা হয়। চন্দ্রকোণার পশ্চিম প্রান্তে চাঁচরবেড় নামক স্থানে মুক্ত প্রান্তরে "অধর আশ্রম" নামে একটি আশ্রম সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আশ্রমটি অল্পদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আশ্রমটি অধরচাঁদ গোস্বামী নামক জনৈক বৈষ্ণব গুরুর শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় (জীরাট হাইস্কুল) এবং ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইয়া অদ্যাপি পরিচালিত হইতেছে। চন্দ্রকোণায় ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দুইটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। মিউনিসিপ্যালিটীর ৬টি ওয়ার্ডে ৫৪খানি গ্রাম আছে। তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে বহুসংখ্যক পটী, বাজার ইত্যাদি আছে। প্রতিদিন বাজার বসে এবং সপ্তাহে চারিটি হাট হয়। পোষ্ট অফিস, থানা, রেজেষ্ট্রী অফিস, ইত্যাদি সমস্তই মহাশ্মশানের মধ্যে অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া আছে। দাতব্য চিকিৎসালয় এখানে একটি আছে। চন্দ্রকোণার পরিধি বর্ত্তমানে দশ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১২৭৯ সালে ১৩১১ জন ছিল, ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া ১৩১০ সালে ৯৩০০ জনে দাঁড়াইয়াছিল। বর্ত্তমানে লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই আরো অনেক কমিয়াছে। সঠিক সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

চন্দ্রকোণার শিল্পবাণিজ্যের মধ্যে সূত ও তাঁতের কাপড় প্রধান। বঙ্গের বাহিরে চন্দ্রকোণার মট্‌কি সূতের একদিন সুনাম ছিল,—অনেক বণিক্ গোয়ালাও এখানে ছিল।

অদ্যাপি 'গয়লাসরাই' নামক স্থানে তাহাদের দু'চার ঘর বসতি আছে। কালের কি কুটিলা গতি—যে-চন্দ্রকোণা হইতে একদিন শত শত মণ 'মট্‌কি' ঘৃত বাহিরে চালান হইত আজ সেখানে আড়াই সের ঘৃতের জন্য চারিদিন পূর্ব্বে বায়না দিতে হয়!

এ অঞ্চলের পিতলের বাসন ও শিল্প এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। বহু পুরাতন শিল্প এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে চন্দ্রকোণার প্রধান কৃষি পান। সহরের বিভিন্ন স্থানে পানের বরজ দেখা যায়। বারুজীবীর বংশ এখনও লোপ পায় নাই। জেলার বিভিন্ন স্থানে চন্দ্রকোণার "বুটের মিঠাই"এরও খ্যাতি যথেষ্ট। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানে ও কবিতা রচনায় চন্দ্রকোণার বহু ব্যক্তি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। রমাপতি দেবশর্ম্মা একজন বিশিষ্ট কবি ও গায়ক ছিলেন। ভাগবত গোস্বামী ছিলেন রঘুনাথজীর প্রথম ও প্রধান পুরোহিত। গুরু সদয় দত্ত একজন ধনী মহাজন ছিলেন। বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ্য হইতে ধারণা হয় যে, এক সময়ে চন্দ্রকোণায় নানা জাতীয় ধনীর অভাব ছিল না। সেই চন্দ্রকোণা আজ ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের অধোগতিতে, দুর্ভিক্ষের কশাঘাতে আর ম্যালেরিয়ার সংহারলীলায় এক মহাশ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিকারে ব্রতী না হইলে কালে চন্দ্রকোণার নাম একেবারে বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। সঙ্ঘশক্তি ভিন্ন নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের কোনও আশা নাই।

("মেদিনীপুরবাসী")

সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দত্ত

মেদিনীপুর লক্ষ্মী প্রেস হইতে শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পল্লী-শ্রী

১ম বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৪৫ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাংলা-গদ্যের জনক মেদিনীপুর-নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন পর্য্যন্ত হতভাগ্য বাংলা-গদ্যের জনক-হিসাবে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিদ্বজ্জনসমাজে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; কচিৎ কদাচিৎ উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামোল্লেখও দেখা যায়। এই রূপ জনক-বিভ্রম অথবা বহুজনকত্বের কারণ ইহাই অনুমান করা যায় যে, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইতে আধুনিক প্রসার পর্য্যন্ত ইতিহাস সমগ্রভাবে এত দিন দেখা হয় নাই; খণ্ডশঃ দেখিতে গিয়া কখনও রামরাম, কখনও রামমোহন প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, সমগ্রভাবে দেখিবার উপযুক্ত উপকরণেরও এত দিন অভাব ছিল। সম্প্রতি কিছু কাল যাবৎ, শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রামাণিক ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টায় বাংলা-গদ্যসাহিত্যের প্রাচীনতম যুগের বহু রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং আমরা নিঃসংশয়ে বাংলা-গদ্যের এক জন আসল জনক নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি। এই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির নাম মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। 'বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যে'র লেখক রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ভ্রমক্রমে ইঁহাকেই মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে যাঁহারা বাংলা-গদ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—রামরাম বসু, উইলিয়ম কেরী, গোলোক শর্ম্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ও হরপ্রসাদ রায়। পাণ্ডিত্য ও ভাষার গুণ বিচার না করিয়াও শুধু রচিত পুস্তকের সংখ্যাধিক্যেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই দলের প্রধান। গোলোক শর্ম্মা, তারিণীচরণ, রাজীবলোচন, চণ্ডীচরণ, রামকিশোর ও হরপ্রসাদ প্রত্যেকেই একখানি করিয়া, এবং কেরী ও রামরাম প্রত্যেকেই দুইখানি করিয়া সাহিত্য-বিষয়ক গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একা মৃত্যুঞ্জয়ই ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চারখানি গ্রন্থ—'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' রচনা করেন, তন্মধ্যে প্রথম তিনখানি তাঁহার জীবিতকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

কিন্তু পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না; উক্ত লেখক-সম্প্রদায়মধ্যে একমাত্র তাঁহারই ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যবুদ্ধি এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, লিখিতে বসিয়াই তিনি লেখার একটা স্টাইল খাড়া করিতে পারিয়াছেন; সাধু ও চলতি এই দুই ভিন্ন রীতির পার্থক্য বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তিনিই বাংলা-গদ্যের সর্ব্বপ্রথম কন্‌শাস আর্টিস্ট (conscious artist)। বাকী যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভিন্ন-ধর্ম্মী নানা শব্দ জোড়া দিয়া অর্থপূর্ণ বাক্য গঠনে প্রাণান্তকর প্রয়াস করিতে হইয়াছে; তাঁহাদের অসমঞ্জস ভাষার মধ্যেই এই প্রয়াসের ইতিহাস বর্ত্তমান। বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত ভাষায় এবং বেদান্ত, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে এমনই পারঙ্গম ছিলেন যে, সম্পূর্ণ নূতন ভাষায় বিভিন্ন স্টাইলের কৌশল ও সহজ পারদর্শিতা তিনি অক্লেশে প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং বাংলা-গদ্যের জনকত্বের গৌরব যদি কাহারও উপর অর্পণ করিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকেই স্মরণ করিতে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কি ওড়িয়া?

আনুমানিক ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম, বিদ্যাশিক্ষা নাটোরে—নাটোরের সভাপণ্ডিতের নিকট।* মেদিনীপুর তখন উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই কারণে মার্শম্যান্ তাঁহাকে উৎকল-জাত বলিয়াছেন। কেরীর চরিতকার জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয়ের মাতৃভাষা ওড়িয়া। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তিনি "জাতিতে উড়িয়া।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি চট্টোপাধ্যায়-বংশসম্ভূত কুলীন ব্রাহ্মণ, এবং উড়িষ্যায় তাঁহার জন্ম হইলেও তিনি বহুদিন কলিকাতা-নিবাসী ছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রসিদ্ধ অভিনেতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি আপনাকে মৃত্যুঞ্জয়ের "পৌত্র" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী

নবাগত ইংরেজ সিবিলিয়ানদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে এ-দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য গবর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সনের মে মাসে এই কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন।

পাঠনার উপযোগী কোন বাংলা-গদ্যগ্রন্থ তখন ছিল না। পাঠ্যপুস্তকের অভাব কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষও অনুভব করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহারা দেশীয় পণ্ডিতগণকে গদ্যগ্রন্থ-রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। ইহা ছাড়া এই সকল রচনা প্রকাশের আনুকূল্যার্থ কলেজ-কাউন্সিল পুস্তকের অনেকগুলি খণ্ড কলেজের জন্য ক্রয় করিতেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কলেজের পাঠ্যপুস্তক রূপে 'বত্রিশ সিংহাসন' রচনা করিয়া পারিশ্রমিকস্বরূপ কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুই শত টাকা পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কলেজের জন্য এক শত খণ্ড 'বত্রিশ সিংহাসন' ছয় শত টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল।

মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ভাষায় পারদর্শী ত ছিলেনই, পরন্তু সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। ১৮০৫ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়ানদিগকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এক জন অধ্যাপকের প্রয়োজন হয়। উইলিয়ম কেরীর সুপারিশে মৃত্যুঞ্জয় এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে কেরী কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন :—

> He is one of the best Sangskrit scholars with whom I am acquainted...Mritoonjoya...is willing to go through any examination respecting his abilities, and knowledge of the Sangskrit language which the College Council may think proper.

সুপ্রীম-কোর্টের জজ-পণ্ডিত

দীর্ঘ ১৫ বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করিবার পর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সুপ্রীম-কোর্টের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন (জুলাই ১৮১৬)। সুপ্রীম-কোর্টের বিচারপতি স্যর ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেনের অধীনে মৃত্যুঞ্জয় জজ-পণ্ডিতের পদে তিন বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে রীতিমত জ্ঞান না থাকায় তৎকালে ইউরোপীয় বিচারকেরা হিন্দু পণ্ডিতের সাহায্যে হিন্দুর মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন। মৃত্যুঞ্জয় এই কার্য্যে ম্যাক্‌নটেনের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। তখনকার দিনে সুপ্রীম-কোর্টে ধনী হিন্দুদের মকদ্দমা লাগিয়াই থাকিত। এই সকল মামলা-মকদ্দমা ও তাহার অনিবার্য্য ফল সম্বন্ধে সেকালের একখানি সংবাদপত্র লেখেন :—

> সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ সুপ্রিমকোর্টে অমুকের দুই তিনটা একটির মোকদ্দমা চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেন আমারদের বোধ হয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তদ্রূপ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন না। পাণ্ডিত্যবিষয়ে অদ্বিতীয় সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক হইতে সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই।—'সমাচার দর্পণ' ৩১শে অক্টোবর ১৮২৯।

মৃত্যু

১৮১৮ সনের শেষাশেষি কয়েক মাসের অবসর লইয়া মৃত্যুঞ্জয় তীর্থভ্রমণে বাহির হন। কাশী, প্রয়াগ, গয়া

* অক্ষয়চন্দ্র সরকার : "মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার"—'নবজীবন,' মাঘ ১২৯৫ দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া তিনি কলিকাতা ফিরিতেছিলেন। ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি, পথে মুর্শিদাবাদের নিকটে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সেকালের সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' ১৯ জুন ১৮১৯ তারিখে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> মরণ।—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রীয় বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও উপার্জ্জনানুসারে বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন এবং মোং কলিকাতায় কোম্পানির কালেজের আরম্ভাবধি তাহার প্রধান পাণ্ডিত্য কর্ম্ম পাইয়া অনেক২ বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং দুই তিন বৎসর হইল কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্মেতে স্বদশম পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সুপ্রীমকোর্টের পাণ্ডিত্য কর্ম্ম করিতেছিলেন পরে আট মাস হইল সুপ্রীমকোর্টের সাহেবেরদের নিকট বিদায় হইয়া তীর্থদর্শনার্থ গিয়া কাশী প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি তীর্থ র্শন করিয়া বাটী আসিতেছিলেন, পথে মোং মুরশিদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সে-যুগের এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার কলিকাতা বাগবাজারের বাসগৃহে রীতিমত শাস্ত্রচর্চ্চা হইত। ওয়ার্ডের গ্রন্থে প্রকাশ, ১৮১৭ সনে বাগবাজারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠী ছিল; ১৫ জন ছাত্র তথায় অধ্যয়ন করিত।

হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের গভীর জ্ঞানের কথা রাজ-পুরুষদেরও অজ্ঞাত ছিল না। ১৮১৭ সনে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি সহগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান অনুসন্ধান করিয়া জানাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করিয়া উত্তরে মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম : "চিতারোহণ অপরিহার্য্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম্মজীবনযাপন—এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।" *

মৃত্যুঞ্জয়ের এই অভিমত ১৮১৭ সনে প্রদত্ত হয়। রামমোহন রায়ের সহমরণবিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সনে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সহগমন যে অবশ্যকর্ত্তব্য নয়, বরং ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনের মধ্যে প্রথমটিই শ্রেয়ঃ—এই অভিমত রামমোহনের পূর্ব্বেই মৃত্যুঞ্জয় প্রথম প্রকাশ করেন। সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন-কালে রামমোহন রায় তাঁহার প্রচারিত একখানি ইংরেজী পুস্তিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের এই মত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। †

রচনাবলী

মৃত্যুঞ্জয় যে-কয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 'রাজাবলি,' 'রেদান্ত চন্দ্রিকা,' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' মৌলিক গ্রন্থ, বাকীগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। এই সকল গ্রন্থের নাম, প্রকাশকাল ও রচনার নিদর্শন দিতেছি। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তিনি কিরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় গদ্য লিখিয়া গিয়াছেন, রচনার এই সকল নিদর্শন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

(১) বত্রিশ সিংহাসন। ১৮০২।

রচনার নিদর্শন :—

> পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্রপুত্র যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকেন না সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ব ধন থাকিলেই হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে উৎপন্না হইয়াছেন অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর এই লক্ষ্মীর গর্ব্বে কন্দর্প জন্মিয়াছেন এই প্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরেও কন্দর্প দর্প করেন। অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ পুরুষের মহত্ব দর্প যে কিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয়। অতএব কহি এরূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয়।

(২) হিতোপদেশ। ১৮০৮।

(৩) রাজাবলি। ১৮০৮।

কলির আরম্ভ হইতে ইংরেজ অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাট্‌গণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 'রাজাবলি'তে

* মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমতের সারাংশ ইংরেজীতে ১৮১৯ সনের অক্টোবর সংখ্যা মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

† Some Remarks in vindication of the resolution passed by the Goverment of Bengal in 1829 abolishing the practice of female sacrifices in India.

আছে। ইহাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস।

'হিতোপদেশ' ও 'রাজাবলি' একই সালে প্রকাশিত হয়। 'রাজাবলি' হইতে রচনার নিদর্শনস্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

এক দিবস রাজা ভর্ত্তৃহরি সভামধ্যে পাত্র মিত্রসমেত বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ দেবপ্রসাদলব্ধ অলৌকিক এক ফল লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া ঐ ফল দিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন হে মহারাজ এ ফল খাইলে মনুষ্য দেবতুল্য অজর অমর হইয়া থাকে। রাজা ঐ ফল পাইয়া ব্রাহ্মণের সম্মান করিয়া ঐ ফল লইয়া অনঙ্গাকে বড় ভাল বাসেন এই প্রযুক্ত তাহাকে দিলেন অনঙ্গা আপন উপপতিকে বড় ভাল বাসে অতএব ঐ ফল উপপতিকে দিল অনঙ্গার উপপতি লক্ষ্যনামে বেশ্যাকে বড় ভাল বাসিত এতাবতা সেই ফল তাহাকে দিল সে সে ফল পাইয়া রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দিল রাজা ভর্ত্তৃহরি সে ফল দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কাহাকেও কিছু না কহিয়া এ ফল বেশ্যা কি রূপে পাইল ইহার অনুসন্ধান মনে মনে করিতে লাগিলেন কএক দিবসের পর সবিশেষ তদন্ত করিয়া অনঙ্গার যে কেবল কপটপ্রীতি ইহা বিলক্ষণরূপে নিশ্চয় জানিয়া এক কবিতা করিলেন সে কবিতার অর্থ এই যে অনঙ্গাকে আমি মনে সর্ব্বদা চিন্তা করি সে অনঙ্গা আমাতে বিরক্ত হইয়া অন্য পুরুষকে ইচ্ছা করে সে পুরুষ তাহাতে অনুরক্ত না হইয়া অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত হয় আমারদের তিনে যে এই মিথ্যাপ্রীতি ইহাতে পিঙ্গলাদি স্ত্রীরা আমারদের উপরে ক্রুদ্ধা থাকিতেন অতএব এ সংসারে রাগ দ্বেষমূলক যে আনুকূল্য প্রাতিকূল্য জ্ঞান সে কেবল ভ্রমমাত্র অতএব সে অনঙ্গাকে ধিক তাহার উপপতিকে ধিক ইহার ঘটক যে কাম তাহাকে ধিক এ বেশ্যাকে ধিক এবং আমাকে ধিক এই এই মতে রাজা ভর্ত্তৃহরি সদসদ্বিবেচনা করিয়া জ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশানুসারে সাংসারিক যাবদ্বস্তু বিষয়ক দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া সংসারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রবেশ করিলেন। এই রাজা ভর্ত্তৃহরি কৃত অনেক কাব্যাদি শাস্ত্রের প্রচার অদ্যাবধি লোকেতে আছে। এবং ঐ ভর্ত্তৃহরি ঐ ফল ভক্ষণ করিয়া যোগি রূপে চিরজীবী হইয়া আছেন।

(৪) বেদান্ত চন্দ্রিকা। ১৮১৭।

১৮১৫ সনে 'রামমোহন রায় 'বেদান্তসার' প্রকাশ করিলে মৃত্যুঞ্জয় তাহার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' রামমোহনের 'বেদান্তসার' গ্রন্থের উত্তর।

রচনার নিদর্শন :—

পরমধর্ম্মনী ধার্ম্মিক সৎপুরুষেরদের নির্ম্মলজ্ঞানবর্দ্ধিতে বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকনাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতিযত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা বিগর্হবী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র সহিত তাহার ইংরেজী অনুবাদ *An Apology for the Present System of Hindoo Worship* একত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

(৫) প্রবোধ চন্দ্রিকা। ১৮৩৩।

আনুমানিক ১৮১৩ সনে মৃত্যুঞ্জয় এই পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় ইহা প্রকাশিত হয় নাই; ১৮৩৩ সনের মে মাসে শ্রীরামপুর হইতে মার্শম্যান্ সাহেবের ভূমিকা সম্বলিত হইয়া ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

রচনার নিদর্শন :—

তদনন্তর ঐ বিশ্বরঞ্চক সরোবরে স্নান করিয়া তরুতলে আসিয়া স্বকীয় ঘৃতকুম্ভ না দেখিয়া তাহার শর্করাকুম্ভ অবলোকন করিয়া মনেং অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল আজি এ বেটা বড় ফাঁকি পাইয়াছে ঈশ্বরবিড়ম্বিত স্বয়ং বিড়ম্বিত হয় আমার অদ্য অনায়াসে যে লাভ হইল সেই ভাল। এইরূপ মনে করিয়া পরমানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিল। বাটীর নিকটে গিয়া আপন স্ত্রীকে ডাকিল ও ঢকের না ওরে দৌড়িয়া শীঘ্র আয় মাথাহইতে ভার নামা আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী প্রতিক্রিয়া কহিল ওগো আমি যাইতে পারিলো না আমার হাত ঘোড়া আছে। তৎপতি বিষণ্ণকৃত আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল আয় এই নে আজি বড় মজা হইয়াছে দীবা সার গুড় এক কুপা পাওয়া গিয়াছে এক বেটা লক্ষ্মীছাড়া আপন এই গুড় ফেলাইয়া আমার সেই ঘিএর ঘড়া জানিনতো তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে মনেং বড় হর্ষ হইয়াছে যে আজি ষণ্মেই ঘৃত পাইলাম পশ্চাৎ টের পাইবে যা শীঘ্র ধোবাড়া কর আমি নাইয়াই আসিয়াছি ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে। স্ত্রী কহিল গুড় হইলেই কি রাঁধা হয় তেল নাই লুন নাই চাউল নাই তরকারিপাতি কিছুই নাই কাঠগুলা সকলি ভিজা বেসাতি বা কিরূপে হবে তাতে আবার মৌড়ুঁড়ি অন্ধকা হইয়াছে কুটনা বা কে কুটিবে বাটনা বা কে বাটিবে। তৎপতি কহিল আজি কি ঘরে কিছুই নাই দেখদেখি খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে তবে তার পিঠা কর এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল বটে পিঠা করা বুঝি বড় সোজা জান মা পিঠা আঠা যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র

ছাড়ে না তেমনি পিঠার লেঠা বড় লেঠা শীঘ্র ছাড়ে না কথনোতো রাঁধিয়া খাও নাই আর লোকেরদের মাউগের মতন মাউগ গাইয়া থাকিতে তবে জানিতে।

উপসংহার

বাংলা-গদ্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়ের বিলুপ্তপ্রায় জীবনী ও কীর্ত্তির সংক্ষেপ পরিচয় দাখিল করিলাম। তিনি যে অসাধারণ কীর্ত্তিমান ও বিপুল পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাহা কালধর্ম্মে আমরা আজ বিস্মৃত হইলেও তাঁহার কালে তিনি উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত ছিলেন না। বৃহৎ সৌধের ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপন-দিনে আমরা উৎসব করিয়া থাকি, কিন্তু সৌধ সমাপ্তির পর যুগ যুগ অতীত হইলে সেই ভিত্তির কথা কয় জন স্মরণ রাখি? স্মরণ রাখি আর নাই রাখি, তাহার অস্তিত্ব ও প্রাধান্য সহৃদয় লোকের কাছে চিরদিনই সত্য রহিয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের বিরাটত্ব যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক সেই জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান্ তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করিয়াছেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আমি সেই যুগন্ধরের প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। তাঁহার মত বৈদেশিকু প্রধানের উক্তি শুনিলে সকলেই বিস্মিত হইয়া ভাবিবেন কি অসাধারণ আত্মবিস্মৃতির ফলে এমন লোককে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। মার্শম্যান্ বলিতেছেন,—

> At the head of the establishment of Pundits [at the College of Fort William] stood Mritunjoy.....a colossus of literature. He bore a strong resemblance to our great lexicographer, [Dr. Johnson] not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanscrit classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour.

[রাঁচিতে হিন্দু ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন্ ক্লাব অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনীর তৃতীয় দিবসে (২৫ অক্টোবর) প্রদত্ত সভাপতির বক্তৃতা।]

শিশু-সাহিত্য

যে সাহিত্য বিশেষ ক'রে শিশুদের জন্যই রচিত, যা শিশুরা সহজেই বুঝতে পারে, তাকেই শিশু-সাহিত্য বলা হয়। যে রচনার অর্থ বুঝতে, যার রসোপলব্ধি করতে হ'লে শিক্ষকের সাহায্য নিতে হয়, তাকে শিশু-সাহিত্যের গণ্ডির বাইরে রাখাই উচিত। স্কুলের ওপরের চারটি শ্রেণীতে বালক-বালিকারা যে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়, তাকে শিশু-সাহিত্য বলা যায় না; কেন না, সে সাহিত্য পড়তে বুঝতে শিক্ষকের সাহায্য আবশ্যক হয়, এবং এই জন্যই বালক-বালিকারা স্বেচ্ছায় সে সাহিত্য পড়তে চায় না।

রচনার বিষয়বস্তু শিশু-মনকে আকর্ষণ করে তখন, যখন বিনা আয়াসে তা পড়তে পারে এবং তার রসভোগ করতে পারে। পাণ্ডিত্য অথবা সাহিত্য-রচনার শক্তি থাকলেই শিশু-সাহিত্য রচনা করা যায় না, তাতে হয়তো শিশুদের উদ্দেশ ক'রে বই লেখা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত শিশু-সাহিত্য রচনা করতে হ'লে শিশুর মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। এই মনস্তত্ত্বে পারদর্শী হওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার। বয়স্ক ব্যক্তির কাছে যে জিনিস আদর পেতে পারে, শিশুর কাছে তা অনেক সময়েই অকিঞ্চিৎকর। বিবেচক পাঠক যে 'আর্টে' মুগ্ধ হন, শিশুর কাছে সে 'আর্ট' ব্যর্থ। শিশুর চিত্ত সদাই চঞ্চল, তার খেয়ালী মনে ভাবের গাম্ভীর্য্য থাকতেই পারে না। কিন্তু এই শৈশবে মনের ওপর একবার যে ছাপ পড়ে, পরিণত বয়সেও তা একেবারে মুছে যায় না। সেই জন্য শিশু-সাহিত্য রচনায় সাবধানতার যথেষ্ট প্রয়োজন।

শিশু-সাহিত্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে শিশুর ভবিষ্যৎ কল্যাণ। শিশু-সাহিত্য যাঁরা রচনা করেন, তাঁরা মোটামুটি দুটি কথা মনে রেখে কাজে অগ্রসর হন, প্রথম—শিশু-মনে আনন্দ দেওয়া, এবং দ্বিতীয়—শিশু-চিত্তের প্রসারতা বৃদ্ধি করা। কিন্তু কেবল এই দুটি কথা মনে রেখেই কাজ করলে চলবে না; কেন না, শৈশবের সীমা

ক্ষুদ্র হ'লেও তার রূপ বিচিত্র। ভোরের আলোয় আকাশের রং যেমন ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়, শিশুর মনও সেই রকম বর্ষে বর্ষে নূতন আলোয় রঙিন হয়ে ওঠে। প্রথম যেদিন তার হাতে-খড়ি হ'ল, সে দিনটি থেকে সুরু ক'রে তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত সে প্রতিদিন যেন নূতন জগতের সন্ধান খুঁজে বেড়ায়। সেজন্য এক রকম মনোভাব নিয়ে কেবল তাদের আনন্দ দেওয়ার ও জ্ঞান বিতরণ করার চেষ্টা করলে শিশু-সাহিত্য রচনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ছোট ছেলেরা ছন্দ ভালবাসে। তাই ছেলেদের কবিতার প্রয়োজন রয়েছে। সে কবিতা অর্থহীন আবোল-তাবোল হ'লেও ক্ষতি হয় না। আর যাতে মনের সামনে সুস্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠে, শিশু-সাহিত্যে তা অমূল্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কবিতাগুলির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। কোন তত্ত্বের গভীরতা এই কবিতাগুলিকে আচ্ছন্ন ক'রে এর রসধারাকে শুকিয়ে দেয় না; এই কবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য সরলতা। শিশুর দৃষ্টি একান্তভাবে তার নিজস্ব—স্বচ্ছ, উদার, দিগন্তপ্রসারী। প্রকৃতিকে সে নিজের আত্মীয় ব'লে মনে করে। শিশুর কাছে বিশ্বপ্রকৃতি শুধু সুন্দর নয়, সজীব। মূক জীবজগতেরও প্রতি তার মমতার অন্ত নেই।

"আমি আজ কানাই মাষ্টার
পোড়ো মোর বেণ্ডালছানাটি
আমি ওকে মারিনে মা বেত
মিছি মিছি বসি নিয়ে কাঠি।"

কিম্বা—

"বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কি যে।"

অথবা—

"আমাকে মা শিখিয়ে দিবি রামযাত্রার গান,
মাথায় বেঁধে দিবি চূড়ো হাতে ধনুক বাণ।"

ইত্যাদি কবিতার ভিতর শিশু-মনের কত বিচিত্র ভাবের ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন। এগুলি পড়তে শিশুদের উৎসাহের অন্ত থাকে না।

শিশু-সাহিত্য রচনার সময় একটা কথা মনে রাখা উচিত, শিশুরা অত্যন্ত কঠিন সমালোচক। বাংলার শিশু-সাহিত্য প্রাচীন না হ'লেও গত দশ বারো বছরের ভিতর এর অনেক পুষ্টি ও উন্নতি হয়েছে। হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার শিশু-সাহিত্য বিদেশের শিশু-সাহিত্যের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। তবে একটা কথা বলা দরকার—শিশু-সাহিত্যের ভাষার একটি নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ও ধারা থাকা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করা যাবে।

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। শিক্ষা বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে অনেক মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেকেই সুচিন্তিত প্রথার উদ্ভাবন করিয়াছেন, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার চিরন্তন সমস্যাগুলি সমস্যাই থাকিয়া গিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কোন সমাধান হয় নাই। সকলেই দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত, ইহার জন্য অনেকেই অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন; নূতন নূতন কলেজ ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, শিক্ষার্থীর বৃত্তিরও ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু এই উচ্চশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আজ পর্য্যন্ত কেহই কিছু করেন নাই বা করিবার আবশ্যকতাও বোধ করেন নাই। তাই প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা আজ এত শোচনীয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা প্রায় ৯০ জন শিক্ষক মাসিক মাত্র ২৲ সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকেন। ছাত্রদত্ত বেতন বলিয়া কোন কিছুর প্রবর্ত্তন আজ পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় দেখা যায় নাই বা দেখিবার সম্ভাবনাও নাই। আমাদের দেশ যতই গরিব হউক না কেন, আমাদের মাথা-পিছু মাসিক খরচ যতই কম হউক না কেন, এই দুই টাকায় ভরণপোষণ চলা অসম্ভব। তবু বাংলা দেশে নিষ্কর্ম্মা লোকের অভাব নাই, তাই যাঁহাদের আর

কোন গত্যন্তর নাই, তাঁহারাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা বা যোগ্যতার কথা নাই বলিলাম। অন্যত্র অধিক সুবিধা পাইলেই এই সকল শিক্ষক কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাই প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পরিবর্ত্তনরূপ প্রবল বন্যা সারা বৎসর সমান বেগে চলিতে থাকে। গ্রামের ভিতর যে দুই এক ঘর বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ থাকেন, তাঁহাদের অকাতর পরিশ্রম, সহানুভূতি এবং অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই গ্রাম্য পাঠশালাগুলির অস্তিত্ব আজও বজায় রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপে আর কতদিন চলিবে?

প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে চাই যোগ্য শিক্ষক। যোগ্য শিক্ষক পাইতে হইলে চাই উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, যেখানে যোগ্য ব্যক্তিগণ শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। তারপর চাই তাঁহাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা। ইহা না হইলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে না। যে সকল শিক্ষক এই কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন, তাঁহাদের সংসার যাহাতে চলিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা না করিলে কিরূপে চলিবে? প্রতিনিয়ত অভাব-অভিযোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেই যদি তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়, তবে শিক্ষাদানরূপ শ্রমসাধ্য এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে তাঁহারা কিরূপে সক্ষম হইবেন? ইহাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, এবং এই সমস্যার সমাধান না হইলে সুফল লাভের আশা সুদূরপরাহত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সামান্য সরকারী সাহায্য এবং স্থানীয় দুই চারিজন বিদ্যোৎসাহীর চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা চলিতেছে। এই সম্মিলিত সাহায্যে শিক্ষক মহাশয়গণের ভরণপোষণ কোনক্রমে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু বিদ্যালয়গুলির জন্য কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। তাই আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র দূরে থাকুক, অত্যাবশ্যক দুই একটি শিক্ষোপকরণও নাই। এরূপ ক্ষেত্রে এই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল হইতে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা ব্যতীত আরও প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। এ বিষয়ে ছেলেদের অভিভাবকদের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। দেশের সক্ষম, অর্থশালী ও হিতকামী ব্যক্তিগণ, যাঁহারা বহু প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থসাহায্য করেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই মেদিনীপুর জেলা শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, এখানে শিক্ষিতের সংখ্যা শত-করা প্রায় ২৷৷ জন। এই সংখ্যা বাড়াইবার জন্য এ জেলায় বিশেষ প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ও শিক্ষার উন্নতির জন্য চাই—একটি প্রাথমিক শিক্ষাভাণ্ডার। ধর্ম্মের দিক দিয়াই হউক, অথবা দেশ বা জনসেবার দিক দিয়াই হউক, এই ভাণ্ডারের পরিপুষ্টি সাধন করা সকলের অবশ্যকর্ত্তব্য হইবে। প্রত্যেক বড় বড় গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে, এবং সেই সকল বিদ্যালয় হইবে অবৈতনিক—অবশ্য যতদূর সম্ভব। দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে; কারণ, শিক্ষা বিষয়ে যে দেশ যতখানি উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে, জগতে সেই দেশ নিজেকে ততখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশে শিক্ষাবিস্তারের কার্য্যই দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ পূজা, এবং ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ করাই দেশভক্তের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ভেদাভেদ ভুলিয়া একে অকপটে অন্যকে আলোকের দেশে যাত্রার পথে সাহায্য করিবে। দেশে এমন অনেক শিক্ষিত লোক আছেন, ভগবানের কৃপায় যাঁহাদের কোন কার্য্য করিতে হয় না। তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা। যাঁহাদের অর্থ ও প্রাণ আছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে প্রাথমিক শিক্ষাভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করা। ইহাই হইবে দেশের উন্নতির প্রথম সোপান, এবং ইহারই উপর নির্ভর করিবে জাতির ভবিষ্যৎ আশা।

স্বাস্থ্যকর গৃহ

দীর্ঘায়ু হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে হইলে শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে বাসগৃহের ও পরিবারের অপর সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। শহর অঞ্চলে বাসগৃহ নির্ম্মাণ মিউনিসিপ্যালিটির আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু পল্লীগ্রামে সাধারণত লোকের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারেই বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়। সে গৃহ স্বাস্থ্যকর হইল কি না, সে বিষয়ে পল্লীবাসী চিন্তা করিয়া দেখে না। শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যরক্ষা—এই উভয় বিষয়েই পল্লীবাসী সমান উদাসীন।

স্বাস্থ্যকর গৃহ কাহাকে বলে? যে গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আছে, সূর্য্যকিরণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, যেখানে বিশুদ্ধ জল ব্যবহৃত হয়, যাহার মেঝে বা দেওয়াল ভিজা বা স্যাঁৎসেঁতে নয়, যেখানে জল নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে, মশা-মাছির উপদ্রব নাই, যাহার চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সেই গৃহকেই স্বাস্থ্যকর বলা যায়। এই আদর্শ অনুসারে আলোচনা করিলে আমরা সাধারণ পল্লীগৃহের অস্বাস্থ্যকরতার কথা সহজেই বুঝিতে পারি।

পল্লীগ্রামের অধিকাংশ গৃহের দেওয়াল মাটির, কোঠা-বাড়ির সংখ্যা খুবই কম। এই দেওয়াল যখন তোলা হয়, তখন প্রায়ই বাস্তুজমির কোন না কোন অংশ হইতে মাটি লওয়া হয়। এক হাত কি দেড় হাত চওড়া করিয়া স্তরে স্তরে মাটি জমাইয়া দেওয়াল তোলা হয়। অনেক সময় বাধ্য হইয়াই নীচু জমির উপরেও গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এইরূপ গৃহের মেঝে ও দেওয়াল প্রায় বারো মাসই সামান্য স্যাঁৎসেঁতে থাকে। উঁচু জমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করা হইলে মেঝে বা দেওয়াল ততটা ভিজা থাকিতে পারে না।

পল্লীগ্রামের বাসগৃহগুলির প্রধান দোষ এই যে, ঘরের দেওয়ালে জানালা রাখা হয় না। প্রায় প্রত্যেক ঘরে একটি মাত্র দ্বার রাখা হয়ন দ্বিতীয় দ্বার বা জানালা রাখার ব্যবস্থা প্রায়ই দেখা যায় না। অবশ্য কেহ কেহ আধ হাত বা ঐরূপ চওড়া এবং এক হাত লম্বা গবাক্ষ রাখার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এরূপ গৃহে আলো বাতাস সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, কাজেই গৃহগুলিও অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে।

পরিবারের লোকসংখ্যার অনুপাতে বাসগৃহে কক্ষের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণ থাকা উচিত। কিন্তু দরিদ্র গৃহস্থ স্বাস্থ্যরক্ষার এই অতি-প্রয়োজনীয় নিয়মটি মানিয়া চলিতে পারে না। একই ঘরে বাধ্য হইয়া বহুলোককে থাকিতে হয়, অথচ সেই ঘরে দরজা জানালা খুবই কম। এ ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যহানি ঘটা আশ্চর্য্য নয়।

যদি একই কক্ষে অনেক লোককে থাকিতে হয়, তাহা হইলে ঘরের আয়তন বড় করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। ঘরে যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিতে হইবে এবং দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় এই সকল দরজা জানালা খুলিয়া রাখিতে হইবে। মেঝে হইতে ছাদের উচ্চতা অন্তত দশ বারো ফিট হওয়া উচিত। অবশ্য পল্লীগৃহগুলির চালের শীর্ষদেশ উচ্চ থাকায় সুফল ফলিয়া থাকে।

এ কথা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক গৃহস্থই নিজের গৃহে ঝাঁট দেন, জঞ্জাল পরিষ্কার করেন; কিন্তু এই সকল আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল দূরে সরাইবার ব্যবস্থা করেন না। গৃহের বাহিরেই এই সকল আবর্জ্জনা দিনের পর দিন জমিতে থাকে। ইহার ফলে মশা-মাছির উপদ্রব বাড়িতে থাকে, এবং গৃহের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। অথচ এই সমস্ত আবর্জ্জনা গ্রামের বাহিরে নিজ নিজ কৃষিক্ষেত্রে রক্ষা করা হইলে উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যায়, এ কথা কেহ ভাবিয়াও দেখেন না। আর একটি কথা, শয়নকক্ষে আসবাবপত্র যত কম থাকে ততই ভাল। সঙ্কীর্ণ গৃহে আসবাবপত্র বেশি থাকিলে ঘরটিকে রীতিমত পরিষ্কার রাখা শক্ত হয়। মশা-মাছি, কীটপতঙ্গ সকল আসবাবের আশেপাশে লুকাইয়া থাকিবার যথেষ্ট সুবিধা পায়।

পল্লীগ্রামের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহসংলগ্ন কিছু জমি থাকে। ইচ্ছা করিলেই সেখানে ছোট বাগান করিয়া নিত্যব্যবহার্য্য শাকসব্জি উৎপাদন করা যায়,

ইহাতে সংসারের খরচ কমাইতে পারা যায় এবং উদ্বৃত্ত শাকসব্জি বিক্রয়ের দ্বারা অর্থাগমের সম্ভাবনাও থাকে। শাকসব্জি ছাড়া কিছু ফুলের অথবা ছোট ছোট ফলের গাছও লাগাইতে পারা যায়। কিন্তু গৃহসংলগ্ন জমিতে আম কাঁঠাল প্রভৃতি বড় গাছ লাগাইতে নাই, যে হেতু তাহারা আলো ও বায়ু চলাচলের গতিরোধ করিয়া থাকে।

পল্লীগ্রামের আর একটি কুপ্রথা প্রতিদিন দেশের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গৃহনির্ম্মাণের জন্য দেওয়াল তুলিবার সময় বাস্তুজমির একাংশ হইতে মাটি লওয়া হয়। এইরূপে প্রায় প্রতি গৃহের বাস্তুসংলগ্ন ভূমিতে এক একটি ছোট ডোবার সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ষাকালে এই ডোবায় জল জমে এবং যতদিন না সেই জল সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায়, ততদিন তাহার দ্বারা গৃহকর্ম্ম, এমন কি রন্ধন পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয়। পরিবারের রমণীরাও এই জলে স্নান বা গাত্র-মার্জ্জনা করিতে কুণ্ঠিত হন না। কোন কোন ডোবার জল এতই দুর্গন্ধযুক্ত হয় যে, উহার পাড়ের রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে নাকে কাপড় দিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই জল স্যাঁৎসেঁতে, এবং এই সকল ডোবা ম্যালেরিয়াবাহী মশকের জন্ম ও লীলাভূমি। এইরূপ ডোবা যে কত লোকের মৃত্যু ঘটাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম এইরূপ ডোবার সৃষ্টি বন্ধ করিতে হইবে এবং যে সকল ডোবা আছে, সেগুলি ভরাট করিয়া দিতে হইবে।

গৃহপালিত গো-মহিষাদির থাকিবার ঘর বাসগৃহ হইতে দূরে রাখাই উচিত। গোহালঘর প্রত্যহ পরিষ্কার করা ও ধুইয়া দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। গো-মহিষের মলমূত্র গোহালঘরে পচিলে গৃহ-স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

ভগবান বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে মানুষ। মানুষের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় জীবন সুখপূর্ণ হইতে পারে, জরা ও মৃত্যু পিছাইয়া যাইতে পারে। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিয়া স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস, উপযুক্ত খাদ্য, ব্যায়াম ও বিশ্রাম দীর্ঘজীবন লাভের সহজ উপায়।

সবুজ সার

উপযুক্ত আহার না পাইলে যেমন জীবজন্তু বাড়িতে পারে না, তেমনই মাটিতে খাদ্যের সংস্থান না থাকিলে গাছ-পালাও রীতিমত বাড়িতে পারে না এবং মরিয়া যায়।

বৎসরের পর বৎসর একই জমি হইতে শস্য উৎপাদনের ফলে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। এই সব জমির শস্য প্রতি বৎসর যে পরিমাণ খাদ্যাংশ জমি হইতে টানিয়া লইতেছে, সারের আকারে তাহার পূরণ হইতেছে না। কৃষকের একমাত্র সারের সংস্থান—গোবর। সেই গোবরও ঘুঁটে তৈয়ার করিয়া জ্বালানি-রূপে ব্যবহৃত হওয়ায় জমিতে সারের অকুলান হইতেছে। যে সব দেশী বা বিলাতী সার এ দেশে প্রচার লাভ করিয়াছে—যেমন, হাড়ের গুঁড়া, রেড়ির খৈল, সরিষার খৈল, এমোনিয়াম্ সাল্‌ফেট, নিসিফস, মিউরিয়েট অব পটাস ইত্যাদি—তাহাদের মূল্য বেশি হওয়ায় সাধারণ কৃষক সে সব ব্যবহার করিতে পারে না।

অল্প খরচে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বাড়াইতে হইলে সবুজ সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিম্বি-জাতীয় কোন গাছকে জমিতে লাগাইয়া উহা বড় হইলে লাঙ্গল দিয়া চষিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়াকে সবুজ সার প্রয়োগ বলে। সবুজ সার প্রয়োগের ফলে জমির সহিত প্রচুর উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ হয় এবং শিম্বি-জাতীয় যে উদ্ভিদ লাগানো হয়, তাহার শিকড়ে সঞ্চিত যবক্ষারজান মাটির সহিত মিশিয়া যায়। এই মিশ্রণে জমি হাল্কা হয়, রসসঞ্চার বৃদ্ধি পায়। বিঘা-প্রতি ২০।২৫ মণ গোবরসার প্রয়োগ করিলে যে উপকার পাওয়া যায়, একবার সবুজ সার দিলে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি উপকার পাওয়া যায়।

ধৈঞ্চা, বরবটী এবং শণ-পাট এই তিনটি শস্যই সবুজ সাররূপে সাধারণত লাগানো হইয়া থাকে। ধৈঞ্চা ও বরবটী নিকৃষ্ট জমিতেও ভাল জন্মে বলিয়া সবুজ সাররূপে

এই দুইটির বেশি ব্যবহার হয়। ধৈঞ্চা বরবটীর চেয়ে শীঘ্র বাড়িয়া থাকে, এবং তাহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের ভাগও বেশি থাকে। এই তিনটিকেই সবুজ সাররূপে সকল প্রকার ফসলের জন্য ব্যবহার করা যায়, কিন্তু ধানের জমিতে ধৈঞ্চা-সবুজসারে বেশি উপকার পাওয়া যায়।

যে রকম সবুজ সারই ব্যবহার করা হউক, উহার ডালপালা কচি থাকিতে থাকিতে গাছগুলিকে জমিতে চষিয়া দিলে ভাল হয়। ডালপালা বেশি শক্ত বা ছিবড়া-যুক্ত হইলে জমিতে পচিতে দেরি হয় এবং মাটির সহিত ভালরূপ মিশে না।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দুই তিনটি চাষ দিয়া ধৈঞ্চার বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। বীজ ভাল হইলে বিঘা-প্রতি ৩ সের লাগে। উহার মূল্য চার আনা হইতে ছয় আনা। ধৈঞ্চার বীজগুলি দেখিতে অনেকটা মুগের মত, তবে দানাগুলি কিছু বড়। ধৈঞ্চার বীজ কালো রঙের হইলে উহাতে গাছ ভাল হয় না। বীজগুলি ঈষৎ হলদে রঙের হইলে ভাল হয়। এই বীজ কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করিলে উহা শুকাইলে কুঁচকাইয়া যায়, তাহাতেও গাছ ভাল হয় না। ধৈঞ্চার বীজ প্রতি বৎসর তৈয়ার করিয়া লওয়া চলে। পতিত ভাঙা কিম্বা পুকুরের পাড়ের জমি চষিয়া দুই চারি মুঠা বীজ পাতলা করিয়া ছড়াইয়া দিলে যে সব গাছ হয়, তাহা হইতে প্রায় আধ মণ ধৈঞ্চার বীজ পাওয়া যায়। বীজ সংগ্রহের পর ঐ গাছগুলি শুকাইয়া লইলে জ্বালানি-কাঠরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ধৈঞ্চার বীজ জমিতে ছড়াইবার পর আর একটি চাষ ও মই দিয়া বীজগুলিকে ঢাকিয়া দিতে হয়। চারা গজাইতে চার পাঁচ দিন সময় লাগে। ধৈঞ্চার গাছগুলি এক হাত লম্বা হইতে প্রায় দেড় অথবা দুই মাস সময় লাগে। ঐ অবস্থায় গাছগুলিকে জমিতে চষিয়া দিতে হয়। কচি অবস্থায় সহজেই গাছ পচিয়া যায়, এবং তখন গাছের শিকড়ে অধিক পরিমাণে দানা ধরিয়া থাকে। গাছ যত বড় হয়, ততই শিকড়ের দানাগুলি ক্রমশ কমিতে থাকে।

ধৈঞ্চা-সবুজসার প্রয়োগ করিলে ধানগাছ শীঘ্র বাড়িয়া যায়, গাছে ভাল গোছ বাঁধে এবং দানাও বেশি হয়। মেদিনীপুর জেলায় কোন কোন অঞ্চলে রসুনিয়া নামক শ্যাওলায় ধানের যে ক্ষতি হয়, জমিতে সবুজ সার দিলে তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকার হইতে পারে। বেলে মাটিতে দুই এক বৎসর সবুজ সার দিলে উহা দোঁ-আশে পরিণত হয়। এইভাবে এঁটেল মাটিকেও দোঁ-আশে পরিণত করা যায়।

গিধনি-পল্লীমঙ্গল-সমিতির কার্য্যবিবরণী

বর্ত্তমান ১৯৩৮ সালের ১৫ই মে তারিখে গিধনি-পল্লী-মঙ্গল-সমিতি স্থাপিত হয়। সমিতির উদ্দেশ্য পল্লীর পথ-ঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার করা, বিশুদ্ধ স্থানীয় জল ও ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা, পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করা, তাহাদের সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া।

গত ৩০এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সমিতির সভ্যগণ দুইবার গিধনি-সাঁওতালপল্লীতে ও একবার খেঁড়েজোড়ার মাহাত-পল্লীতে গিয়া তথাকার অধিবাসীগণকে পরিচ্ছন্ন থাকিবার উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন; সামান্য অর্থসাহায্য এবং স্বেচ্ছাশ্রমের দ্বারা গিধনি-সাঁওতালপল্লীর একটি কূপের সংস্কার করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ৮০০ ফুট দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে, খেলার মাঠের উন্নতিসাধন করা হইয়াছে এবং মহিলাগণের ভ্রমণের জন্য একটি বাগান করা আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় দরিদ্র সাঁওতাল ও মাহাতগণের মধ্যে পীড়ার সংবাদ পাইলেই সমিতির কর্ম্মীগণ বিপন্ন ও পীড়িতের যথাসাধ্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এইভাবে সমিতির সভ্যগণ ৫৮টি রোগীর সেবা করিতে পারিয়াছেন।

৩০এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ২৩/১০ দান সংগ্রহ করা হইয়াছে ও তাহা হইতে ২০/৫ ব্যয় করা হইয়াছে।

সমিতি যে পল্লীগুলির সংস্কার-সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তথায় কৃষির উন্নতি, জল-সরবরাহের ব্যবস্থা, দাতব্য

চিকিৎসালয় স্থাপন ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য পল্লীপাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সকল সঙ্কল্প যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, সেজন্য সমিতি সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছে।

চাঁদ্মবিলা গ্রামের উদারহৃদয় ভূস্বামী শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ সংপতি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সংপতি, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সংপতি মহোদয়গণ এবং পরিহাটির পানি মহোদয়গণ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দান করিয়া সমিতিকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

পল্লীসেবকের পত্র

সম্পাদক মহাশয়,

শ্রীহীনা পল্লীর উন্নয়নের জন্য "পল্লী-শ্রী"র প্রতিষ্ঠা। সঙ্কল্প মহান, সিদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী, যদি শুধু পল্লীবাসীর আন্তরিক সহায়তা মিলে। কেন না, পল্লীর উন্নয়ন শহর-বাসীর দ্বারা ততখানি সম্ভবপর নহে, যতখানি পল্লীবাসীর একনিষ্ঠায় হইতে পারে।

পল্লীর আজ দুর্দ্দিন—সত্য বটে। কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে তো তাহার এ অবস্থা ছিল না। পল্লীজীবন আপন সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্যে উচ্ছ্বসিত ছিল। আড়ম্বর ছিল না বটে, কিন্তু তাহাতে একটা স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। সে দিনের সে পল্লীজীবন সব সময় সুস্থ না থাকিলেও 'স্বস্থ' ছিল,—লক্ষ্য ছিল অ-ঋণী ও অ-প্রবাসী হওয়া। সেদিন দেশের ভূমিলক্ষ্মীই ভাত কাপড় দান করিতেন। শিল্প-বাণিজ্য যাহা ছিল, তাহা যান্ত্রিক নহে—কুটীরশিল্প। তখন ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, তাঁতের কাপড়, গরুর দুধ অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাইত। যাত্রা-গানে, পাঁচালি ও কথকতায় আপামর সাধারণের শিক্ষা লাভ হইত। মামলা-মোকদ্দমা প্রায় ছিল না। ঝগড়া-বিবাদ উপস্থিত হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ উহার মীমাংসা করিতেন।

সেই দেশ আছে, সেই জোতজমি আছে, তবু পল্লীবাসীর আজ অন্নাভাব। পূর্ব্বে পল্লীর আপামর সাধারণের ভাত কাপড় জুটিত, আর আজ জুটে না কেন? জুটে না, মায়ের প্রতি ভক্তি নাই, মাটির প্রতি নিষ্ঠা নাই বলিয়া। 'মা'-টি ও মাটি যে একই বস্তু। সেই বস্তুটির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছি বলিয়াই হা-ঘরে হা-ভাতে হইতে হইয়াছে। প্রাচীন জীবন যাপন আর আমাদের ভাল লাগে না। এখন বৈষয়িক বিবাদ উপস্থিত হইলে জেলার সেরা আইনজীবীকে মুঠা মুঠা টাকা দিয়া প্রতিকার করাইয়া লইতে হয়। বিজলীদীপ্ত প্রাসাদোপম অট্টালিকায় না পড়িলে শিক্ষার মর্য্যাদা বাড়ে না। Plain living ও high thinking ভুলিয়া বসিয়াছি। নাগরিক সভ্যতার আক্রমণে পল্লী-শ্রী আজ আপনাকে হারাইতে বসিয়াছে।

পল্লীর এই দুর্দ্দিনে আপনারা সহযোগিতার মঙ্গল-প্রেরণা লইয়া আর্ত্ত পীড়িত দুর্ব্বল পল্লীবাসীর কল্যাণ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মর্ম্মাহতা পল্লীর মর্ম্মের তার আপনাদের বুকে বাজিয়াছে, তাই তাহার বিপুল বেদনা উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—মানবতার এই ঋকমন্ত্র আপনাদিগের শুভ প্রচেষ্টা সার্থক করিয়া তুলুক। পল্লীবাসীর আত্মচেতনা জাগাইতে, তাহাকে 'স্বস্থ' করিয়া তুলিতে আপনারা সমর্থ হউন। কুণ্ঠা ও কার্পণ্য ভুলিয়া, সকল ব্যবধান ভুলিয়া পল্লীবাসী পরস্পরের সাহায্যে আগুয়ান হউক।

পল্লীসেবকরূপে আপনাদের এই মহাযজ্ঞে আমার 'ক্ষুদ-কুঁড়া' অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম। সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি আপনাদের এই পবিত্র যজ্ঞ সফল করুন। ইতি

বিনীত
পল্লীসেবক

সাহিত্য-পঞ্জী

বৈশাখ

১ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম প্রকাশ (১২৭৯)
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১২৯৪)
চতুর্থ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ময়মনসিংহ (১৩১৮)
ত্রয়োদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, মেদিনীপুর (১৩২৯)

৬ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৪৫)
স্যর রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু (১২৭৩)
অমৃতলাল বসুর জন্ম (১২৬০)
দ্বাদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, হাওড়া (১৩২৬)
পঞ্চদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, রাধানগর (১৩৩১)

৮ নবম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, যশোহর (১৩২৩)

৯ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩২০)

১২ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মৃত্যু (১৩২৭)

১৫ দুর্গাদাস লাহিড়ীর জন্ম (১২৭০)

১৭ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠা (১৩০১)
রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩০২)

২২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (১২৫৫)
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৪৫)

২৫ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম (১২৬৮)

২৯ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১২৯২)

জ্যৈষ্ঠ

১ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩০১)

২ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৫৬)
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা (১২৮৫)

৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (১২২৪)
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু (১৩২০)

৬ প্রতাশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু (১৩১১)

৮ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর জন্ম (১২৪২)

৯ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩৩৭)

১০ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩১০)
প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ (১২২৫)

১১ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু (১৩০১)

১৫ অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু (১২৯৩)

২১ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের জন্ম (১২৬৭)

২২ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মৃত্যু (১৩০৬)
মহারাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যু (১৩২১)

২৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যু (১৩২৬)

২৪ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু (১২৭৪)

২৮ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যু (১২৬৮)

৩০ 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস' ইত্যাদির লেখক রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু (১৩০৭)
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যু (১৩১১)

আষাঢ়

১ প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ (১২৪৬)

২ চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু (১৩৩২)

৪ অক্ষয়কুমার বড়ালের মৃত্যু (১৩২৬)

৬ চন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু (১৩১৭)

৭ তারানাথ তর্কবাচস্পতির মৃত্যু (১২৯২)

৮ চতুর্দ্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, নৈহাটি (১৩৩০)

১১ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণেতা জগদানন্দ রায়ের মৃত্যু (১৩৪০)

১২ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১২৬৮)

১৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৪৫)
বরদাচরণ মিত্রের মৃত্যু (১৩২২)

১৪ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৫০)

১৫ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৮৬)

১৬ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু (১২৮০)

১৭ নরেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু (১৩১৮)

১৮ অমৃতলাল বসুর মৃত্যু (১৩৩৬)
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মৃত্যু (১৩৩৪)

১৯ স্বর্ণকুমারী দেবীর মৃত্যু (১৩৩৯)

২০ বিবেকানন্দের মৃত্যু (১৩০৯)

২৯ স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু (১৩০৬)

শ্রাবণ

১ অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম (১২২৭)
উমেশচন্দ্র বটব্যালের মৃত্যু (১৩০৫)

৪ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম (১২৭০)

৬ প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম (১২২১)

৮ বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার প্রতিষ্ঠা (১৩০০)

৯ কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু (১২৭৭)

১০ কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু (১২৯১)

১২ রজনীকান্ত সেনের জন্ম (১২৭২)
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু (১২৯৮)

১৩ কালীপ্রসন্ন ঘোষের মৃত্যু (১৩১৭)

১৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু (১২৯৮)

১৭ ভাগবতকুমার শাস্ত্রীর মৃত্যু (১৩৪৩)

২১ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩৩২)

২৯ রামতনু লাহিড়ীর মৃত্যু (১৩০৫)
হরিনাথ দের জন্ম (১২৮৪)

৩০ রমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম (১২৫৫)

ভাদ্র

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম (১২৯২)

২ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর জন্ম (১২৬৬)

৩ রামদাস সেনের মৃত্যু (১২৯৪)
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৩০৬)

৪ আনন্দমোহন বসুর মৃত্যু (১৩১৩)

৫ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম (১২৭১)

৮ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যু (১২৯৩)

১০ নাগপুর হাইকোর্টের অস্থায়ী জুডিশিয়াল কমিশনার, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসুর মৃত্যু (১৩৪০)

১৪ হরিনাথ দের মৃত্যু (১৩১৮)

১৬ উমেশচন্দ্র বটব্যালের জন্ম (১২৫৯)

১৭ চন্দ্রনাথ বসুর জন্ম (১২৫১)

১৯ সারদাচরণ মিত্রের মৃত্যু (১৩২৪)

২২ রাজনারায়ণ বসুর জন্ম (১২৩২)

২৩ 'কর্ম্মযোগের টীকা' ইত্যাদির লেখক, বিখ্যাত খেয়াল গায়ক রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মৃত্যু (১৩৩৮)

২৮ রজনীকান্ত সেনের মৃত্যু (১৩১৭)
রাখালদাস ন্যায়রত্নের মৃত্যু (১২৩৬)

২৯ রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু (১২৫৬)

৩১ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৮৩)
রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু (১৩০৭)

আশ্বিন

৬ কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের মৃত্যু (১৩১২)
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১২৯৮)

১১ রামমোহন রায়ের মৃত্যু (১২৩৩)

১২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম (১২২৭)

১৩ শিবনাথ শাস্ত্রীর মৃত্যু (১৩২৬)

১৫ প্যারীচরণ সরকারের মৃত্যু (১২৮২)

১৬ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মৃত্যু (১৩২৪)

১৭ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের মৃত্যু (১২৯২)

১৮ স্যর তারকনাথ পালিতের মৃত্যু (১৩১১)
দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর মৃত্যু (১৩২৭)

২৪ রামগতি ন্যায়রত্নের মৃত্যু (১৩০১)

২৭ কবি কামিনী রায়ের জন্ম (১২৭১)

কার্ত্তিক

২ দাশরথি রায়ের মৃত্যু (১২৯১)

১২ লালবিহারী দের মৃত্যু (১৩০১)

১৬ দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু (১২৮০)
মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্ম (১২৩৯)

১৭ প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, কাশিমবাজার (১৩১৪)

১৮ মহেন্দ্রলাল সরকারের মৃত্যু (১২৪০)

১৯ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৭৫)

২১ অশ্বিনীকুমার দত্তের মৃত্যু (১৩৩০)
২৫ মনীন্দ্রনাথ নন্দীর মৃত্যু (১৩৩৬)

অগ্রহায়ণ

১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মৃত্যু (১৩৩৮)
৩ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম (১২৪৪)
৭ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যু (১৩৪৪)
১৩ রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু (১৩১৬)
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩৩৬)
১৮ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩২৫)
১৯ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর মৃত্যু (১২৯৩)
২১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে গৃহপ্রবেশ (১৩১৫)
প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু (১২৮৭)
২২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম (১২৬০)

পৌষ

৪ সারদাচরণ মিত্রের জন্ম (১২৫৪)
৯ দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, বাঁকিপুর (১৩২৩)
১০ স্যর রাসবিহারী ঘোষের জন্ম (১২৫২)
১৭ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যু (১৩২৭)
২১ নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু (১৩৩২)
রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মৃত্যু (১৩২৩)
২৩ কবি বলদেব পালিতের মৃত্যু (১৩০৬)
২৪ মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যু (১৩১৪)
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৩২৯)
২৫ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু (১২৯০)
২৬ শিশিরকুমার ঘোষের মৃত্যু (১৩১৭)
২৭ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম (১২৬৯)
২৯ 'সন্ধ্যাবশতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু (১৩১৩)

মাঘ

২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩৪৪)
হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মৃত্যু (১৩৪৪)
৩ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা (১২৯১)
৪ গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্ম (১২৬১)
৬ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৩১১)
বিখ্যাত চিকিৎসক স্যর কৈলাসচন্দ্র বসুর মৃত্যু (১৩৩৬)
৭ 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' প্রণেতা, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের মৃত্যু (১২৯২)
জষ্টিস স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের মৃত্যু (১৩২৪)
১০ নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যু (১৩১৫)
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু (১২৬৫)
১২ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম (১২৩০)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১২৬৩)
১৬ কলিকাতায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ (১১৮৬)
১৮ দ্বিতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, রাজশাহী (১৩১৫)
১৯ উনবিংশতি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ভবানীপুর (১৩৩৬)
২১ মতিলাল রায়ের জন্ম (১২৪৯)
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩১৮)
২২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৭৯)
২৫ নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু (১৩১৮)
নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম (১২৪৩)
২৭ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মৃত্যু (১৩৩৬)
২৮ প্যারীচরণ সরকারের জন্ম (১২৩০)
২৯ একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, কৃষ্ণনগর (১৩৪৪)
নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যু (১৩১৫)
৩০ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম (১২৮৮)

ফাল্গুন

১ তৃতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ভাগলপুর (১৩১৬)
৩ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৩১)
৫ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম (১২২৮)
৬ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম (১২৪২)
৯ বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, চন্দননগর (১৩৪৩)
১১ নরেন্দ্রনাথ সেনের জন্ম (১২৪৯)
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মৃত্যু (১৩১০)
১৪ দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু (১২৮০)
১৫ নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম (১২৫০)
স্যর রাজবিহারী ঘোষের মৃত্যু (১৩২৭)
১৯ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের জন্ম (১২৬৫)

পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, চুঁচুড়া (১৩১৮)
২০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৩৩১)
২৫ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম (১২১৮)
২৭ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু (১২৬৪)
২৮ রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু (১৩০০)

চৈত্র

১ রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের জন্ম (১২৯০)
৯ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩১৭)
ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, চট্টগ্রাম (১৩১৯)
১২ লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের জন্ম (১২৬৯)
১৬ অষ্টাদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, মাজু (১৩৩৫)
২০ অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, বর্দ্ধমান (১৩২১)
সপ্তদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, সিউড়ি (১৩৩২)
২১ রামনিধি গুপ্ত-(নিধুবাবু)-র মৃত্যু (১২৪৫)
২২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩৩৮)
২৩ প্রথম মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন প্রবর্ত্তন (১২২৯)
২৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩০০)
২৭ সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, কলিকাতা (১৩২০)
ষোড়শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, মুন্সীগঞ্জ (১৩৩৫)
৩০ একাদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ঢাকা (১৩২৪)

যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশ

যক্ষ্মারোগ সংক্রামক, তবে হাম বসন্ত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মত তত ভীষণ সংক্রামক নয়। হাম বা বসন্ত রোগের বীজাণু শরীরে গেলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (যেমন পাঁচ, সাত কি দশ দিনের মধ্যে) রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু যক্ষ্মার বীজাণু দেহের ভিতর বহুকাল লুকিয়ে থাকে। তাই যক্ষ্মারোগ বড় ভয়াবহ।

ফুসফুসে ক্ষয়রোগ দেখা দিলে রোগের বীজ সহজেই কফের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। পেটের ভিতর যখন এই রোগ দেখা দেয়, তখন কঠিন পেটের অসুখ হয়ে প'ড়ে গ্রহণীরোগ দাঁড়িয়ে যায়।

রোগের কারণ

(১) যক্ষ্মারোগী যখন চলাফেরা ক'রে বেড়ায় ও অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করে, তখন তার কাসির সময় থুথুর সঙ্গে আশেপাশে বীজ ছড়িয়ে পড়ে ; কাছে যে থাকে তার নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে এই বীজ চ'লে যায়।

(২) যেখানে-সেখানে থুথু ফেলার বদ অভ্যাসের ফলে ধূলার সঙ্গে রোগের বীজ মিশে যায়। সেই বীজ বাতাসে উড়ে নিশ্বাসের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে।

(৩) রোগীর হুঁকায় তামাক খেলে বা রোগীর ব্যবহার করা বাটি, গেলাস, থালা ব্যবহার করলে, অথবা রোগীর এঁটো খেলে এই রোগের বীজ শরীরে চ'লে যায়।

(৪) অনেকের অভ্যাস পুকুরের জলে মুখ ধোবার সময় কফ ফেলা, তাতে জলের সঙ্গে রোগের বীজ পেটে যায়।

(৫) রোগীর কফে মাছি বসে। সেই মাছি উড়ে খাবারে বসলে খাবারের সঙ্গে রোগের বীজ মিশে যায়। সেই খাবার খেলে রোগের আক্রমণ দেখা দেয়।

(৬) গরুর এই রোগ থাকলে তার দুধেও এর বীজ থাকে। দুধ গরম না ক'রে খেলে দেহে রোগের বীজ ঢুকতে পারে। সুখের বিষয়, এদেশের গরুতে এ রোগ তেমন দেখা যায় না।

(৭) শরীরপালনের নিয়ম না মেনে চলার ফলেও যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হয়ে থাকে। যেমন—

ক। কাজ করলে শরীর ক্ষয় হয়। আমরা যা খাই তাতে যদি শরীরের ক্ষয় নিবারণ করা সম্ভব হয়, তা হ'লে শরীর সুস্থ থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে অনেকে অনুপযুক্ত ও অপ্রচুর খেয়ে জীবনধারণ করে। তারাই বেশি যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হয়।

খ। কলে, কারখানায়, বদ্ধ ঘরে অনেকক্ষণ খেটে ভাল খাবার না খেয়ে মদ খেলে বা শরীরের উপর অত্যাচার করলে শরীর দুর্ব্বল হয়। সে শরীরে যক্ষ্মার বীজ সহজেই ঢুকে পড়ে।

গ। অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরে বাস করলে, এক ঘরে অনেক লোক শুয়ে থাকলেও এই রোগ হতে পারে।

ব্যবস্থা

(১) রোগীকে আলাদা ঘরে রাখা। রোগীর থুথু ফেলার জন্য একটা জায়গা রাখতে হয়। সেই জায়গাতে মাছি বসতে দিতে নেই। কাগজে কফ ধ'রে পুড়িয়ে দিতে হয়। রোগীর বাসন, গ্লাস সমস্তই আলাদা রাখতে হয়।

(২) রোগীকে সূর্য্যের আলো আর খোলা হাওয়ায় রাখতে হয়। যে ঘর শুকনো খটখটে, যাতে আলো বাতাস খেলে, সেই ঘরে রোগীকে রাখা উচিত।

(৩) দেহের অতিরিক্ত ক্ষয় পূরণ করার জন্য সহমত খাদ্য—যেমন টাটকা মাছ, মাংস, ডিম, ছানা খাওয়াতে হয়। তাজা তরিতরকারি, কমলালেবুর রস রোগীর বিশেষ উপকার করে।

যক্ষ্মার লক্ষণ

এ রোগের বীজ যাতে ছড়াতে না পারে, আর রোগ হ'লেই যাতে রোগীকে উপরের ব্যবস্থার ভিতর আনা যায়, সেজন্য রোগের প্রথম লক্ষণগুলি সকলের জানা দরকার। এই রোগের প্রথম অবস্থায় সন্ধ্যায় অল্প জর দেখা দেয়, দৈহ ক্রমেই রোগা হয়ে যায় ও দেহের ওজন কমে। অনেক দিন ধ'রে খুকখুকে কাসি দেখা যায়, অল্প পরিশ্রমে শরীরে ক্লান্তি আসে। পরে কফের সঙ্গে রক্ত মিশানো থাকে। রাত্রে ঘাম হয়, বুকের পাশে ব্যথা থাকে, গলায় গণ্ডমালাও হয়।

এ সমস্ত লক্ষণ দেখা গেলে রোগীকে ডাক্তার দেখানো উচিত। এই অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে রোগী বাঁচে, সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থ ও পাড়াপড়শীরও জীবন রক্ষা পায়। যক্ষ্মাকে গোড়া থেকে উপেক্ষা করলে তার পরিণাম ভীষণ হয়ে ওঠে।

প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা

প্রাপ্তবয়স্ক অজ্ঞ পল্লীবাসীর মধ্যে শিক্ষা-বিতরণের উদ্দেশ্যে গত ১৯৩৭ সালের শেষভাগে তমলুক মহকুমার অন্তর্গত নর, চাকনান, বরোজ ও কদমতলা গ্রামগুলিতে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই চারিটি কেন্দ্রের কার্য্য দেখিয়া নর-গ্রামে নৈশবিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা স্থানীয় পল্লী-সংস্কার-সমিতির অন্তরে জাগিয়া উঠে। সেই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া গত ২৪এ জানুয়ারি নৈশবিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। স্থানীয় ডাকঘর, রেজেষ্ট্রি অফিস ও ডাঃ বরেন্দ্রনাথ চন্দ্রের বারান্দায় ছাত্রগণের বসিবার ব্যবস্থা করা হয়, এবং শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মাইতি ও শ্রীনিবাসচন্দ্র জানা তাহাদিগকে পড়াইবার ভার গ্রহণ করেন। এই শিক্ষকগণের ভরণপোষণের জন্য গ্রামবাসীর নিকট হইতে মাসিক ৩০ সের চাউল সাহায্য পাওয়া যায়। রাধাগঞ্জ বাজারের বাঙালী অবাঙালী ব্যবসায়ীগণ লণ্ঠন, কেরোসিন তৈল, বই, স্লেট, মাদুর, ব্ল্যাক-বোর্ড, পেন্সিল প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করেন। এইভাবে বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতে থাকে এবং ছাত্র-সংখ্যা ৩৮টিতে পরিণত হয়। ছাত্রদের বয়স ২০ হইতে ৪৮, এবং ইহারা হিন্দু ও মুসলমান—উভয় শ্রেণীর।

এই শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নতির জন্য একটি স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা বুঝিয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হয়। মাননীয় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ৫০৲ অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ইহাতে ছাত্রগণ বিশেষ উৎসাহিত হইয়া নিজেরাই গৃহনির্ম্মাণে উদ্যোগী হয়। প্রতিদিন পাঁচ ছয়টি ছাত্র এইভাবে কার্য্য করিয়া বিদ্যালয়ের গৃহটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদিগকে 'আলু-ভাতে ভাত' রাঁধিয়া খাইতে দেওয়া হইত, তবে যাহারা নিতান্ত নিঃস্ব, তাহাদিগকে সামান্য অর্থসাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ঘরের চাল ছাওয়াইবার জন্য চার পাঁচ কাহন বিচালি সংগ্রহ করা হয় এবং তাল, নিম প্রভৃতি বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া কবাট, চৌকাট, জানালা প্রস্তুত করা হয়।

এই বিদ্যালয়ে ছয় দিন শিক্ষা দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয় ব

পড়িয়া শোনানো হয়। কেবল প্রাথমিক শিক্ষাদান-পদ্ধতির অনুসরণ না করিয়া যে শিক্ষায় ছাত্রদের জীবনধারণের পক্ষে সাহায্য হইবে, তাহারই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়টির সাহায্যে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ৫০৲, তমলুক সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ১৫৲ ও স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড ১০৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মাইতি, ডাঃ বরেন্দ্রনাথ চন্দ্র প্রমুখ স্থানীয় অধিবাসীগণের সাহায্যে বিদ্যালয়ের কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতেছে।

শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার পুস্তক-সংখ্যা ৫১। সকল পুস্তকই ভিক্ষালব্ধ। এই পাঠাগারটির নামকরণ হইয়াছে—ইউমিয়ন লাইব্রেরি। ইহা তিন নম্বর ইউনিয়নের অধিবাসীর সেবায় নিয়োজিত থাকিবে।

জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
নরঘাট পল্লী-সংস্কার-সমিতি।

খেলাধূলা

ফুটবল

গত ১৫ই নভেম্বর মেদিনীপুরে 'ক্যামেরা কাপ' প্রতিযোগিতার শেষ খেলা হয়ে গেল। এই খেলায় স্থানীয় কলেজের দল খড়গপুরের Ex-student-দলের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শেষোক্ত দলটিই চারগোলে বিজয়ী হয়েছিল। কলেজ-দলের এই বিপর্য্যয়ের কারণ—অসুস্থতার জন্য তাদের কয়েকজন নিয়মিত খেলোয়াড় খেলায় যোগ দিতে পারে নি। খড়গপুরের দল সেদিন সর্ব্বাংশে ভাল খেলেছিল।

সেদিনকার খেলায় বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ এচ. পি. ভি. টার্ডনেও, সি. আই. ই., আই. সি. এস. সাহেব উপস্থিত ছিলেন এবং খেলার শেষে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্নী—মাননীয়া মিসেস সেন স্বহস্তে বিজয়ী ও বিজিত দলকে কাপ, মেডেল ইত্যাদি বিতরণ ক'রে সকলের উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করেছিলেন।

মেদিনীপুরে ফুটবল খেলার মরশুম এবারের মত শেষ হয়ে গেল। গত সংখ্যায় আমরা খেলা ও দর্শকের সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেছি, আগামী বারে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন না হ'লেই সুখী হব। খেলায় হার-জিত বড় কথা নয়, ভাল খেলাই দরকার।

বয়স্কাউটদের সম্মিলন

গত ৩রা নভেম্বর মেদিনীপুর শহরে তমলুক, ঝাড়গ্রাম এবং সদর (উত্তর ও দক্ষিণ) মহকুমার বয়স্কাউট-দলের আগমন হয়েছিল। স্কাউটদের শিবিরের জন্য স্থানীয় কলিজিয়েট স্কুলটি নির্দ্দিষ্ট করা হয়। অপরাহ্ণে স্কাউটদল একত্রে 'মার্চ' করা অভ্যাস করে। সন্ধ্যায় কলিজিয়েট স্কুলের ছাত্রদল স্কাউটদের অভ্যর্থনার জন্য গান, আবৃত্তি ও অভিনয়ের আয়োজন করেছিল। রাত্রে স্কাউটদের 'ক্যাম্প ফায়ার' হয়। সস্ত্রীক ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. এই 'ক্যাম্প ফায়ার' দেখতে এসেছিলেন। প্রজ্বলিত অগ্নিকে ঘিরে স্কাউটদের গান, আবৃত্তি, কৌতুকাভিনয় সকলেরই উপভোগ্য হয়েছিল।

পরদিন প্রাতে ১১টার সময় স্কাউটদল সৈন্যদলের প্যারেড-গ্রাউণ্ডে সমবেত হয়। প্রেসিডেন্সি ও আসাম বিভাগের সৈন্যদলের অধিনায়ক (General Officer Commanding, Presidency and Assam District) মেজর-জেনারেল জি. এম. লিওসে স্কাউটদল পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের উৎসাহ দিয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের স্কাউট-সঙ্ঘের উল্লেখ ক'রে বলেন যে, সেখানকার স্কাউটদল যেভাবে জনসেবাকে নিজেদের ব্রত ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, মেদিনীপুর জেলার স্কাউটদলেরও সেইরকম সেবাব্রত স্বীকার করা উচিত। স্কাউট হবার সময় তারা যে শপথ গ্রহণ করেছিল, তাকে পালন ক'রে তাদের 'স্কাউট' নাম 'নেওয়া' সার্থক হোক—এই কথাই জেনারেল সাহেব বলেছিলেন। স্কাউট ও কাবেরা জেনারেল সাহেবের সামনে দিয়ে মার্চ ক'রে গিয়েছিল ও নানা রকম খেলা দেখিয়েছিল।

হস্ত-নির্ম্মিত কাগজের শিল্প

এক সময়ে বাঙলাদেশে হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ-শিল্পের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে এই কাগজ-শিল্পীর সংখ্যা সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় এক লক্ষ ছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। তাহারা বাংলা-দেশের ও পার্শ্ববর্ত্তী বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের কাগজ সরবরাহ করিত। মিলে তৈয়ারী সস্তা কাগজের প্রচলন হওয়ায় হাতে তৈয়ারী কাগজ-শিল্পের প্রায় ধ্বংস ঘটিয়াছে এবং সহস্র সহস্র কাগজ-শিল্পী পরিবারের ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে। তথাপি এখনও কোন কোন স্থানে কাগজ তৈয়ারী করিবার লোক আছে; তাহাদের সংখ্যা শতকের বেশী হইবে না। তাহারা এখনও অবসর সময়ে অল্প অল্প কাগজ তৈয়ারী করে। নিম্নলিখিত স্থানে প্রধানতঃ কাগজ তৈয়ারী হয়:—

হুগলী জেলার কলমা, ঢাকা সাহবাজার, দাসঘরা, নীলাপাণ্ডুয়া, মৈরম, আমতা, সাহবাজার, গঙ্গাসাগর, যতিপাড়া এবং দিউলপুর।

হাওড়া জেলার মৈনান।

ঢাকা জেলার আড়িয়ল এবং মুন্সীগঞ্জ ও পাবনা জেলার কেন্দাপাড়া।

মুর্শিদাবাদ জেলার তুলিয়ানগঞ্জ।

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া কাগজীপাড়া।

অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকিলেও সব স্থানেই কাগজ-প্রস্তুতপ্রণালী প্রায় এক প্রকার। সাধারণতঃ শতকরা ১ কিম্বা ২ ভাগ কষ্টিক সোডা জলে গুলিয়া ছেঁড়া কাগজের সঙ্গে দেওয়া হয় এবং পাট কিম্বা শণ অথবা ছেঁড়া কাপড় পাতলাভাবে জল মিশান কলিচুণের ভিতর ডুবাইয়া দেওয়া হয়। তারপর কাগজের টুকরাগুলিকে দুইয়া পা দিয়া ঘষিয়া মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। পাট বা অন্য জিনিষ ঢেঁকিতে কুটা হয় কিম্বা পাথরের উপর রাখিয়া হাতুড়ি দ্বারা পিষ্ট করা হয়। তারপর সেগুলিকে উত্তমরূপে দুইয়া সাদা করা হয় এবং উভয় জিনিষকে একত্রে ফিটকিরি ও রজনসাবান মিশ্রিত জলের সহিত মিশাইতে হয়। বাঁশের চালুনী দ্বারা জল হইতে মণ্ডগুলিকে পাত্র হইতে উঠান হয় ও শুকান হয়। অতঃপর আরারুট অথবা ভাতের মণ্ডসহ মিশাইয়া আঠালো পদার্থে পরিণত করা হয় এবং সর্ব্বশেষে মসৃণ পাথরের দ্বারা পালিস করা হয়। অবসর সময়ে কাগজ-শিল্পী পরিবারের মেয়েরাই এই শেষোক্ত কাজ সাধারণতঃ করিয়া থাকে। উল্লিখিতরূপে যে কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহার রং ময়লা বাদামী মত হয়। বিশেষভাবে বলিয়া দিলে পাতলা রংএর কাগজও তাহারা প্রস্তুত করিতে পারে। মণ্ডের সহিত হরিতাল মিশাইয়া হলুদ রংএর কাগজ তৈয়ারী হয় এবং তুঁৎ মিশাইলেই নীল রংএর কাগজ হয়। এই রঙ্গীন কাগজ উই বা পোকার দ্বারা বিনষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে এই দেশী তৈয়ারী কাগজ বৎসরে মাত্র কয়েক হাজার টাকার বিক্রী হয়। এই দেশীয় কাগজ কলিকাতার বড়বাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, সিরাজগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের মহাজনেরা খরিদ করিয়া থাকে। ইহা অনেকদিন টেঁকসই হয় বলিয়া তাহারা ইহা দ্বারা তাহাদের হিসাবের খাতা প্রস্তুত করে। বিশেষ করিয়া বিবাহ ও ধর্ম্মোৎসবের নিমন্ত্রণপত্র লেখার জন্যই এই কাগজের বিশেষ চাহিদা। মূল্যবান দলিল-পত্র, বইর মলাট ও ঘুড়ি ইত্যাদির জন্যও ঐ কাগজ ব্যবহৃত হয়।

যেখানে মিলে তৈয়ারী ফুলস্ক্যাপ কাগজের দিস্তার দাম ৵১০ দশ পয়সা, প্রায় ঐরূপ হাতে তৈয়ারী কাগজের দিস্তার দাম ।/০ পাঁচ আনা। হাতে তৈয়ারী কাগজ বিদেশ হইতে বিশেষ করিয়া গ্রেট বৃটেন ও ইটালী হইতে প্রতি বৎসর ভারতে কয়েক লক্ষ টাকার আমদানী হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালীও খুব ভাল এবং ইহা বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন নক্সার কাজ, স্থায়ী আইনানুমোদিত দলিলাদি ও ব্যাঙ্কের কাগজপত্র ইত্যাদি। ইহার দামও যে খুব বেশী, নিম্নোল্লিখিত সংখ্যা হইতে তাহা বুঝা যাইবে:—

হাতে তৈয়ারী আমদানী কাগজ—

	রিমের দাম টাকা
নক্সার জন্য—	
এস্পারার ৭২″ × ৪৮″	১,০৯৪।/০
রে লিথ, ডবল, হাতী ৭০ পাউণ্ড ...	৫৬॥৵০
লিথিবার জন্য—	
ইম্পিরিয়াল ৭২ পাউণ্ড ৩০″ × ২২″ ...	৯১।০
নোটস্, স্মল পোষ্ট, ৮ পাঃ ৯″ × ৭″ ফ্লাই	১২॥০

ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, এদেশে হাতে তৈয়ারী সাধারণ ও ভাল কাগজের খুব চাহিদা আছে। দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা গণশিক্ষা বিস্তার এবং সাধারণ লোকের ব্যবসা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় তৈয়ারী কাগজের চাহিদা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। আমেরিকার একজন পণ্ডিত মিঃ ডি. হাণ্টার ভারতবর্ষে ও সুদূর প্রাচ্যে হাতে প্রস্তুত পুরাতন কাগজ-শিল্পের প্রস্তুত-প্রণালী ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন। যদি এই শিল্পের যথাযথ উন্নতির চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া তিনি ধারণা পোষণ করেন। নিম্নে নিজের কথায় তাঁহার অভিমত প্রকাশ করা গেল—

"হাতে তৈয়ারী কাগজের ন্যায্য চাহিদা সর্ব্বদাই থাকিবে এবং ইহা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহৃত হইবে। কলে এইরূপ কাগজ প্রস্তুতের যত চেষ্টাই করুক না কেন, তাহাতে এই শিল্পের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। বিলাতে হস্তে কাগজ তৈয়ারী করা একটা বড় শিল্প। বর্ত্তমানে ৫৫ পঞ্চান্ন জায়গায় এইরূপভাবে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে হাতে তৈয়ারী কাগজে সুন্দর সুন্দর বই ছাপান হয় এবং উচ্চাঙ্গের চিত্রাঙ্কন, মুদ্রন, কাষ্ঠফলক হইতে গৃহীত চিত্রের কাজ, কাগজ কলম, পুস্তকাদি ও বিজ্ঞাপনের ঘোষণাবলী এই কাগজেই হইয়া থাকে। বিলাতে ও ইউরোপে এই শিল্পের যথেষ্ট চর্চ্চা ও উন্নতি হইয়াছে এবং সেখানে এই কাগজের চাহিদাও খুব আছে। এই কাগজ কেবল উল্লিখিত কাজেই ব্যবহার হয় না, ইহা ব্যবহারজীবিগণের উইল ও সর্ব্বপ্রকারের দলিলাদি লিখিবার জন্য এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যাঙ্ক নোট, হিসাবের খাতা ও দলিলাদির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।"

"অনেক কাজের জন্য মেসিনে প্রস্তুত কাগজের চেয়ে হাতে তৈয়ারী কাগজ অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। হাতে তৈয়ারী কাগজের জন্য যেরূপ মণ্ড প্রস্তুত হয়, ঐরূপ মণ্ড মেসিনে ব্যবহার করিয়াও অনুরূপ কাগজ তৈয়ারী হয় না। হাতে তৈয়ারী কাগজের বুনট ও মসৃণতা যেরূপ মেসিনে প্রস্তুত কাগজে সেরূপ হয় না। হাতে তৈয়ারী কাগজের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার জলছবি যেরূপ সুন্দর হয় মেসিনের কাগজে তেমন হয় না।" মিঃ হাণ্টার এই শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিবার ও এই বিষয়ে লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহকে অনুরোধ করিয়াছেন।

এই চিত্তাকর্ষক ও লাভজনক গৃহ-শিল্পটি নিম্নলিখিত কারণে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। প্রথমতঃ কাগজ-শিল্পীরা তাহাদের সেই অতি পুরাতন ব্যয়বহুল প্রস্তুত-প্রণালী পরিত্যাগ করিতে নারাজ। দ্বিতীয়তঃ তাহারা যে কাঁচা মাল ব্যবহার করে, তাহার দাম বেশী এবং সেই জন্যই প্রস্তুত কাগজেরও দাম অধিক। তৃতীয়তঃ এইসব কাগজের বিশিষ্ট মান নির্ণয় উপযুক্ত মতে হয় না।

সম্প্রতি গ্রাম অঞ্চলের লোকের অবসর সময়ের ব্যবসা-স্বরূপ এই শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করা হইয়াছে। নিখিল ভারত গ্রাম্য শিল্প-সমিতির আসানসোলের নিকটবর্ত্তী উষাগ্রাম উপনিবেশ, বাঙলার খাদি প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাজের কারুশিল্প ও শিল্পকলা স্কুল, দেরাদুনের বনগবেষণা প্রতিষ্ঠান কাগজ-শিল্প বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহা ব্যতীত আরও অপরাপর প্রতিষ্ঠান এই সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এই সমস্ত চেষ্টার ফলে এই ব্যাপারে কাজ কতক পরিমাণে সুব্যবস্থিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। খাদি প্রতিষ্ঠানে বাঁশের মণ্ড ব্যবহার করা আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতে এই শিল্পের অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে বাঙলার গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগ বিশেষ যত্নের সহিত এই ব্যাপারে তদন্ত করিয়াছে। তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, এই শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে হইলে কম দামের জিনিষ দ্বারা আরোও সহজ উপায়ে অধিকতর ফলপ্রদ প্রণালীতে কম পরিশ্রমে কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ধরণে চেষ্টা করিয়া

শিল্প-বিভাগ কম খরচে ও সহজ উপায়ে কাগজ প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। কাগজের মণ্ড তৈয়ার করিবার জন্য পল্লী অঞ্চলে যে সমস্ত জিনিষকে প্রায় মূল্যহীন মনে করা হইত এবং যাহা পল্লীতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, যেমন পাটখড়ি, খড় ও কোন কোন গাছের পাতা, ব্যবহার করা হইয়াছে। যে সমস্ত অধিক দামের রাসায়নিক দ্রব্য ছাড়া কাগজ তৈয়ার হইতে পারে না বলিয়া লোকের মনে ধারণা ছিল, ঐ সব দামী রাসায়নিকের পরিবর্ত্তে অনেক পরিমাণে গ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যায় এই প্রকারের জিনিষের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই রূপে বাহিরের জিনিষ ব্যবহার না করিয়াও স্বাধীনভাবে দেশে এই শিল্পের কাজ সম্ভবপর হইয়াছে।

ইদানীং শিল্প-বিভাগ হইতে পরীক্ষা করা হইয়াছে, যে কচুরীপানা দেশের ভয়ানক ক্ষতি করিতেছে, ঐ কচুরীপানা দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে কি না? ফলে দেখা গিয়াছে—এই অনিষ্টকর দ্রব্য হইতেও এক প্রকারের কাগজ তৈয়ারী হইতে পারে। এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা করা হইতেছে। যদি এই চেষ্টা ফলবতী হয়, তাহা হইলে কচুরীপানা ধ্বংস ও তাহার দ্বারা মূল্যবান কাগজ তৈয়ারী এই দুইটি উদ্দেশ্যই সমভাবে সাধিত হইবে। বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেলে, যে সমুদয় স্থানে প্রচুর পরিমাণে কচুরীপানা আছে, ঐ সমুদয় স্থানে কেন্দ্র করিয়া শিল্প-বিভাগ হইতে কাগজ-প্রস্তুতকারী দল প্রেরণ করা যাইতে এবং এক জায়গার কচুরীপানা শেষ হইয়া গেলে ঐ দল অন্য যেখানে কচুরীপানা আছে, সেখানে যাইতে পারে। এই সমস্ত কাগজ-প্রস্তুতকারী দল কেবল কচুরীপানার উপরই নির্ভর করিবে না, কাগজ তৈয়ারীর জন্য অন্যান্য জিনিষ—যেমন পাটখড়ি, খড় ও অন্যান্য জিনিষও ব্যবহার করিবে।

—বাঙলার কথা

বাংলার জন-সাধারণের স্বাস্থ্য

বাঙলাদেশের মহামান্য গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণের সভাপতিত্বে গত সপ্তাহে (নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে) গভর্ণমেণ্ট হাউসের কাউন্সিল চেম্বারে বিভিন্ন জেলা-বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানদের যে সম্মেলন হয়েছিল, তাহাতে পল্লী-স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-সমিতির পুনর্গঠন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হাইয়াছিল। এই প্রদেশের স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর জেলাবোর্ডগুলির চেয়ারম্যানগণের এই সর্ব্বপ্রথম সম্মেলন।

সম্মেলনে যত কিছু আলোচ্য বিষয় ছিল, তন্মধ্যে পল্লীর জনসাধারণের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-সমিতির পুনর্গঠনের কার্য্যসূচিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করিতে চান, তাহা প্রদর্শনের জন্য নিম্নে কার্য্যসূচির পুনর্গঠনের বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

গত ১৯২৭ সাল হইতে পল্লী-স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের কাঠামোটির অস্তিত্ব ছিল।

বর্ত্তমানে গঠিত প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক মহামারী দূরীকরণার্থে যথেষ্ট সংগ্রাম করিয়াছে, কিন্তু প্রাদেশিক পল্লী-স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ব্যাপারে ইহার কাজ যথোপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এই সম্পর্কে যখন ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা হয়, তখন স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণও উক্তরূপ মন্তব্য করেন।

বর্ত্তমান পল্লী-স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-শাখাগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং এই কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারিবৃন্দ এতবেশী দক্ষ ও শিক্ষিত নয় যে, প্রয়োজনবোধে জন-সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলি প্রচলন করাইয়া সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে তৎপর হয়।

স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ কার্য্যাবলীর পুনর্গঠন সম্পর্কে এক বিস্তারিত বিবরণী দাখিল করিয়াছেন।

স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর যে কার্য্যসূচি দিয়াছেন, তাহাতে প্রতি দুইটি ইউনিয়ন বোর্ড-অন্তর্গত একটি শাখায় একজন করিয়া চিকিৎসক নিযুক্ত করার প্রস্তাব করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত প্রতি শাখায় একটি করিয়া

চিকিৎসা-কেন্দ্র এবং প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডে একজন করিয়া স্বাস্থ্য-সংরক্ষক সহকারীর প্রস্তাবও আছে।

প্রতি চিকিৎসা-কেন্দ্রে একজন করিয়া শিক্ষিতা ধাত্রী রাখার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় জেলার হেল্‌থ অফিসারগণই বিভিন্ন জেলার স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কার্য্যাবলীর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী থাকিবেন এবং প্রত্যেক মহকুমার জন্য একজন করিয়া স্বাস্থ্য-সংরক্ষক-সহকারী নিযুক্ত করা হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ডগুলির সঙ্গে বর্ত্তমান যোগাযোগ যাহাতে ব্যাহত হইতে না পারে, সেই জন্য সমগ্র কার্য্যসূচি স্থানীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যাপারের উপর ভিত্তি করা হইয়াছে। এই কর্ম্মতালিকাকে কার্য্যকরী করার জন্য জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলির নিকট হইতে তাহাদের ক্ষমতানুযায়ী দেয় বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং অধিকাংশ ব্যয়ভার স্বয়ং গভর্ণমেণ্টই বহন করিবেন।

পল্লী-স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ব্যাপারে একাধারে প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক ঔষধের যে প্রস্তাব বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্থাপন করিয়াছিলেন, সার্জ্জেন-জেনারেল কর্ত্তৃক তাহা যথারীতি অনুমোদিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে :—

(১) প্রত্যেক চিকিৎসা-কেন্দ্রে জন-সাধারণের প্রয়োজন-বোধে চিকিৎসার সুবিধা দান ও রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) পল্লী-স্বাস্থ্য-সংরক্ষণার্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যবস্থা থাকিবে :—

(ক) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার পাঠ গ্রহণ—স্বাস্থ্য-সম্পর্কে বিদ্যালয় পরিদর্শন—স্কুলের বালক-বালিকাদিগের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা।

(খ) বয়স্ক ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে গঠনমূলক শিক্ষা।

(গ) মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-মঙ্গল সম্পর্কিত সেবাকার্য্য।

(ঘ) ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক কার্য্যাবলী।

(ঙ) বসন্ত-প্রতিষেধক কার্য্যাবলী।

(চ) কলেরা-প্রতিষেধক কার্য্যাবলী।

এতদ্ব্যতীত পল্লী-অঞ্চলে যক্ষ্মা-প্রতিষেধক এবং কুষ্ঠ-প্রতিষেধক কিছু কিছু কার্য্যাবলীও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৩) পল্লীগ্রামে পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কিত পল্লী-সংস্কার কার্য্য এবং পূর্ত্ত বিভাগ প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগের সহযোগিতায় বহুবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য সংসাধন। পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, একজন কর্ম্মচারী নলকূপগুলির ছোটখাট সংস্কার সাধন করিবে এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ দরকারী সংস্কার সম্পর্কে জেলাবোর্ডকে সংবাদ প্রেরণ করিবে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যাদির জন্য কর্ম্মচারিবৃন্দ খাল ইত্যাদির সংস্কার, কার্য্যে, কৃষি এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা সম্পর্কে যথারীতি উপরিস্থ কর্ম্মচারীর মারফৎ পূর্ত্ত বিভাগে সংবাদ জানাইয়া দিবে।

পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলি সর্ব্ববিধভাবে স্বাস্থ্য-শাখা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে এবং এইখানেই প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা হইবে।

এই বিরাট কার্য্যতালিকা সমগ্র প্রদেশের উপর প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে (যদি অনুমোদিত হয়) হয়ত সাময়িকভাবে একটি বিশেষ সময়ের জন্য (ধরা যাউক সাত বৎসর) কেবলমাত্র পল্লী-স্বাস্থ্য-সংরক্ষণার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

এই ব্যবস্থার ভিন্নরূপ আর একটি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, দুইটি ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত একটি শাখায় একজন করিয়া চিকিৎসককে গভর্ণমেণ্ট পাঁচ বৎসরের জন্য ক্রম-হ্রাসপ্রাপ্ত বৃত্তি দান করিবেন। এতদ্ব্যতীত একটি চিকিৎসালয় পরিচালনার জন্যও এককালীন অর্থ দেওয়া হইবে। কিন্তু দানের এই সর্ত্ত থাকিবে যে, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে চিকিৎসকগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সাফল্যে এই দান গ্রহণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।

গভর্ণমেণ্টের অনুকরণে এই প্রদেশের বিভিন্ন যায়গায় স্থানীয় কর্ম্মীদলের সহযোগিতায় এই কার্য্যসূচি পরীক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যফল আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। পল্লী-অঞ্চলের চিকিৎসকগণের মধ্যে দোষণীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বহুক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

—বাঙলার কথা

সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দত্ত

মেদিনীপুর জেলা পল্লী-উন্নয়ন সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রয়োগ মান কর্ত্তৃক পানিহাটী
এবং, ২৩।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পল্লী-শ্রী

১ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ [৭ম সংখ্যা

মেদিনীপুরের প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র ঃ

'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ'

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল সভ্য সমাজে সংবাদপত্র নিত্যব্যবহার্য্য জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সংবাদপত্র মুদ্রণ ও বিতরণের বিধিব্যবস্থাও একটা বিরাট্ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। তাহা সত্বেও সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যেও মাত্র গত দুই শত বৎসরের মধ্যে সংবাদপত্রের বিকাশ হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয়। সেই সুযোগে সকল প্রকারের সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য দেশময় যে উৎসাহ জাগিয়া উঠে, সংবাদপত্র-প্রকাশ উহার একটি দিক্। বাংলা দেশের—তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজী; উহা 'বেঙ্গল গেজেট'—২৯ জানুয়ারি ১৭৮০ তারিখে হিকি (Hickey) সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। ইহা একখানি মাসিকপত্র, নাম 'দিগ্দর্শন'। জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান্ ইহা সম্পাদনা করিতেন। প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' শ্রীরামপুর হইতেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ মে প্রকাশিত হয়; জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান্ এই পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন। 'সমাচার দর্পণ'-প্রকাশের এক পক্ষ ব্যবধানে বাঙালী কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত এবং কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'র আবির্ভাব। বহুড়ার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায় ইহার পরিচালক ছিলেন।

শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণে'র কথা ছাড়িয়া দিলে, মফস্বল হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের গৌরব প্রাপ্য—'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'র। কাসিমবাজার-রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আনুকূল্যে এবং গুরুদয়াল চৌধুরীর সম্পাদকত্বে এই বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয় ১০ মে ১৮৪০ তারিখে। ইহার পর রংপুর, কাশী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। মেদিনীপুরও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ্ ছিল না। ১৮৫১ সনের মধ্যভাগে মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ. ভি. বেলীর (H. V. Bayley) আনুকূল্যে ও কতিপয় দেশীয় লোকের পরিচালনে মেদিনীপুর হইতে সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানির নাম—'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ'; ইহা দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) মাসিক পত্রিকা ছিল; ইহাতে স্থানীয় লোকের রুচিকর সংবাদাদিও থাকিত।* ১ আগস্ট ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত নিম্নাংশ হইতে জানা যাইবে, কাগজখানি কলিকাতায় মুদ্রিত হইত এবং ইহার প্রকাশকাল খুব সম্ভব ১৮৫১ সনের জুন মাস :—

> বিদ্যাকল্পদ্রুম যন্ত্রালয়* হইতে সংপ্রতি "মেদিনীপুর এবং হিজলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ" নামক ইংরাজী ও বাঙ্গালাভাষায় ভূষিত এক

* ১৮৫৫ সনে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ৬৪) পাদরি লং লিখিয়াছেন :—

PERIODICALS—MAGAZINES...*Midnapur and Hijili Guardian.* Mo., A. B., started under the patronage of H. V. Bayley, Esq., when Collector of that station; gave literature and news interesting to natives in the Mofussil.

অভিনব পত্র প্রকটিত হইতেছে, আমরা তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, প্রথম সংখ্যা দৃষ্ট করি নাই, এজন্য সম্পাদক মহাশয়দিগের নাম এবং আর আর বিবরণ জানিতে পারিলাম না, ঐ পত্রের তাৎপর্য্য এবং অভিপ্রায় উত্তম বটে, কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা কেবল বঙ্গভাষা পাঠ দ্বারা হঠাৎ তাঁহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন না, যাহা হউক, অধুনা বাঙ্গালা লেখার বিষয়ে এই নবীন পত্র শ্রীরামপুরস্থ মনোহর মুকুরের [সমাচার দর্পণের] নিকট অনায়াসেই জয়প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই মন্তব্যের পর 'সংবাদ প্রভাকর' "পাঠকগণের বিদিতার্থ উক্ত পত্র হইতে কয়েক বিষয়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত" করিয়াছেন। 'মেদিনীপুর এবং হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' পত্রের রচনার নিদর্শনস্বরূপ ঐ উদ্ধৃত অংশ নিম্নে দিতেছি :—

"Experience alone will shew that the blessings of social organization, and unpartial law are well worth the individual concessions by which they are purchased. Martineau's last half century."

"Nothing is so well done as what is done in love, and not by force. When we do good for its own sake, the pleasure we shall feel in our hearts and our consciences, is not to be described, and if that pleasure is lost by misdoing after it has once been felt it will always be deeply regretted."

"সভা নির্ম্মাণে এবং যথার্থ বিধানে যে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি হয় তাহার ব্যবহারের দ্বারা নৈপুণ্য প্রকাশ হইবেক।

বল প্রকাশ না করিয়া প্রণয় দ্বারা যেমত কর্ম্ম সম্পাদন হইবেক এমত অন্য কিছুতেই হইবেক না, যথ- কোন মঙ্গলজনক কর্ম্ম করি তখন অন্তঃকরণে ও সদসৎ বিচার জন্য জ্ঞানে যে আনন্দ প্রাপ্ত হই তাহা বর্ণনাতীত। যদ্যপি কুকর্ম্মের দ্বারা ঐ আমোদে (যাহাতে একবার নিমগ্ন ছিলাম) বঞ্চিত হই তবে তাহাতে যে দুঃখ তাহা চির স্মরণীয় রহিবেক।

"IX. Canals."

"A canal is an artificial channel filled with water kept at the desired level by means of locks or sluices forming a communication between two or more places. (1). Historical sketch of Canals—Ancient Canals—."

"The comparative cheapness and facility with which goods may be conveyed by sea or by means of navigable rivers, seem to have suggested, at a very early period the formation of canals. The best authenticated accounts of ancient Egypt represent that country as intersected by canals conveying the waters of the Nile to the more distant parts of the country partly for the purpose of irrigation, and partly for that of internal navigation. The efforts made by the old Egyptian monarchs and by the Ptolemies to construct a canal between the Red Sea and the Nile, are well known; and evinced the high sense which they entertained of the importance of this species of communication. (Ameilhon commerce des Egyptians. p. 76)."

"৯ মনুষ্য কর্ত্তৃক খাল।"

"মনুষ্য খাল খুঁলিয়া সেতু দ্বারা জলে পূর্ণ রাখে যদ্দ্বারা দুই কি ততোধিক স্থানের মধ্যে জলপথে গমন হইতে পারে। খালের বৃত্তান্ত ও খালের প্রাচীনত্ব।"

"সমুদ্র কি নদ দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থান পর্য্যন্ত বস্তু লইয়া গেলে অত্যল্প ব্যয়ে ও সহজে হইতে পারে ইহাতেই খাল নির্ম্মাণের কথা বহুকাল হইতে উল্লেখ থাকন বোধ হইতেছে। মিশর দেশের প্রামাণিক প্রাচীন পুরাবৃত্তে প্রকাশ হয় যে ঐ দেশের দুরস্থ অংশ সকলে নীল নদীর জল দেওন এবং অন্যান্য দেশে জলপথে গমন এই দুই কারণ বশতঃ তদ্দেশ অনেক খালে বিভক্ত। লাল সাগর এবং নীল নদীর মধ্যে এক খাল নির্ম্মাণার্থ মিশর দেশের প্রাচীন রাজগণ এবং টলমি অর্থাৎ টলমি বংশের রাজগণ যে চেষ্টা করিয়া ছিলেন তাহা অতি প্রসিদ্ধ, এবং এমত গতি বিধি পথের মহত্ব বিষয়ে যে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন তাহাও প্রকাশ আছে।"

"We obtain the following valuable Statistics of Traffic returns of Railways in the United Kingdom for nine years, ending 28th. December, 1850."

"নীচের লিখিত যুক্ত রাজ্যের কলের গাড়ির বাণিজ্য বিষয়ের দেশ সম্পর্কীয় বহুমূল্য সংবাদ নাং ২৮ ডিসেম্বর ১৮৫০ সাল ৯ বৎসরের আমরা প্রাপ্ত হইলাম।"

'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ১২ এপ্রিল ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' "মৃত" বাংলা সাময়িক-পত্রের একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাতে 'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' পত্রের নাম আছে।*

মেদিনীপুরের প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত সংবাদ এখনও জানা যায় নাই। মেদিনীপুর কলেক্টরীর দপ্তরখানা, বেলী হলের লাইব্রেরি বা প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কাগজপত্রাদি অনুসন্ধান করিলে এই পত্রিকার কোন কোন সংখ্যা আবিষ্কৃত হইতে পারে। এ বিষয়ে মেদিনীপুরবাসীর সচেষ্ট হওয়া উচিত।

* "Midnapore in 1851-2, had a newspaper, the *Midnapore Adhenkha* edited by H. V. Bayley Esq., Collector of the district."—Long's *Returns relating to Publications in the Bengali Language, in 1857*, (1857), p. xlii.

বাংলা সাহিত্য

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সাহিত্যের কোনও ভৌগোলিক সীমানা নির্দ্দেশ করা চলে না; জাতি হিসাবে এক 'স্টকে'র অন্তর্ভুক্ত সকল মানুষের সাহিত্যও এক নয়। স্থান-কাল-মানুষের এক অদ্ভুত দুর্জ্ঞেয় যোগাযোগে এক এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এক একটা সাহিত্য গড়িয়া উঠে; একই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করিয়া এক দল অন্য দলের সাহিত্য-রস-ভোগে বঞ্চিত হয়। সাহিত্যের ঐক্য মানব-মনের কোন্ গভীর রহস্যের পরিণতি, তাহা সঠিকভাবে না জানিয়াও আমরা এ কথা বলিতে পারি যে, সাহিত্যের বন্ধন মানুষে মানুষে মিলনের দৃঢ়তম বন্ধন; রক্ত জাতি বর্ণ ধর্ম্ম ও ঐতিহ্যের সমতা বা বৈষম্য এই বন্ধন নিবিড় বা শিথিল করিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ ছিন্ন করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালীর মিলন একান্তভাবে ভৌগোলিক অথবা রক্ত-ধর্ম্ম-বর্ণ-জাতিগত মিলন নয়, ইহা সম্পূর্ণ রসের এবং অনুভূতির মিলন। আধুনিক জগতে আমরা বরং দেখিতে পাই, ভাষা ও সাহিত্যই সর্ব্বত্র জাতির পরিধি নির্দ্দেশ করিতেছে, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের জন্য ভারতবর্ষজাত ফিরিঙ্গী-সম্প্রদায়ও এখন পর্য্যন্ত আপনাদিগকে অভারতীয় মনে করিতে ভরসা পায়, আপনাদিগকে তাহারা ইংরেজের সমগোত্রজ কল্পনা করিয়া তৃপ্ত হয়। তেমনই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যই পেশোয়ার হইতে ব্রহ্মদেশ এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এক অখণ্ড বাঙালী জাতি বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই কারণে সঙ্কীর্ণ প্রদেশ এবং সঙ্কীর্ণতর জিলার গণ্ডি তুলিয়া সাহিত্যের নামে মিলিত হইতে সঙ্কোচ বোধ হয়। জিলাগত এই ভেদবুদ্ধি সম্ভবত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য নির্ণয়ে অপরিহার্য্য, কিন্তু সাহিত্য-সংসারে বীরভূম মুর্শিদাবাদ মেদিনীপুর মৈমনসিংহ ইত্যাকার কুঠরি-বিভাগের কোনই সার্থকতা নাই। সম্প্রতি এই মারাত্মক ভেদবুদ্ধি আমাদের মধ্যে জাগিতেছে বলিয়া সাহিত্যেও রাঢ়-বঙ্গের লড়াই সুরু হইয়াছে, বীরভূমের চণ্ডীদাসকে ব্রাহ্মণ্যের চণ্ডীদাস প্রতিপন্ন করিবার জন্য বাংলা সাহিত্যের শ্রদ্ধেয় প্রধানেরা পর্য্যন্ত নানা প্রচার-কৌশলের শরণাপন্ন হইতে দ্বিধা করিতেছেন না। আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মিঞাপুর-নবদ্বীপ, নান্নুর-ছাতনা, হুগলি-মেদিনীপুর, কাঁঠালপাড়া-সানকিভাঙা অথবা জোড়াসাঁকো-শান্তিনিকেতন মোটেই সত্য নয়—চৈতন্যদেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথই সত্য।

যে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনে সহস্র প্রকার বন্ধনে আপনাকে প্রতিদিন বদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, দুঃখ-দৈন্য অভাব-অনটন নীচতা-দীনতার কর্দ্দমাক্ত ঘূর্ণিপাকে তলাইয়া যাইতে যাইতেই সেই মানুষই শিল্প ও সাহিত্যের প্রশস্ত আকাশে মুক্তির সন্ধান করে। তথাকথিত সংস্কৃতি ও সভ্যতার পাকে সে যতই নিবিড়-ভাবে জড়াইয়া পড়িতে থাকে, এই মুক্তির সাধনাও তাহার ততই গভীর ও ব্যাপক হয়। ইউরোপের সাহিত্য এবং বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের সাহিত্য এই কারণেই এত সমৃদ্ধ হইয়াছে। কর্ম্মবন্ধন যেখানে যত নিবিড়, মানস-মুক্তির সাধনাও সেখানে ততই কঠিন। এই সাধনায় মানুষ অবসর-বিনোদনের সহস্র পন্থা অন্বেষণ করে;—আকাশে উড়ে, গভীর সাগর-গহ্বরে ডুব দেয়, দুর্গম গিরিশৃঙ্গকে জয় করিতে চায়, গান গায়, ছবি আঁকে, সাহিত্য রচনা করে; সে বিশেষকে কখনও কখনও সাধারণ করিয়া তুলিতে চায়, সাধারণকে কখনও বা বিশেষে রূপ দিতে প্রয়াস পায়; মূর্ত্তকে অনন্তকালের বক্ষে ধরিয়া রাখিতে চায়, অনন্তকে মূর্ত্তের বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলে। চিত্রশিল্প ও সঙ্গীত—মানবের এই দুই প্রয়াসের নিদর্শন। সাহিত্যের প্রয়াস আরও ব্যাপক; দেহবদ্ধ মানব-চৈতন্যের ইহা দেহমুক্তির সাধনা; সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত সৃষ্ট জীবের সামীপ্যের সাধনা।

প্রাচীনকালে এই সাধনা আমাদের এই ভারতবর্ষে যে চরমে পৌছিয়াছিল, আমরা তাহার বহু নিদর্শন পাইতেছি। কিন্তু তাহার পর ভারতবর্ষের অশেষবিধ

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; স্বাধীন পরাধীন এবং সংস্কৃত প্রাকৃত হইয়াছে। জীবিতের যাহা শোভাবৃদ্ধি করিত, জীবন্মৃতের পক্ষে তাহাই বিপুল বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সেই সাধনার সংস্কার মাত্র বর্ত্তমান, প্রাণশক্তি ক্ষুন্ন হওয়াতে অতীতের ঐতিহ্যকে আমরা প্রাচীন আবর্জ্জনা মাত্র মনে করিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিতেছি। এই মনোবৃত্তি লইয়া অতি-আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সূত্রপাত হইয়াছে। সাহিত্যের এই "নবত্বে" বাংলা দেশ এখনও পর্য্যন্ত অগ্রণী। আমি মধ্যবর্ত্তী দীর্ঘ দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস একেবারে বাদ দিলাম। ইহার মধ্যেই প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটিয়াছে, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ-সংঘর্ষের পূর্ব্বেই তাহাও প্রাণশক্তি খোয়াইয়া গতানুগতিকতার দৈন্যে সংস্কারমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে—অর্থাৎ ভারতীয় বাঙালীর মনে সংস্কারের ইহা দ্বিতীয় কিস্তি প্রলেপ। এই প্রলেপের মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদের, ইসলামী একেশ্বরবাদের, বৈষ্ণব দাস্যভাবের, রোমান কাথলিক ত্রিত্ববাদের এবং আরও কয়েকটি অপরূপ বস্তুর সংমিশ্রণ ছিল। প্রথমটি ছিল অবিমিশ্র আর্য্য সংস্কার এবং দ্বিতীয়টি বহু বিচিত্রের সমন্বয়ে প্রস্তুত একটা যৌগিক সংস্কার। প্রথম যুগে জ্ঞান প্রবল, দ্বিতীয় যুগে ভক্তি প্রবল; বাঙালীর স্বভাবধর্ম্মে এই ভক্তির সহিত আদিরস প্রচুর পরিমাণে মিশিয়া যে সাহিত্যের উদ্ভব হইল, কবি হাফআখড়াই পাঁচালী ও টপ্পা গানে তাহার সমাপ্তি। তারপর, ইংরেজ প্রভাবের যুগ অর্থাৎ ভারতীয় সাহিত্যে কর্ম্মের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই যুগের সূত্রপাত হইয়া রবীন্দ্রনাথে শেষ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আজিও জীবিত থাকা সত্বেও এই যুগও আমাদের মনে একটা সংস্কারের প্রলেপ মাত্র বুলাইয়া দিয়াছে, এবং ইহার পরই সুরু হইয়াছে অতি-আধুনিক নকল ভাববিলাসের যুগ। এই যুগ সম্বন্ধেই আমার মনে কিছু সংশয় ও সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে।

পাশ্চাত্য জগৎ প্রবল কর্ম্মবন্ধনের ঝোঁকে লোহা-লক্কড়ীয় ও মানবীয় যান্ত্রিকতায় এমনই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, মানবধর্ম্মের চিরন্তন আদর্শ সেখানে উপহসিত ও অবহেলিত হইতেছে; মানুষ অপেক্ষা মেশিন বড়—এই তত্ব প্রচারিত হওয়ার ফলে মানুষও মেশিন হইয়া যাইতেছে—প্রেম ও ভগবান জুজুর ভয়ের মত একটা আদিম সংস্কাররূপে গণ্য হইতেছে। লক্ষবর্ষপরিমিত মানবের ইতিহাসে এরূপ দম্ভ মানুষ বহুবার করিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একজন বুদ্ধ একজন যীশু অথবা একজন মহম্মদের শরণাপন্ন না হইয়া সে সান্ত্বনা পাইতেছে না। পরস্পরকে সংহারের সাংঘাতিক প্রয়োজনে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতেই ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষ এমন প্রভূত শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে যে, গত দীর্ঘকাল-অনুসৃত সাহিত্য-পথে তাহার সান্ত্বনা নাই। অবসর-বিনোদনের অন্য উপায় আবিষ্কার করিতে তাহারা ব্যস্ত; সাহিত্যের উপরেও বহু বিচিত্র পরীক্ষা চলিতেছে—ভাষার ভাবের ছন্দের ভঙ্গির পরীক্ষা। হয়তো এই পরীক্ষালব্ধ আপাতকিম্ভূতকিমাকার হইতেই সত্যকার সুষমামণ্ডিত একটা রূপ তাহারা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবে, কারণ জয়লাভ করিবার জন্য যাহা প্রাথমিক প্রয়োজন—মনের ও দেহের শক্তি—তাহাদের তাহা প্রচুর আছে। সুতরাং রূপান্তরের ভয় থাকিলেও তাহাদের সাহিত্যে বিনাশের আশঙ্কা নাই।

হনুমান যত শক্তিশালীই হউক, রাবণের দশ মুণ্ড যদি তাহার কাঁধে কোনও কৌশলে বসাইয়া দেওয়া হইত, সীতা উদ্ধার পর্য্যন্ত সে নিশ্চয়ই লঙ্কায় অপেক্ষা করিত না। বাংলা দেশের ভাববিলাসী সাহিত্যিক-সম্প্রদায় সাধ করিয়া নিজেদের কাঁধে ইউরোপের দশ মুণ্ড চাপাইয়া লইয়া মুণ্ডের ভারে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং সাহিত্য বলিয়া তাঁহারা যাহা প্রচার করিতেছেন, তাহা আসলে আর্ত্তনাদের এবং প্রলাপের মত শুনাইতেছে, ধড়ে ও মুণ্ডে খাপ খায় নাই। জাপানেও এই পরীক্ষা কিছুকাল পূর্ব্বে সুরু হইয়াছিল, কিন্তু জাপান যুযুৎসু-কৌশলে দেহশক্তিতে তাহাদের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে বলিয়া সামলাইয়া লইয়াছে; তাহার যদি অপমৃত্যু ঘটে, ইউরোপীয় পদ্ধতিতেই ঘটিবে। কিন্তু বাংলা দেশ?

সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গিতে কেবল জলের নিচেকার পাককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য্য।

নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধি গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতী পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; যাতে তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে—লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেই রকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে "রিয়ালিটি কারি পাউডর।" ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন আর একটা লালসার অসংযম।

আত্মঘাতী হইয়া নষ্ট করিবার মত প্রচুর প্রাণশক্তি আমাদের নাই বলিয়াই আমাদের এত শঙ্কা, এত সাবধানতা। দীর্ঘ দুই সহস্র বৎসরের সাধনায় পর পর জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের পথে আমাদের সাহিত্যের যে ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘদিন বর্ত্তমান থাকিয়া একেলার জীবনেই যাহার সমন্বয় সাধন করিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইতেছেন, আশার কথা এই যে, সে পথেও সাধকের অভাব হয় নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের, সুতরাং বাঙালী জাতির, ভবিষ্যৎ এই সকল সাধকের ঐকান্তিক সাধনার উপরেই নির্ভর করিতেছে। এই কুয়াশাযুগের নকল ভাববিলাসীরা দেশব্যাপী একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া যাহাতে সত্যকে সহজকে ও চিরন্তনকে স্থানচ্যুত করিয়া অচিরাৎ ধ্বংসকে ডাকিয়া না আনে, বাঙালীমাত্রেরই সে বিষয়ে অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। যে সাহিত্য মানবের চির-কল্যাণের, আমাদের ভাগ্যদোষে স্বার্থবুদ্ধিস্পর্শ ও বিচারবুদ্ধিহীন লেখনীবৃত্তিধারীরা সেই সাহিত্যের দোহাই পাড়িয়া আমাদের অকল্যাণ করিতেছেন। এই জাতীয় উগ্র মাদকদ্রব্য সেবনে আপাতত উত্তেজনা আছে, কিন্তু চিরন্তন মানবাত্মার অভিব্যক্তি ইহা দ্বারা হয় না, এবং ইহার বহুলপ্রচারে সমগ্র জাতির সূক্ষ্ম রসানুভূতি বিনষ্ট হয়। নানাবিধ বিকৃত উত্তেজনাকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর যে সকল জাতি আপাতসুখের পশ্চাতে ছুটিয়াছে, তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে—ইতিহাসের সাক্ষ্য ইহাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মহিমায়, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের কল্যাণে, অতীতের সাহিত্য-সাধনালব্ধ যে সংস্কার-প্রলেপে আমাদের জড়ীভূত দেহে এখনও প্রাণচৈতন্য ধিকি ধিকি করিতেছে, মৃতসঞ্জীবনীর স্পর্শে সে দেহের জড়তা ঘুচাইয়া প্রাণশক্তিকে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ করিবেন, তাঁহারাও আমাদের মধ্যেই আছেন, তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইতে পারিলে আমাদের সাহিত্য ও জীবনের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হইয়া মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনের পথে আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই আলো-অন্ধকারের যুগে আমাদের সত্য ও মিথ্যার ভেদবুদ্ধি জাগ্রত রাখেন।

লোকশিক্ষা ও পাঠাগার

বিনয়রঞ্জন সেন, আই. সি. এস.

লোকশিক্ষার জন্য পল্লী-অঞ্চলে পুস্তক পাঠাবার নিয়মিত ব্যবস্থা বাংলায় মেদিনীপুর জেলাতেই প্রথম সম্ভব হ'ল। মেদিনীপুর জেলার পক্ষে এ ব্যবস্থা ঠিকই হয়েছে; কারণ, ভারতে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুর ইতিপূর্ব্বেই স্বতন্ত্র আসন দখল ক'রে আছে। এখানকার সাধারণ গ্রন্থাগার (Midnapore Public Library) স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫২ সালে, অর্থাৎ ভারতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর আগে এবং বিলাতে ১৮৫০ সনের পার্লামেণ্টের আইনে স্থাপিত সাধারণ পাঠাগারের দু বছর পরে।

এ কথা সকলেই মেনে নিয়েছেন যে, শিক্ষার পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট স্থান রাখতেই হবে। কিন্তু

নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতার কথা এখনও সকলে বোঝেন্ ব'লে মনে হয় না।

গত ত্রিশ চল্লিশ বছরে, শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় পল্লী-গ্রাম ছেড়ে শহরে বাস করতে আরম্ভ করেছেন। এর ফলে গ্রামগুলি হয়েছে জ্ঞানহীন ও সম্পদহীন। আগেকার কালে লোকশিক্ষার জন্য যে সব সহজ ও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল, সে সমস্ত একে একে লোপ পেয়েছে। সেকালের যাত্রা, কবির গান, কথকতা, পাঁচালী পল্লী থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু সে শহরে স্থান নিতে পারে, এমন কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত করা হয় নি। আজ যে সমস্যা সবচেয়ে বড় হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে, সেটি এই যে, কেমন ক'রে পল্লীগ্রামের নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য, কৃষি ও পৌরকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা বিতরণ করা যায়, কেমন ক'রে তাদের বুদ্ধিমান নাগরিকরূপে গ'ড়ে তোলা যায়, যাতে তারা রাষ্ট্রের প্রকৃত অংশ ব'লে গণ্য হতে পারে। মেদিনীপুর-পল্লী-পাঠাগার-প্রচেষ্টা এই জেলায় সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সামান্য আয়াস মাত্র।

এই পরিকল্পনার মূল কথা এই যে, জেলায় কয়েকটি কেন্দ্র ঠিক ক'রে নিয়ে সেখানে ভাল ভাল নির্ব্বাচিত বই পাঠানো হবে। বইগুলি এক একটি কেন্দ্রে এক মাস থাকবে এবং মাস শেষ হ'লে পর এক কেন্দ্রের বই অন্য কেন্দ্রে পাঠানো হবে, যাতে প্রত্যেক কেন্দ্রই ধারাবাহিকভাবে নূতন বই পেতে পারে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মেদিনীপুর জেলায় ছটি মহকুমায় ছটি মহকুমা-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেটকে সভাপতি ক'রে প্রত্যেক মহকুমা-কেন্দ্রে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি নিয়ে এক একটি কমিটি করা হয়েছে। কমিটিগুলি তাঁদের নিজেদের এলাকায় এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেন। জেলা-কমিটি পুস্তক পাঠিয়ে দিলে মহকুমা-কমিটি গ্রাম্য-কেন্দ্রগুলিতে পুস্তক বিতরণের ব্যবস্থা করবেন এবং আবশ্যকমত গ্রাম্য-কেন্দ্রের অধীনে ছোট ছোট উপকেন্দ্র স্থাপন ক'রে সেখানেও পুস্তক পাঠারার ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেক কেন্দ্রেই একটি ক'রে পড়বার ঘর থাকবে। পর্য্যায়ক্রমে কাজ করবার জন্যে এক দল কর্ম্মীও ঠিক করতে হবে, যাঁরা নিয়ম ক'রে সন্ধ্যায় এক বা দু ঘণ্টা ধ'রে গ্রামবাসীকে বই প'ড়ে শোনাবেন এবং সমস্ত জিনিস ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবেন। কেন্দ্র বা উপকেন্দ্রের সময় বদলাবার ক্ষমতা কমিটির হাতে থাকবে এবং এই পরিকল্পনামতে কাজ করবার জন্যে যে কোন উপায় সমীচীন ব'লে মনে হবে, তাই করতে পারবেন।

বর্ত্তমান বছরের গোড়ার দিকে মেদিনীপুরে বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়েছিল, তার ফলেই এই পরিকল্পনা সম্ভব হয়েছে। পরিকল্পনাটি বরোদার চলন্ত পাঠাগারের আদর্শে রচিত। এই চলন্ত পাঠাগারের ব্যবস্থায় বরোদা রাজ্যে বিশেষ সুফল দেখা গেছে।

পরিকল্পনা ও পুস্তক-নির্ব্বাচনে বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষৎ যে সাহায্য করেছেন, তার জন্যে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মেদিনীপুর-জেলা-বোর্ড পল্লী-উন্নয়নের জন্যে ২৫০০০৲ দান করেছেন। সেই টাকা থেকে ১৬৫০০৲ এই চলন্ত পাঠাগারের জন্য ব্যয় করা হবে। জেলা-বোর্ডের সাহায্য না পেলে কখনই এ পরিকল্পনা কাজে পরিণত হ'ত না। এই দানের জন্যে বোর্ডকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয়ের সহযোগিতা পাবার জন্যে আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। সকলের অকৃত্রিম সহযোগিতা না পেলে এরূপ পরিকল্পনা যতই সুচিন্তিত হোক না কেন, কখনই সফল হতে পারে না। *

* গত ২৭এ নভেম্বর, ১৯৩৮ মেদিনীপুর ওয়াই. এম. সি. এ. হলে যে সভা হয়েছিল, তাতে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি হয়ে চলন্ত পাঠাগারের উদ্বোধন করেন। তাঁর ইংরেজী অভিভাষণের অনুবাদ 'পল্লী-শ্রী'র পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্যে প্রকাশ করা হ'ল।

—সম্পাদক, 'পল্লী-শ্রী'

মেদিনীপুরে তুলার চাষ

বাংলা দেশে পাঁচ কোটি লোকের বাস, কিন্তু এখানে কাপড়ের কল মাত্র বাইশটি। এই বাইশটি কলে সমস্ত বাংলার কাপড়ের চাহিদা মেটাতে পারে না, তাই বাংলাকে নিজের লজ্জা-নিবারণের জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হয়। বাংলায় কাপড়ের কল চালাবার প্রধান অসুবিধা এই যে, সুতার জন্য লম্বা-আঁশের তুলা এখানে মেলে না, সমস্ত তুলাই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়।

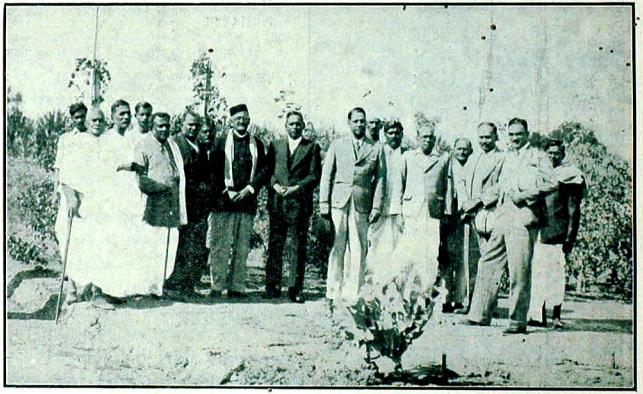

লালগড়: কার্পাস-ক্ষেত্রে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, মিল-ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবর্গ ও অন্যান্য অফিসারগণ

সাধারণত লোকের ধারণা—বাংলার মাটিতে লম্বা আঁশের তুলা জন্মাতে পারে না। এই মতটি ঠিক কি না সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করার জন্য ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স লিমিটেড লম্বা-আঁশের তুলার চাষ করেছেন এবং অনেকটা সফল হয়েছেন। আরও ব্যাপকভাবে এই পরীক্ষা করার জন্য বাংলার Millowners' Association (মিল-মালিক-মজ্‌দ) ও গবর্মেণ্টের সহযোগিতায় কয়েক মাস আগে একটি পরিকল্পনা স্থির করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষি-বিভাগের তত্ত্বাবধানে তুলার চাষের ব্যবস্থা হয়েছে।

কৃষি-বিভাগ থেকে এ বছর মেদিনীপুর জেলায় শালবনি থানার ভিতর শীতলপুর গ্রামে ৫০ বিঘা জমি নেওয়া হয়েছে। এই জমিটি মেদিনীপুর থেকে লালগড় যাবার পথে ১৭ মাইলের উপর বাঁ-দিকে দেখতে পাওয়া যাবে। সমস্ত জমিতে ২৮৯ নং (No. 289) লম্বা-আঁশ কার্পাসের চাষ আরম্ভ হয়েছে। এ ছাড়া মেদিনীপুর জেলায় লালগড়, মাইলদা ও নেড়ে গ্রামে লম্বা আঁশের তুলার চাষ চলছে। 'পল্লী-শ্রী'র শ্রাবণ সংখ্যায় মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকাল্‌চারাল-অফিসার এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন।

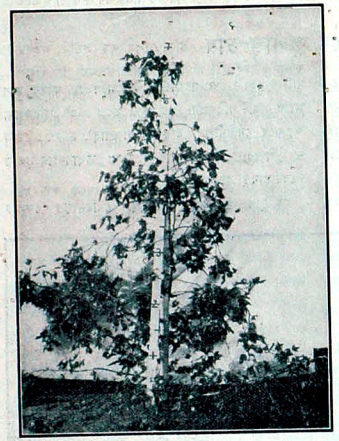

মেদিনীপুরে একটি তুলার গাছ

মেদিনীপুর জেলায় যে পরীক্ষা চলেছে, তার ফলাফল দেখবার জন্য বাংলার মিল-মালিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ কিছুদিন আগে মেদিনীপুরে এসেছিলেন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. তাঁদের কার্পাসের জমিগুলি দেখিয়েছিলেন। উৎপন্ন তুলা এবং তুলার গাছ দেখে সকলেই বিশেষ সুখী হয়েছেন। তুলার আঁশ হয়েছে লম্বায় ১৪ ইঞ্চি। এই তুলা কাপড়ের কলে ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে। 'পল্লী-শ্রী'র বর্ত্তমান সংখ্যায় এ জেলার একটি কার্পাস-চাষের জমি ও গাছের ছবি দেওয়া গেল।

মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ২৮ লাখ লোকের বাস এবং এখানে বহু অনাবাদী জমি প'ড়ে আছে। উপযুক্ত সার দিলে এই সব জমিতে সুন্দর তুলা হতে পারে। ব্যাপকভাবে তুলার চাষ সুরু হ'লে কৃষকের অন্নসংস্থানের সঙ্গে এ জেলায় নূতনভাবে বস্ত্রশিল্প গ'ড়ে উঠবে।

মেদিনীপুর জেলায় পল্লী-উন্নয়ন

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, মেদিনীপুরের বর্ত্তমান জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. পল্লী-উন্নয়নের যে পরিকল্পনা করেন, তারই নীতি অনুসরণ ক'রে এই জেলার প্রত্যেক মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি স্থাপিত হয় এবং এই সকল মহকুমা ও গ্রাম্য সমিতিকে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে পল্লী-উন্নয়নের কাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য জেলা-সমিতি গঠিত হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য পল্লীবাসীর অন্তরে নিজেদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা। পল্লীবাসী যাতে নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে চায়, যাতে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করতে পারে—সেই চেতনা তাদের অন্তরে জাগিয়ে দেওয়াই এই পরিকল্পনার মূল নীতি।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এ জেলায় ৯৩টি পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন ধারায় তাদের কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া গেল।

(ক) জল-সরবরাহ, খাদ্য-বিন্যাস ও পথ-নির্ম্মাণ

সদর (উত্তর) মহকুমায় তলকুই-যমুনাবালি, সাতপাটি, আনন্দপুর, কুয়াই, কলাগ্রাম, তেঘরি, ছেরাবনি, রসকুণ্ডা নয়াবসাৎ, নবকোলা, গোপালপুর, লোয়াদা, ষাঁড়পুর, মাড়োতলা ও শ্যামচক গ্রামের পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির চেষ্টায় অনেক গ্রামপথের সংস্কার হয়েছে। নবকোলা পল্লী-সমিতির সভ্যগণ এক মাইল লম্বা একটা বাঁধ তৈরি

করেছেন। আগে উঁচু জমির জলের বেগে গ্রামের চালাঘরগুলির খুব ক্ষতি হ'ত; এই বাঁধটি তৈরি হওয়ায় ঘরগুলি রক্ষা পাবে। নয়াবসাৎ পল্লী-সমিতি পথের ধারে আবশ্যকমত বাঁশের আগড় দিয়ে এবং স্থানে স্থানে কাল্‌ভার্ট তৈরি ক'রে গ্রামের পথগুলিকে লোকচলাচলের উপযোগী করেছেন। গোপালপুর ও লোয়াদা গ্রামের পল্লী-সমিতির কাজও উল্লেখযোগ্য। গোপালপুরের অধিবাসীদের চেষ্টায় চন্দ্রামেড় থেকে মোহনপুর পর্য্যন্ত একটি নূতন রাস্তা তৈরি হয়েছে।

সদর (দক্ষিণ) মহকুমায়, টুঙ্গুর পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির চেষ্টায় মোট ৭৮৩০ ফুট গ্রামপথের সংস্কার হয়ে গেছে। সমিতির সভ্যগণ কায়িক পরিশ্রমে পিঙ্গলা থেকে টুঙ্গুর পর্য্যন্ত রাস্তাটিকে মেরামত করেছেন। আঙ্গুয়া পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি গ্রামের সমস্ত পথই মেরামত করেছেন এবং কয়েকটি নূতন রাস্তা তৈরি করেছেন। সমিতির চেষ্টায় সাধারণের চলাচলের পথে একটি নূতন ব্রিজ তৈরি হয়েছে এবং একটি পুরাতন ব্রিজের সংস্কার হয়েছে।

ঘাটাল মহকুমায় শ্যামগঞ্জ পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি ৪টি নূতন রাস্তা তৈরি করেছেন। এর মধ্যে ৩টি ৬ হাত চওড়া ও ১টি ৩ হাত চওড়া এবং এদের মোট দৈর্ঘ্য ৮০০ গজ। এ ছাড়া আরও ৪টি পুরাতন গ্রামপথকে মেরামত করা হয়েছে। পথের ধারে ড্রেন কেটে আবশ্যকমত কাল্‌ভার্ট তৈরি ক'রে ও বাঁশের আগড় দিয়ে সমস্ত পথকে গাড়ি ও লোক-চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। মহাবলা-সমিতির চেষ্টায় লোকাল-বোর্ডের রাস্তা থেকে গ্রাম পর্য্যন্ত একটি নূতন গ্রামপথ তৈরি হয়েছে। ধামকুড়িয়া, ঘনরামপুর, আগরাপাড়া, নটুক, আমদেড়িয়া, হৈমন্তপুর, পিঙ্গলাশ ও শোনপুর গ্রামের প্রজারা কায়িক পরিশ্রমে অনেক গ্রাম-পথের সংস্কার করেছেন। গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সাহায্যের সঙ্গে গ্রামবাসীর চাঁদা মিলিয়ে দাশপুর থানায় তিন নম্বর ইউনিয়নের ভেতর সাড়ে চার মাইল লম্বা একটি রাস্তা তৈরি হয়েছে। হরিনারায়ণপুর, হিজলি, মহিষাঁমুরি, খোন্দকারচক, বসন্তপুর ও মথুরাপুরের প্রজাদের মিলিত চেষ্টার ফলে চন্দ্রকোণা থানায় ন নম্বর ইউনিয়নে পরিত্যক্ত পি. ডব্লিউ. ডি.-বাঁধের ওপরকার জঙ্গল কাটা হয়েছে। এখন এই বাঁধটি দিয়ে সমস্ত ইউনিয়নের প্রজারা স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারবে।

তমলুক মহকুমায় সেউড়ি, বেলুন, বড় সেউড়ি, কৃষ্ণগঞ্জ ও দুর্গান গ্রামের পল্লী-সমিতির চেষ্টায় গ্রামের অনেকগুলি পথের সংস্কার হয়েছে। তমলুক থানায় এগারো নম্বর ইউনিয়নে অনেকগুলি গ্রামপথকে মেরামত করা হয়েছে। পাঁশকুড়া থানায় বাঁকাডাঙ্গর থেকে পরমানন্দপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটির সংস্কার করা হয়েছে।

কাঁথি মহকুমায় মঙ্গলামারো বাজার থেকে কাটরঙ্কা পর্য্যন্ত সাড়ে চার মাইল লম্বা একটি নূতন রাস্তা তৈরি হয়েছে। এগরা, বালিসাহি, ঝালিঘাই, জেলেপাড়া ও চোরপালিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রচেষ্টায় ১২ মাইল গ্রাম-পথের সংস্কার হয়েছে। বাথুয়াড়ি, ডুমুঠ ও গোনারা-সাহাপুর পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির চেষ্টায় কয়েকটি নূতন রাস্তা তৈরি হয়েছে। নোয়াপাড়ার অধিবাসীগণ আধ মাইল লম্বা একটা রাস্তা তৈরি করেছেন, আর এই পথের উপর একটা কাঠের ব্রিজ ও কাল্‌ভার্ট তৈরি ক'রে দিয়েছেন। তাঁদের উদ্যম দেখে নিকটের গ্রামের প্রজারাও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ফলে আলমগিরিতে ৪টা, জেরথানে ২টা, বেনাচিকরায় ১টা ও সাতকুমারীতে ১টা নূতন কাঁচা রাস্তা তৈরি হয়েছে। খরণ ও মুস্তাফাপুরের প্রজারা স্বেচ্ছায় কায়িক পরিশ্রম ক'রে দুটি রাস্তা তৈরি করেছেন—একটি ১৬০ ফুট লম্বা ও ৬ ফুট চওড়া এবং অপরটি ১২০০ ফুট লম্বা ও ৮ ফুট চওড়া। মতিরামপুর ম্যালেরিয়া-নিবারণী-সমিতির চেষ্টাতেও একটি গ্রামপথ নির্ম্মিত হয়েছে। এরণ্ডা, নোয়াপাড়া ও বাথুয়াড়ি গ্রামে নূতন বাঁধ তৈরি হয়েছে। চকবাদল ও টিকরাপাড়া খালের ওপর বাঁশের পুল তৈরি হয়েছে।

(খ) স্বাস্থ্য

এ পর্য্যন্ত যতগুলি পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি স্থাপিত হয়েছে, তাঁরা সকলেই গ্রামের জঙ্গল কেটে, ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার ক'রে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করেছেন। এ বিষয়ে ঘাটাল মহকুমার শ্যামগঞ্জ পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সমিতির সভ্যগণ কায়িক পরিশ্রম ক'রে ১০ একর জমির জঙ্গল পরিষ্কার

করেছেন, ১২টি ছোট বড় ডোবা ভরাট্ করেছেন এবং ৬টি পুষ্করিণী খনন করেছেন। গ্রামের মাঝখানে যে বড় পুকুরটি কচুরিপানা পদ্মবন ইত্যাদিতে ভ'রে ছিল, তার জল বার ক'রে দিয়ে আবার তাকে কাটা হয়েছে এবং সেই মাটিতে ২৫টি ছোট বড় খানা ভরাট করা হয়েছে। এই পুকুরটির আয়তন লম্বায় ২১০ ফুট, চওড়ায় ১৮০ ফুট এবং এটি ৪০ ফুট গভীর। সমিতির সভ্যগণ নিজের হাতে দাতব্য-চিকিৎসালয়ের জন্য ঘর তুলেছেন। নটুক গ্রামের পল্লী-সমিতি ৬২টি পুকুর ও ডোবার সংস্কার করেছেন। খাঞ্জাপুর ও হরিনগর পল্লী-উন্নয়ন-সমিতিও অনেকগুলি পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করেছেন।

সদর (উত্তর) মহকুমায় নয়াবসাৎ, রসকুণ্ডা, গোপালপুর, লোয়াদা, তলকুই-যমুনাবালি, সাতপাঠি ও পাথরা পল্লী-সমিতিগুলির কাজ প্রশংসার যোগ্য। সদর (দক্ষিণ) মহকুমায় আঙ্গুয়া পল্লী-সমিতি অনেকগুলি মজা পুকুরের সংস্কার করেছেন এবং কেরোসিন ছড়িয়ে ডোবার জলে মশার ডিম পাড়া বন্ধ করেছেন। এই সমিতি গ্রামের অনেক জঙ্গল কেটে দিয়েছেন। টুঙ্গুর পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি ৩২৪০০ বর্গফুট জমির জঙ্গল পরিষ্কার করেছেন, ৫৪৮৯০ বর্গফুট মাপের পুকুর থেকে পানা তুলে ফেলেছেন এবং ২২৫০০ বর্গফুট ডোবা ভরাট করেছেন। চাঙ্গুয়াল, মোহনপুর, বেনাপুরা ও মালপাড়া গ্রামের সমিতিগুলি অনেক পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করেছেন। খরিকা পল্লী-সমিতি ৭২টি পুকুর সংস্কার করেছেন ও ৬টি ডোবা ভরাট করেছেন। হাসিমপুর, পিপ্পলা ও সবঙ্গ গ্রামের পল্লী-সমিতি অনেক জঙ্গল কেটে দিয়েছেন।

তমলুক মহকুমায় ময়না ও তমলুকের পল্লী-সমিতির চেষ্টায় অনেকগুলি পুকুর ও ডোবার পঙ্কোদ্ধার হয়ে গেছে। পাঁশকুড়া ও ভোগপুর ইউনিয়ন-বোর্ড অনেকগুলি ছোট পুকুর ও ডোবার পানা তুলে ফেলে তাতে কেরোসিন তেল দিয়ে মশা নষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন।

কাঁথি মহকুমায় গোনারা-সাহাপুর-পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি ৪০টি পুকুর থেকে কচুরিপানা ও অন্যান্য উদ্ভিদ তুলে ফেলেছেন, ১০ একর জমির জঙ্গল পরিষ্কার করেছেন এবং ৬টি টিউব-ওয়েল বসিয়েছেন। নোয়াপাড়া-সমিতির চেষ্টায় ২০টি পুকুরের পাক তোলা হয়েছে এবং গ্রামের সমস্ত ঝোপ-ঝাড়, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে। বাগুয়াড়ি পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। তা ছাড়া, এই সমিতির চেষ্টায় ৪৫টি পুকুর ও ডোবার সংস্কার হয়েছে এবং ২টি টিউব-ওয়েল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কসবা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গ্রামের ময়লা জলের ড্রেনটি মেরামত ক'রে দিয়েছেন এবং ৩৮টি পুকুরের পাক তুলে ফেলেছেন।

গত বারো মাসের ভেতর খড়্গপুর থানায় চাঙ্গুয়াল গ্রামে, ডেবরা থানায় ডেবরা ও শ্যামচক গ্রামে এবং চন্দ্রকোণা থানায় শ্যামগঞ্জ গ্রামে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে লোয়াদা-সমিতির চেষ্টায় মুরাস্থি গ্রামে, সুতাহাটা থানায় দ্বারিবেড়্যা গ্রামে, তমলুক থানায় সেউড়ি গ্রামে ও খাকড়দা ইউনিয়নে দাতব্য-হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে। এগুলি ইউনিয়ন বোর্ড সমস্ত বছর বিনা-মূল্যে কুইনাইন বিলি করেছেন।

(গ) সেচন ও জলনিকাশ

গত বারো মাসের ভেতর কাঁথি ও তমলুক মহকুমার জলনিকাশ-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য দুটি কন্‌ফারেন্স হয়েছিল। জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় এই দুই মহকুমার নিম্নভূমিতে বৃষ্টির জল জ'মে যে অসুবিধার সৃষ্টি করে, কি ভাবে তা দূর করা যায় এবং জলনিকাশের সুব্যবস্থা করা যায়—সে সম্বন্ধে ঐ দুটি সভায় আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার ফলে স্থির করা হয়েছে যে, পূর্ত্তবিভাগ রামনগর-সাপুয়া, কালিঘাই নালার ও পানিপিয়া অববাহিকার জলনিকাশের জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন এই শীতকালেই সেইমত কাজ করা হবে। ঠিক হয়েছে যে, লাঙ্গলকোটা ও শিউলিপুরের মাঝামাঝি কালিঘাই নদীকে চওড়া করবার ব্যবস্থা করা হবে। এগুলি থানায় গঠিত জলনিকাশী-সমিতি ডুবদা অববাহিকার জলনিকাশের সুব্যবস্থা করার ভার নিয়েছেন। কালিঘাই ও কুলাটকরির মাঝে দু মাইল লম্বা খালটিকে গভীর করা হয়েছে। পটাশপুর থানায় ন নম্বর ইউনিয়নে বদিবাঁধ থেকে মঙ্গলামারো পর্য্যন্ত পাননালা খালটির সংস্কার করা হয়েছে। বারহাট ইউনিয়ন বোর্ড বাগদিবাঁধ ও কাটরুস্কার মাঝখানে আড়াই মাইল লম্বা খালটির সংস্কার ক'রে

দিয়েছেন। গোনারা-সাহাপুরে আড়াই মাইল লম্বা একটি খাল ৭০০ টাকা ব্যয়ে সংস্কার করা হয়েছে। এর ভেতর ২০০৲ চিত্তিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। খিদিরপুর ও গোপালপুর গ্রামের প্রজাদের মিলিত চেষ্টায় ৬০০ ফুট লম্বা ও ৭½ ফুট চওড়া একটি খালের সংস্কার হয়ে গেছে।

তমলুক মহকুমায়, পাঁশকুড়া থানার এলাকায় 'বা ন পু র-মেচাদা' খালটির সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। এই মহকুমায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ—হাসুয়াখালি খাল-সংস্কার। এই খা ল টি একদিকে শ্রীরামপুর শ্লুইসের ভিতর দিয়ে কাঁসাই নদীতে মিশেছে এবং অন্যদিকে পূর্ব্ব-কোলার ছোট শ্লুইসটির ভিতর দিয়ে গঙ্গাখালি খালে প'ড়ে রূপনারায়ণ নদে গিয়া মিশেছে। শ্রীরামপুর শ্লুইস থেকে পূর্ব্ব-কোলা শ্লুইস পর্য্যন্ত খালটি লম্বায় প্রায় ৮ মাইল। গত ৪৫ বছরের ভিতর খালটির সংস্কার হয় নি, ফলে খালটি ম'জে যাওয়ায় লোকের যাতায়াতের কষ্ট, ব্যবসাবাণিজ্যের অসুবিধা ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছিল। এ পর্য্যন্ত সাড়ে চার মাইল খালের সংস্কার হয়ে গেছে। এর জন্য ১১খানি গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসী ৮ দিন কায়িক পরিশ্রম করেছিলেন।

সদর (দক্ষিণ) মহকুমায় সবঙ্গ থানার এলাকায় আমড়াখালি খালটির সংস্কার আরম্ভ করা হয়, কিন্তু বর্ষার জলে বাঁধটি নষ্ট হওয়ায় এই কাজ বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। খরিকা-সমিতি দোখালি খালের একাংশ থেকে কচুরিপানা তুলে ফেলেছেন।

সদর (উত্তর) মহকুমায় শালবনি থানায় কোটাল-বেড়ের বাঁধ কাটা উল্লেখযোগ্য। গোপালপুর-সমিতি এক মাইল লম্বা একটি নালা কেটে কাঁসাই নদীর জল গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। লোয়াদা পল্লী-উন্নয়ন-সমিতিও নরহাবুপুর-খালটির সংস্কার ক'রে কাঁসাই নদীর লাল জল নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। নবকোলা-সমিতি গ্রামের সেচন-খালটিকে গভীর ক'রে দিয়েছেন।

(ঘ) কৃষি

কি প্রণালীতে চাষ করলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ

পল্লীবাসীরা সমবেতভাবে চেষ্টিত হইলে যাহা ঘটে তাহার নিদর্শন
শ্যামগঞ্জ-পল্লীর এই পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার পল্লীবাসীরাই নিজেরাই করিয়াছেন

বথেষ্ট বাড়ানো যায়, কেমন ক'রে বীজ রাখতে হয়, কি রকম সার দিলে জমির তেজ বাড়াতে পারা যায়—এই সমস্ত বিষয় শেখাবার জন্য এ জেলায় বিশেষ চেষ্টা চলেছে। আগে জেলায় চাষের কাজ দেখাশুনার জন্য দুজন Demonstrator ছিলেন, গত বারো মাসের ভেতর আরও তিনজন Demonstrator নিযুক্ত হয়েছেন। সরকারী কৃষিবিভাগ মেদিনীপুর জেলার এগারোটি কৃষি-কেন্দ্র (Demonstration Farm) স্থাপন করেছেন। প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য ৩৭ বিঘা জমি নেওয়া হয়েছে। যে সব জায়গায় এরূপ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, তার নাম নীচে দেওয়া গেল :—

কাঁকপাড়া (ঝাড়গ্রাম মহকুমা); ধানঘড়ি, নেড়ে, বলিবাঁধ ও নেপুরা (সদর (উত্তর) মহকুমা); পিংলা,

পাচখুরি ও মালিগ্রাম (সদর (দক্ষিণ) মহকুমা) ; বাঁকা, মহাবলা ও মাড় (ঘাটাল মহকুমা) ।

এগুলি ছাড়া ৫টি ইউনিয়ন বোর্ড ফার্ম স্থাপিত হয়েছে প্রত্যেকটিতে ১৮ বিঘা জমি নিয়ে উন্নত ধরণের চাষাদের দেখান হচ্ছে। যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড ফার্ম স্থাপিত হয়েছে, তার নাম নীচে দেওয়া গেল :—

মাইলদা ও তলকুই (সদর (উত্তর) মহকুমা) ; টুঙ্গুর (সদর (দক্ষিণ) মহকুমা) ; হেমন্তপুর (ঘাটাল মহকুমা) ও নেতাই (ঝাড়গ্রাম মহকুমা) ।

শালবনি থানার এলাকায় শীতলপুর গ্রামে ৫০ বিঘা জমিতে ২৮৯ নং (No. 289 F) লম্বা-আঁশ কার্পাসের চাষ করা হচ্ছে। এই চাষ পরীক্ষা-সাপেক্ষ। এ পর্য্যন্ত পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হয়েছে। Sea-Island এবং K. T. No. 25 কার্পাসের চাষও লালগড়, মাইলদা ও নেড়ে গ্রামে আরম্ভ হয়েছে। চিনাবাদাম, পাটনাই ধান, ধরিয়াল আউস ধান এবং বাদকলমকাটি ও ঝিঙ্গাশাল আমন ধানের বীজ পল্লী-উন্নয়ন-সমিতিগুলির মারফৎ প্রজাদের বিতরণ করা হয়েছে। ৫১০০০ নেপিয়ার ঘাসের ডগাও বিলি করা হয়েছে। কাঁথি, তমলুক ও সদর (দক্ষিণ) মহকুমায় স্থাপিত বসন্তিয়া, খরিশা ও আঙ্গুয়া পল্লী-উন্নয়ন-সমিতিগুলি Demonstration Farm খুলেছেন। বালিঘাই ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত নোয়াপাড়া গ্রামে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একটি Poultry Farm খুলেছেন। এই ইউনিয়ন বোর্ড প্রজাদের উপকারের জন্য একটি হিসার-জাতীয় ষাঁড় পালন করছেন। তেপরাপাড়া, চোরাদীঘি, পশ্চিমজলি, শিঙ্গদা, সাহাপুর, তারক, বড়-খাল-গোয়ালদা এবং গোয়ালদা পাটনা গ্রামে আখচাষের প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। তমলুক মহকুমায় বালুঘাটা গ্রামে একটি শস্য-জমার ব্যাঙ্কের ঘর তৈরি হয়েছে এবং দাইনানে একটি ধূম্রগোলা স্থাপিত হয়েছে।

১৯৩৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে মেদিনীপুরে যে বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল, সেখানে উন্নত চাষের প্রণালী সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রদর্শনীর সঙ্গে ছাত্র-সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হওয়ায় সমবেত ছাত্রগণ এই সমস্ত প্রণালী দেখে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করেছে।

মেদিনীপুর জেলায় একটি District Agricultural Farm স্থাপনের জন্য জেলা-বোর্ড ১০০০০৲ দান করতে স্বীকৃত হয়েছেন। এই Farmএর জন্য আবশ্যকমত জমি নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শীঘ্রই এর কাজ আরম্ভ হবে।

গো-জাতির উন্নতির জন্য আগে কিছু চেষ্টা হয়ে থাকলেও ধারাবাহিকভাবে কোন কাজ করা হয় নি। কেবল কতকগুলি গ্রামে মেদিনীপুর জেলা অথবা পাঞ্জাব থেকে উন্নত ধরণের ষাঁড় এনে বিলি করা হয়েছিল। আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর জেলায় গো-জাতির উন্নতির জন্য এক পরিকল্পনা করা হয় এবং পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে ৬০টি উৎকৃষ্ট ষাঁড় আনিয়ে ৬টি থানায় বিতরণ করা হয়। ভারত গভর্ণমেণ্ট পল্লীসংস্কারের জন্য যে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন, তা থেকে ২৪৭০০৲ এই কাজের জন্য তিন বছরে ব্যয় করা হবে। জেলায় একজন Live stock Officer ও দুজন Assistant Live stock Officer নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁরা অকর্ম্মণ্য ষাঁড়গুলোকে দামড়া করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। এ ছাড়া, শালবনি থানায় ভীমপুর ও রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে মুরগী-চাষের প্রবর্ত্তন করা হয়েছে।

(৬) শিক্ষা ও মানসিক আমোদ-প্রমোদ

আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর জেলায় গ্রন্থাগার-আন্দোলনের বিশেষ প্রসার দেখা গেছে। মেদিনীপুরের পাবলিক লাইব্রেরির আমূল সংস্কার, মেদিনীপুরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলন ও লাইব্রেরি প্রদর্শনী এ বছরের স্মরণীয় ঘটনা। এই সবের ফলে গত কয়েক মাসে অনেকগুলি নূতন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে এবং পুরাতন গ্রন্থাগারের সংস্কার করা হয়েছে। এই সব নূতন গ্রন্থাগার যেখানে স্থাপিত হয়েছে, তার নাম নীচে দেওয়া গেল :—

গোপালপুর (ডেবরা থানা) ; আমলাগুড়া (গড়বেতা থানা) ; দহিজুড়ি, শিলদা, রাধানগর ও মাণিকপাড়া (ঝাড়গ্রাম মহকুমা) ; দারুয়া, এগরা, নোয়াপাড়া, অমর্ষি, বালিসাহি, বাথুয়াড়ি, পিছাবনি ও দুর্মুঠ (কাঁথি মহকুমা), দ্বারিবেড়্যা ও নন্দঘাট (তমলুক মহকুমা) ; আঙ্গুয়া (দাঁতন থানা) ও শ্যামগঞ্জ (চন্দ্রকোণা থানা) ।

পটাশপুর থানায় শাহাপুর গ্রামের জুবিলী লাইব্রেরি বিনা চাঁদায় বই পড়তে দেবার ব্যবস্থা করেছেন এবং গ্রামের প্রজারা লাইব্রেরির জন্য একটি 'হল' তৈরি করবার সংকল্প করেছেন। ঝাড়গ্রাম মহকুমায় স্থাপিত শিলদা ও মাণিকপাড়া পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি Village hall তৈরি করেছেন। ডেবরা থানায় লোয়াদা পল্লী-সমিতি গ্রামের আটচালাতে সাধারণের বৈঠক বসাবার ব্যবস্থা করেছেন। মহকুমা)। নরঘাট নৈশ-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নিজের হাতে সুন্দর স্কুল-ঘর তৈরি করেছেন।

সদর (উত্তর) মহকুমায় ছেরাবণি গ্রামে আদিম জাতির জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। হুম্নান ও আনন্দপুরে বালিকাদের জন্য উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে এবং তেঘরি, নোয়াপাড়া ও ষাঁড়পুর গ্রামে বালিকাদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক

শ্যামগঞ্জ : পল্লীবাসীদের চেষ্টায় নির্ম্মিত পার্কে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও অফিসার-বৃন্দ

উপবিষ্ট : (বাম হইতে দক্ষিণ)—মিঃ এস. পি. সেন গুপ্ত, মিঃ আর. বোস (এস. ডি. ও, ঘাটাল), মিঃ এন. সোম, মিঃ পি. পি. বৈনাথন আই. সি. এস., মিঃ ভি. কে. রাও, আই. সি. এস., মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. (জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট), রায় সাহেব দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য (চেয়ারম্যান, মেদিনীপুর জেলাবোর্ড), ক্যাপ্টেন জে. গুহমল, আই. এম. এস. (সিভিল সার্জ্জন), মিঃ এম. সিংহ (সার্কেল অফিসার, চন্দ্রকোণা) ও চেয়ারম্যান—চন্দ্রকোণা মিউনিসিপ্যালিটি ।

আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি নূতন নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। গ্রামের অধিবাসীগণ এ সমস্ত চালাবার ভার নিয়েছেন। এই সব স্কুলের নাম নীচে দেওয়া গেল :—

নয়াবসাৎ, গড়বেতা, রসকুণ্ডা ও আমলাগুড়া (সদর (উত্তর) মহকুমা) ; সবঙ্গ ও আঙ্গুয়া (সদর (দক্ষিণ) মহকুমা) ; মুগবেড়িয়া, দারুয়া, রাউতারা, নোয়াপাড়া, বাথুয়াড়ি, শ্রীরামপুর ও দুর্মুঠ (কাঁথি মহকুমা) ; শ্যামগঞ্জ (ঘাটাল মহকুমা) ; নন্দকুমার, হুম্নান, লালুয়াগেড়্যা, দ্বারিবেড়্যা, আকুবপুর, গোকুলনগর ও নরঘাট (তমলুক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। পাচখুবি গ্রামের মক্তবটি এ বছরে ভালই চলেছিল।

বালিচক গ্রামের অধিবাসীগণ একটি পাকা ক্লাব-ঘর তৈরি করাচ্ছেন।

পল্লীসংস্কারের জন্য প্রচারের কাজ যাতে ভাল ভাবে চলতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ১৫টি বেতার-যন্ত্র জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে রাখা হয়েছিল। আগে এই সব বেতার-যন্ত্র গ্রামে কোন মাতব্বরের বাড়িতে থাকত, কিন্তু সেগুলিকে ঠিকমত ব্যবহার করা হচ্ছে কি না,

তার খবর নেওয়া হ'ত না। সেই যন্ত্রগুলির মধ্যে ৫টি ছিল সদর মহকুমায়, ৪টি ছিল কাঁথিতে, ৬৩টি তমলুকে ও বাকি ৩টি ঘাটালে। এগুলোকে এই ভাবে ছড়িয়ে রাখার জন্য দেখাশুনারও যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। আলোচ্য-বর্ষে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এর জন্য নূতন পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বেতার-যন্ত্রগুলিকে মেদিনীপুর থেকে ১৫ মাইলের মধ্যে রাখা হয়। বেতারের গান-বাজনা যাদের আকৃষ্ট করে, যাতে তাঁরা শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ পেতে পারে, সেজন্য প্রত্যেক বেতার-কেন্দ্রে দৈনিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। জেলার হেল্‌থ-অফিসার ও স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারীগণ, স্কুলের পরিদর্শকগণ, হেডমাস্টার ও শিক্ষকগণ এবং গভর্মেণ্টের অফিসারগণ এই সব কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিয়েছেন।

পল্লী উন্নয়নের কাজে অনুপ্রেরণা দেবার জন্য 'পল্লী-শ্রী' মাসিক-পত্রিকার সৃষ্টি হয়েছে।

পল্লী-অঞ্চলে পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য একটি পরিকল্পনা করা হয় এবং জেলা-বোর্ডকে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে, এই জেলার ছটি মহকুমায় ছটি প্রান্তীয় (regional) গ্রন্থাগার থাকবে। প্রত্যেক প্রান্তীয় গ্রন্থাগার থেকে কুড়িটি চলন্ত গ্রন্থাধার (Travelling Library Box) পল্লী-কেন্দ্রে পাঠানো হবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে এই সব বই প'ড়ে শোনাবার জন্য নিয়মিত ব্যবস্থা থাকবে। এই সকল কেন্দ্রে একটি ক'রে পাঠাগার থাকার ব্যবস্থা থাকবে। মেদিনীপুর জেলা-বোর্ড এই জেলায় পল্লী-উন্নয়নের কাজের জন্য যে ২৫০০০৲ জেলা-পল্লী-উন্নয়ন-সমিতিকে দান করেছেন তা থেকে ১৬৫০০০৲ বয়স্কদের শিক্ষার জন্য চলন্ত পাঠাগারের ব্যবস্থায় ব্যয় করা হবে।

(ঙ) খেলা-ধূলা ও দৈহিক ব্যায়াম

মেদিনীপুর জেলায় অনেক পল্লীতে উৎসাহী যুবকেরা খেলাধূলার উদ্যোগ-আয়োজন করছেন। সরকারী সাহায্যে সমস্ত উচ্চ-ইংরেজী ও অনেকগুলি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে। পল্লী-মঙ্গল-সমিতির চেষ্টায় গ্রামে খেলার মাঠ তৈরি হচ্ছে। শ্যামগঞ্জে একটি খেলার মাঠ ও বেড়ার পার্ক তৈরি হয়েছে। বালিসুহি ও ঘুম্‌ঠ গ্রামেও খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে। নবকোলা ও লোয়াদা পল্লী-সমিতির চেষ্টাতেও গ্রামে খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে। শালবনি ও টুঁদুরে নূতন ক্লাব গঠিত হয়েছে। আনন্দপুর, দেউলডাঙ্গা, চৈপুর, শালবনি, আমলাগুড়া, গড়বেতা, বালিচক, তমলুক, মহিষাদল, কাঁথি, হরিহরপুর, লোয়াদা, টুঁদুর ও শ্যামগঞ্জে নিয়মিতভাবে ফুটবল খেলা হয়েছে। জেলায় খেলা-ধূলা প্রচলন ও পরিচালনার জন্য District Sports Association ও District Inter-School Sports Association স্থাপিত হয়েছে। এঁদের চেষ্টায় ফুটবল ও সাঁতারে ছাত্র ও যুবকদের বেশ উৎসাহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শরীর-চর্চ্চা ও খেলা-ধূলার ফলে মানুষের জীবনী ও কাজ করবার শক্তি বাড়তে থাকে, এ কথা সকলেই বুঝেছেন ব'লে মনে হয়। *

* ২৭এ নভেম্বর ১৯৩৮—মেদিনীপুর ওয়াই. এম. সি. এ. হলে—জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে যে সভা হয়, তাতে ডিষ্ট্রিক্ট পাবলিসিটি অফিসার এই বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। বিবরণী ইংরেজীতে লেখা ছিল; 'পল্লী-শ্রী'র পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য তার অনুবাদ প্রকাশ করা গেল। —'পল্লী-শ্রী' সম্পাদক

ছোট ছেলের খেলা

গতি ও চঞ্চলতা প্রাণের লক্ষণ। শিশুজীবনে এই চাঞ্চল্য পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। শিশু তার খেলাধূলার ভিতর দিয়ে নিজের প্রাণশক্তিকে ফুটিয়ে তোলে। তার কল্পনা বিচিত্র; কল্পনার রঙিন আলোয় সে সাধারণকে অসাধারণ ক'রে তুলতে চায়। এমনই ক'রেই তার সৌন্দর্য্য-বোধ জন্মে; সে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময় বিচিত্র জগৎকে বুঝতে শেখে। শিশু-জীবনের এই লীলা অনেক বাপ-মা বুঝতে পারেন না, পীড়ন বা শাসন ক'রে শিশুপ্রাণের

আনন্দ-উৎসকে তাঁরা বন্ধ ক'রে দেন। বাঙালী বাপ-মা চান ধীর, শান্ত, পণ্ডিত ছেলে; যে ছেলে দিনরাত বই নিয়ে প'ড়ে থাকবে, খেলায় বা বাইরের আমোদে বিশেষ মন দেবে না—সেই তাঁদের আদর্শ ছেলে। বিলাতের অবস্থা কিন্তু অন্য রকম। সে দেশের বাপ-মা চান অশান্ত, প্রাণচঞ্চল পুত্র। যে শিশু বড় হয়ে সাগরে পাড়ি দেবে, শূন্যে উঠবে, মানব-সভ্যতার অগ্রণী হবে—সেই তাঁদের আদর্শ। তাই ছেলেমেয়ের খেলাকে তাঁরা উপেক্ষা করেন না, খেলার ভিতর দিয়েই সন্তানের মনুষ্যত্ব গ'ড়ে তোলার দিকে তাঁদের লক্ষ্য।

ছোট ছেলের জীবনে খেলার একটি বিশেষ স্থান আছে। যেদিন সে প্রথম ধরণীর মুখ দেখে, সেদিন থেকেই তার খেলা সুরু হয়। তারপর যেমন তার বয়স বাড়তে থাকে, তেমনই খেলার রূপও বদলে যায়। জীবনের প্রথম বছরে সে নিজের হাত পা নিয়েই খেলা করে, দ্বিতীয় বছর নূতন জগৎকে জানার আগ্রহ তার মনে দেখা দেয়—তাই সে চারদিকে চেয়ে দেখে, রঙিন জিনিস ধরতে হাত বাড়ায়, হামাগুড়ি দেয়, চলতে চেষ্টা করে, অস্ফুটস্বরে কত রকম শব্দের অনুকরণ করে। তারপর চার থেকে ছ বছরে—তার কল্পনার অবাধ বিচিত্র গতি দেখা যায়। এই সময়টায় ছেলেদের মন খুবই চঞ্চল থাকে, কোন কিছুতেই মন বসতে চায় না। খেলার ক্ষেত্রে এর পরিচয় পাওয়া যায়। একটা খেলা শেষ হবার আগেই আর একটা নূতন খেলা আরম্ভ হয়ে যায়। এই বয়সে ছেলেকে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে খেলতে না দিলে সে কুনো গণ্ডীর স্বার্থপর হয়ে ওঠে। পাঁচজনের সঙ্গে খেলাধূলায় পরস্পরকে ভালবাসতে শেখে, পরস্পরকে সাহায্য করতে শেখে, নিজের স্বার্থ দূরে রাখতে শেখে। ছয় থেকে দশ বৎসরে খেলার রূপ আবার বদলে যায়। এ বয়সে ছেলেরা নিয়ম মেনে খেলতে পারে। এ সময় তাদের খেলার জায়গা হয়—বাড়ির উঠান বা মাঠ কিম্বা কোন খোলা জায়গা। বাইরের খেলা ছাড়া, তারা ছবি আঁকা, ঘর সাজানো, গান গাওয়া, গল্প শোনা, মজার জিনিস সংগ্রহ করা ইত্যাদিতে বিশেষ উৎসাহ দেখায়। এই সব খেলার প্রতি লক্ষ্য রাখলে শিশু-প্রকৃতি সহজেই বুঝতে পারা যায়।

ছেলেদের মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া উচিত। পাহাড়ে জঙ্গলে, নদীর ধারে, খোলা মাঠে নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর চোখ রেখে তাদের অবাধে ঘুরতে দিতে হয়। তাদের চোখে যা ভাল লাগে তাই তারা সংগ্রহ করবে, এই ভাবে তারা প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করতে ও ভালবাসতে শিখবে।

খেলার ভিতর দিয়ে দেহমনের যে সব শক্তি ফুটে ওঠে, অর পরিচয় নীচে দেওয়া গেল :—

মানসিক শক্তি

পর্য্যবেক্ষণ, মনোযোগ, কর্ম্মতৎপরতা, অনুকরণশক্তি, বোধশক্তি, কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি, নেতৃত্ব, বাক্তিত্ব ও কৌতুকপ্রিয়তা।

নৈতিক গুণ

অধ্যবসায়, শিষ্টাচার, সাহস, ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, সাহচর্য্য ও ন্যায়প্রিয়তা।

ছোট ছেলের মনোজগৎ যে বয়স্ক ব্যক্তির মনোজগৎ নয়, একথা বাপ-মা ও শিক্ষক অনেক সময় ভুলে যান। বাপ-মা মনে করেন, ছেলেমেয়েদের যা বলা হবে, তাই তারা বুঝবে; যা বারণ করা হবে, তাই তারা মনে রাখবে। ছেলেদের বোধ, বিচার, কল্পনা ও স্মরণশক্তির সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকায় তাঁরা অনেক সময় অযথা পীড়ন ও শাসন করেন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যার মানে—ছেলেদের খেলতে দাও। বাপ-মা যদি সে খেলায় যোগ দিতে পারেন—ভালই; যদি না পারেন, তবে ছেলেদের শান্তশিষ্ট, প্রাণহীন করবার ব্রত তাঁরা যেন না নেন। প্রাণ চঞ্চল, তার লক্ষণ নিজেকে বিকাশ করা, নানারূপে উৎসারিত করা।

খেলাধূলা

এবার থেকে মেদিনীপুর জেলায় একটি নূতন ফুটবল-প্রতিযোগিতা চলবে। এর নাম—"ডানকান-সেন-ফুটবল-প্রতিযোগিতা"। জেলার ভিতর এইটিই হবে সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা।

মেদিনীপুর জেলায় অনেকগুলি ছোট বড় ফুটবল-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকলেও বাইরে থেকে নামজাদা দল খেলতে না আসায় এখানকার খেলার 'স্ট্যাণ্ডার্ড' গেছে নেমে। খড়্গপুরে যেঙ্গুল নাগপুর রেলের যে দল

'ডানকান-সেন'-ফুটবল-প্রতিযোগিতা : পরিচালকমণ্ডলী

বাম হইতে দক্ষিণে—মিঃ বি. আর. রায়, মিঃ জে. হার্‌স্রিস, মিঃ এ. ডানকান, মিসেস বি. আর. সেন, মিঃ এ. এম. রবার্টসন, মিঃ বি. আর. সেন, মিঃ জে. ই. টেরি, মিঃ এন. বেচার।

আছে, তারাও ১৯২৯ সালের পর বাইরে গিয়ে কোন বড় প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় নি। এই সব কারণে, বাংলায় ফুটবলের ইতিহাসে মেদিনীপুর জেলা এখনও নিজস্ব স্থান ক'রে নিতে পারে নি। গত বছর বিলাতের কোরিন্থিয়ান দল ভারতে ফুটবল খেলতে এসেছিল। রেলের একটি নির্ব্বাচিত দলের সঙ্গে তাদের খড়্গপুরে খেলা হয়। রেলের দল হেরে গেলেও যে ধরণের খেলা দেখিয়েছিল, তাতে সকলেরই মনে হয়েছিল, যত্ন ও অধ্যবসায় থাকলে এই দলটি টেনিস, হকি ইত্যাদির মত ফুটবল খেলাতেও গৌরবের আসন পেতে পারে। উপযুক্ত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি ক'রে এই সমস্ত দলকে খেলায় উৎসাহ দেবার কথা তখন অনেকেরই মনে হয়েছিল। তারই ফলে "ডানকান-সেন-ফুটবল-প্রতিযোগিতা"র প্রবর্ত্তন।

এই নূতন প্রতিযোগিতার সঙ্গে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের এজেন্ট মিঃ এ. ভি. ডানকান এবং

অ্যাসোসিয়েশন" গ'ড়ে তুলেছেন। "ডানকান-সেন-প্রতিযোগিতা"র ফলে মেদিনীপুর জেলা বাংলার ভিতর একটি প্রথম শ্রেণীর ফুটবল-কেন্দ্রে পরিণত হবে।

এবারের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল ৮ই ডিসেম্বর। এত দেরিতে আরম্ভ হওয়ায় বাইরে থেকে বেশি দল যোগ দিতে পারে নি, তবুও ময়ূরভঞ্জ অ্যাথ্‌লেটিক অ্যাসোসিয়েশন, জামশেদপুর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন, ভিজাগাপটম প্রভৃতি দল খেলতে আসায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ খেলা হয় বি. এন. আরের একটি দলের সঙ্গে 'হিল্‌স ইলেভেন'-এর। শেষের দলটি এক গোলে জিতে যায়। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নী মিসেস সেন এই দুই দলকে ও প্রত্যেক খেলোয়াড়কে শিল্ড, কাপ ইত্যাদি দিয়ে উৎসাহিত করেন।

খড়্গপুরের বর্ত্তমান স্টেশন এক্‌জিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে. ই. টেরি ও উকিল শ্রীযুক্ত বি. এন. রায় এই প্রতিযোগিতাকে সফল ক'রে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রতিযোগিতার পরিচালকগণের ছবি এ সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল।

সঙ্কলন

শ্রীনিকেতন

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হোলো শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্য-চর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।

কর্ম্ম উপলক্ষে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কী রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত-সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজানপথে তাঁদের চেষ্টা চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে, অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।...

আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে অকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিদ্রের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরথ। খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না, কিন্তু বীজবপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয় নি।

বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন-কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা, সে থাকে মাটির নিচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না ব'লেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনী-সন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়? যাই হোক অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করি নি। করলে তার অসম্পূর্ণ নিধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হোত।

কর্ম্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মসূচী আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না। বোধ করি আরম্ভের এই অনির্দিষ্টতাই কবিস্বভাবসুলভ। সৃষ্টির আরম্ভ মাত্রই অব্যক্তের প্রান্তে। অবচেতন থেকে চেতন লোকে অভি-ব্যক্তিই সৃষ্টির স্বভাব। নির্মাণ-কার্যের স্বভাব অন্য রকম। প্ল্যান থেকেই তার আরম্ভ, আর বরাবর সে প্ল্যানের গা ঘেঁষে চলে। একটু এদিক ওদিক করলেই কানে ধ'রে তাকে সায়েস্তা করা হয়। যেখানে প্রাণশক্তির লীলা

সেখানে আমি বিশ্বাস করি স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে। আমার পল্লীর কাজ সেই পথে চলেছে, তাতে সময় লাগে বেশি কিন্তু শিকড় নামে গভীরে।

প্ল্যান ছিল না বটে, কিন্তু দুটো একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলি।...

আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্য-বিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ; এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্পপরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিককালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ-উৎসেরও সেই দশা। সেই জন্যে যে রূপসৃষ্ট মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহেপ্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না—একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে সকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দপ্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি ক'রে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়, তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানাদিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এইরূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোনো একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর ক'রে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তাহলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে এ আমি বিক্রি করব না। এই যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ যার দাম সকল দামের বেশি একে অকেজো ব'লে উপেক্ষা করব কি? এই আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তাহলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। যে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দপ্রকাশে যে অপটু, মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করি নি কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা ব'লে মনে করি নি। আমরা জানি যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চচূড়ায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাটকলায় সৌসাম্যের অপরূপ উৎকর্ষ কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেকে আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর

প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ ক'রে দেখেন। তাঁদের পল্লীসেবার বরাদ্দ কৃপণের মাপে, অর্থাৎ তাঁদের মনে যে পরিমাণ দয়া সে পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। স্বচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজনদরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বণ্টন করা বণিগ্‌বৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়। আমাদের অর্থসামর্থ্যের অভাববশত আমার ইচ্ছাকে কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত করতে পারি নি—তা ছাড়া যাঁরা কর্ম করেন তাঁদেরও মনোবৃত্তিকে ঠিকমতো তৈরি করতে সময় লাগবে। তার পূর্বে হয়তো আমারও সময়ের অবসান হবে, আমি কেবল আমার ইচ্ছা জানিয়ে যেতে পারি।

যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারি, তাঁরা প্রায় ব'লে থাকেন যে আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি-নিতান্ত সংকীর্ণ সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। একথা মনে রাখা উচিত—সত্য প্রতিষ্ঠিত স্থাপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।...

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিচিত্রা'

মেদিনী-পরিচয়

মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গাদি যে সকল দেশের নাম আছে, তথায় মহাভারতোক্ত কীর্ত্তি সকলের পরিচয় পাওয়া যায়। মেদিনীপুরও সে সকল পরিচয় দিতে অসমর্থ নহে। ইহার উত্তর সীমায় বগড়ি (বকডিহি) পরগণার মধ্যে একচক্রা গ্রামে বক রাজার রাজধানী ছিল। প্রবাদ আছে যে, জতুগৃহদাহের পর পঞ্চপাণ্ডব যে বক রাক্ষসকে বিনাশ করেন, তাহা এই স্থানেই ঘটিয়াছিল। এই মেদিনীপুর জেলাতে হংসধ্বজ, তাম্রধ্বজ প্রভৃতি নরপতিগণের রাজধানীও ছিল। তাম্রধ্বজের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাজয় এই মেদিনীপুর জেলাতেই ঘটে। তাহার নিদর্শনস্বরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আজও তমলুক নগরীতে বিরাজমান। কুরুপাঞ্চালীর আরও অনেক ঘটনার সহিত তাম্রলিপ্তের নাম সংশ্লিষ্ট। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায়—সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয়-সমরে—ভীষ্মপর্ব্বে সঞ্জয় কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ জনপদসমূহের নামকীর্ত্তনকালে—কর্ণপর্ব্বে সঙ্কুলযুদ্ধের প্রসঙ্গে—প্রভৃতি অনেক স্থলেই তাম্রলিপ্তের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভাতে লক্ষ্যভেদ উদ্দেশ্যে গমন, রাজসূয়যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া সুসজ্জিত সহস্র হস্তী প্রদান এবং পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ সামান্য অবস্থার পরিচায়ক নহে।

পৌরাণিক কালেও তাম্রলিপ্ত নগরী বিশেষ গণনীয় ছিল। বরনগরী তাম্রলিপ্ত বহু পুরাকাল হইতে একটি প্রথিতনামা তীর্থস্থান বলিয়া হিন্দু-শাস্ত্রীয়-গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত স্থান একটি সিদ্ধপীঠ বলিয়া পরিগণিত। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞে ব্রহ্মার তনয় দক্ষপ্রজাপতিকে নিহত করিলে পর ব্রহ্মহত্যাবশতঃ দক্ষ-শরীর-বিশ্লিষ্ট-মস্তক মহাদেবের পাণি-সংস্পৃষ্ট হইয়া যায়। মহাদেব উহা কোন প্রকারেই স্বীয় করপল্লব হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ না হইয়া, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তীর্থযাত্রায় নিরত হন; কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেও দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্তচ্যুত না হওয়ায় তিনি বিষ্ণুর উপদেশমত তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইয়া বর্গভীমা ও বিষ্ণুনারায়ণের মন্দিরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সরসী-নীরে অবগাহন করিলে দক্ষশিরঃ তাঁহার হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়। পদ্মপুরাণ, মৎসপুরাণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতিতেও তাম্রলিপ্তের নাম দৃষ্ট হয়। দশকুমারচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের নায়ক মিত্রগুপ্তকে

রাজপুত্র ভীমধন্বা এই স্থানেই সাগরে নিক্ষেপ্ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই প্রাচীন সুহ্ম রাজ্যের রাজধানী ছিল।

বৌদ্ধযুগেও মেদিনীপুর উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। এই যুগেই মেদিনীপুরের অধিবাসীবর্গ সুদূর সিংহল ও যবদ্বীপে গিয়াও আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্ত নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বহু বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি ও বহু বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় অন্যতর পরিব্রাজক হিউন-থ্-সঙ্গও এ প্রদেশের শ্রী-সৌভাগ্যের প্রচুর নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সময় তাম্রলিপ্ত হইতে ভারতীয় বণিকগণ ভারতীয় শিল্পজাত ও কৃষিলব্ধ সামগ্রী লইয়া পোতারোহণে সুদূর গ্রীস ও রোম দেশে যাইয়াও বাণিজ্য করিতেন। তখন তাম্রলিপ্তের পাদমূল ধৌত করিয়া সুনীল-সিন্ধু চঞ্চল তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইত, আর সেই বন্দর হইতে সুবৃহৎ অর্ণবযান সকল সুমন্দ পবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্য লইয়া দেশবিদেশে যাত্রা করিত। তাম্রলিপ্তের লবণাম্বু-বেলা বাঙ্গালীর পোতারোহণ-কোলাহলে নিয়ত কলকলায়মান রহিত। বাঙ্গালীর বাণিজ্য-পোত কত দেশের রত্ন-ভাণ্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাম্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠী-সম্প্রদায় শত সৌধচূড়ায় সে. রিভবছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর পুরুষকার ঘোষণা করিত।

বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল, পালবংশীয় রাজগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালী বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত, তখনকার অনেক ঘটনার সহিত মেদিনীপুরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়নাগড়ই ধর্ম্মের অবতার, শাস্ত্রমূর্ত্তি, রণনিপুণ, অমিতসাহস লাউসেনের জন্মভূমি। পঞ্জিকায় কলিযুগের রাজচক্রবর্ত্তীগণের তালিকায় এখনও লাউসেনের নাম দৃষ্ট হয়। লাউসেন গৌড়ঈশ্বরের শ্যালিকা-পুত্র। যখন গৌড়ের ভূপতি অজয়নদের তীরবর্ত্তী ঢেকুর রাজ্যের অধীশ্বর ইছাইঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গৌড়ে পলায়ন করেন, তখন এই লাউসেনই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ ইছাইঘোষের বধসাধন করতঃ গৌড়েশ্বরের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

মেদিনীপুরই উড়িষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের উৎপত্তি-স্থান। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা এ প্রদেশ হইতে যাইয়া উড়িষ্যা জয় করেন। কালক্রমে তাঁহারা উড়িষ্যায় সাতিশয় প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ উৎকলের বহির্ভাগেও অনেক স্থান আপনাদের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে গোদাবরী নদী তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের সীমা-সম্পদীভূত হইয়াছিল। আজ যে উৎকলবাসীরা, একদিন আমাদের রাজ্য গোদাবরী হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহা এই গঙ্গাবংশীয় রাজন্যবর্গের রাজত্বকালেই ঘটিয়াছিল। গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালেই জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়।

মুসলমান অধিকার-সময়ের অনেক ঘটনার সহিতও মেদিনীপুরের নাম সম্মিলিত আছে। মোগল-পাঠানের যে ভীষণ যুদ্ধের পর বাঙ্গালায় মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বিখ্যাত মোগলমারীর যুদ্ধও এই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মোগলমারী নামক স্থানে হইয়াছিল। মারহাট্টাদিগের সহিতও মুসলমানদের অনেক যুদ্ধ এই জেলার বক্ষেই হইয়া গিয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দের স্মরণীয় ঘটনা পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব মীরকাশিমের সহিত সন্ধি অনুসারে বাঙ্গালায় যে তিনটি জেলা সর্ব্বপ্রথম ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়, মেদিনীপুর জেলা তাহার অন্যতম। আবার সমগ্র বঙ্গে যখন ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পর্য্যন্তও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশে হিন্দুরাজত্ব বর্ত্তমান ছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় মারহাট্টা-যুদ্ধের অবসানে ঐ অংশ মারহাট্টাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া ইংরাজাধিকারে আইসে।...

মেদিনীপুরে অনেকগুলি প্রাচীন রাজবংশের বাস আছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ একশত, কেহ দুইশত, কেহ ছয়শত, কেহ তদূর্দ্ধকাল অপ্রতিহতপ্রভাবে স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে এক একটি স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বিলাস-স্রোত

বঙ্গোপসাগরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যখন সমগ্র বঙ্গদেশকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল, তখন সেই স্রোতের মুখে পড়িয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই আজ সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু একদিন তাঁহারাই প্রজাপুঞ্জের ধন-প্রাণরক্ষক ছিলেন। যখন সুদূর দিল্লীতে মুসলমান সম্রাট একজন সুবাদারের হস্তে বাঙ্গালার শাসনভার সমর্পণ করিয়া যুদ্ধবিগ্রহে বা আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিতেন, যখন সেই সুবাদার আবার একজন ফৌজদারের উপরে সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া সুখে মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে নিদ্রা যাইতেন, তখন ঐ সকল জমিদারই এক একটি স্বাধীন রাজার ন্যায় শাসনদণ্ড হস্তে করিয়া প্রজাগণের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রভুত্ব ও পরাক্রমে একদিন সমগ্র নিম্নবঙ্গ সাঁওতাল, কোল, মাঝি, চুয়াড়, খয়রা প্রভৃতি অসভ্য জঙ্গলী জাতিদিগের অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

মেদিনীপুরই শক্তিসম্পন্ন আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের দক্ষিণাপথ গমনের দ্বার ছিল। মেদিনীপুরেই সিংহল, সুমাত্রা প্রভৃতি ভারতসাগরের প্লাবমান দ্বীপপুঞ্জে এবং বর্ম্মা ও চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিবার একমাত্র বন্দর ছিল। খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রকূলবর্ত্তী একটী প্রধান বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। পালি ভাষায় লিখিত মহাবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, খৃঃ পূঃ ৩১০ অব্দে 'তমোলুক' বন্দর হইতেই অর্ণবপোতে বুদ্ধগয়া হইতে আনীত বৌদ্ধদিগের আরাধ্য মহাবোধিদ্রুমের শাখা সিংহলে প্রেরিত হয়। প্রবাদ আছে যে, খৃঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে শাক্যসিংহের দেহাবসান হইলে তাঁহার একটি দন্ত পাটলীপুত্র নগর হইতে আনীত হইয়া দন্তপুর নগরে প্রথমে রক্ষিত হয়, তৎপরে তাম্রলিপ্ত হইতে সমুদ্রযানে সিংহলে নীত হয়। অনেকানেক দেশীয় ও বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতুন নগরই, মহাবংশের দন্তপুরী। মগধ হইতে আসিতে হইলে তৎকালে দাঁতুন হইয়া তাম্রলিপ্ত যাওয়াই সুবিধাজনক ছিল। ইহা সমুদ্রযাত্রিগণের একটী বিশ্রাম-স্থান ছিল। এক সময় দাঁতুন যে বৈদিক ও বৌদ্ধদিগের পবিত্র স্থান ছিল, অদ্যাপি তাহার প্রভূত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জেলার মধ্য দিয়া উৎকল গমনের একটী প্রকৃষ্ট পথ বহুকাল ধরিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৫১০ অব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন নীলাচলে জগন্নাথদেবের দর্শনার্থ সশিষ্যে উৎকল গমন করেন, তখন তিনিও এই মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়াই গিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেব এই মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, দাঁতুন, জলেশ্বর প্রভৃতি নগরের মধ্য দিয়া পুরী গমন করিয়াছিলেন। জয়ানন্দ মিশ্রও লিখিয়াছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবনদ পার হৈঞা
উত্তরিলা তাম্রলিপ্তে সেয়াখালা দিঞা।"

অন্যত্র,

"দাঁতন, জলেশ্বর পার হঞা
উত্তরিলা আসরদাঁতে—।"

কবিবর ভারতচন্দ্র সম্রাট্ আকবর সাহের বিখ্যাত সেনাপতি রাজা মানসিংহের উড়িষ্যা গমনোপলক্ষে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতেও এ পথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়:—

"এড়ায়ে মেদিনীপুর নারায়ণগড়ে
দাঁতন এড়ায়ে ডেরা জলেশ্বরে পড়ে।"

সম্রাট সাজাহানও এই পথে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত থাকায় ইহা ঐতিহাসিক ও জনশ্রুতি-মূলক নানা উপন্যাস সম্বলিত প্রাচীন গড়, দেবালয়, সুবৃহৎ বাপী প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তিরাশিতে পরিপূর্ণ। সকল কীর্ত্তিরাশির অধিকাংশই আজ কালের বিরাট কবলে পতিত হইলেও মেদিনীপুরের বিজন পল্লী ও নদী-সৈকত এখনও শত শত প্রাচীন কীর্ত্তির দগ্ধ-অস্থি-ভস্ম বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। নয়াগ্রামের খেলার গড়, গোপীবল্লভপুরের চন্দ্ররেখা গড়, কেশিয়াড়ীর করমবেড়ীয়া দুর্গ, কিয়ারচাঁদ প্রান্তরের সহস্রাধিক প্রস্তরস্তম্ভ, 'তমোলুক'র বর্গভীমা দেবীর মন্দির, দাঁতুনের শ্যামলেশ্বরের মন্দির, গড়বেতার সর্ব্বমঙ্গলা ও মহাদেবের মন্দির, কর্ণগড়ের দণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার মন্দির এবং কাঞ্চনপুর ও নারায়ণগড়ের মস্‌জিদ দুইটী এখনও লোক-লোচনের বিস্ময় বিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই জেলার অন্তর্গত দাঁতুন নগরের অনতিদূরে

"সরশঙ্কা" নামক যে সুবৃহৎ সরোবরটী স্বচ্ছ দর্পণ-খণ্ডের ন্যায় বিশাল বক্ষঃ বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে, উহা আয়তনে বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি অপেক্ষা 'সরশঙ্কা' অনেক বৃহৎ ও রমণীয়।

শিল্প ও বাণিজ্যাদি বিষয়েও মেদিনীপুরের গৌরব কম নহে। গঙ্গাবংশীয় রাজগণ যখন এ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, তখন তমোলুকে জাহাজ নির্ম্মাণ হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেদিনীপুরের মাদুর ও রেশমের বস্ত্র একদিন দেশবিদেশে সমাদৃত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার বস্ত্র, খড়ারের কাঁসা ও পিত্তলের বাসন, কেশিয়াড়ীর তসর, ঘাঁটালের গরদ, নাড়াজোল ও কাশীজোড়ার মাদুর এখনও সুপ্রসিদ্ধ। ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে এ প্রদেশ লবণ-কারবারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তৎকালে ফোর্ট উইলিয়মের অন্তর্গত সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যত লবণ উৎপন্ন হইত, তাহার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লবণ কেবল হিজলীতেই উৎপন্ন হইত। কাশ্মীরী, শিখ, মুলতানী, ভাটীয়া প্রভৃতি নানাদেশের ব্যবসায়ীগণ এই প্রদেশ হইতে লবণ লইতে আসিত। মেদিনীপুরের জঙ্গল-মহল হইতে শাল, পিয়াশাল, আবলুশ আদি কাঠ, নানাপ্রকার পশুচর্ম্ম, পাখীর পালক, হরিণের শিং, মোম, মধু, গালা ইত্যাদি কত প্রকার দ্রব্যাদি এখনও কত দেশদেশান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইতেছে।

মেদিনীপুরের সন্তানভাগ্যও অতিমাত্রায় সমুজ্জ্বল। মেদিনীপুর জ্ঞানচর্চ্চা ও শিক্ষায় উন্নতি সম্বন্ধে বাঙ্গালার অন্যান্য জেলার পশ্চাতে পড়িয়া নাই। এই জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কারস্বরূপ, নানাশাস্ত্র-বিশারদ, বহু বিদ্বান ও চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্মভূমি। মেদিনীপুর অনেক ধার্ম্মিক ও সুকৃতি সন্তানও প্রসব করিয়াছে।

"দানে চন্দু, অন্নে মান্দু, রঙ্গে রাজনারায়ণ।
বিত্তে ছক্কু, কীর্ত্তে নরু, রাজা যাদবরাম॥"

প্রভৃতি মহাত্মাগণও এই মেদিনীপুর জেলারই অধিবাসী। খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থানও এই মেদিনীপুর। এই অতুল সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াই আজ মেদিনীপুর সমগ্র ভারতে একটী উচ্চস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।...

—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু 'মেদিনীবাসী'

সম্পাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম
মেদিনীপুর জেলা-পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৪।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পল্লী-শ্রী

১ম বর্ষ] পৌষ, ১৩৪৫ [৮ম সংখ্যা

বাংলা সাময়িক-পত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এদেশে বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এই সময় হইতে ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত (১৮৬৭'র শেষভাগ হইতে 'ক্যালকাটা গেজেটে' নূতন পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তকের নামধাম নিয়মিত ভাবে বাহির হইতে থাকে) বাংলায় মুদ্রিত সাময়িক-পত্রের একখানি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে আমার মনে ছিল। বিষয়টি অবশ্য নূতন নয়, এবং এসম্বন্ধে পুস্তক-প্রবন্ধাদির অভাবও নাই। কিন্তু এই সকল রচনায় যথার্থোগ্য অনুসন্ধানের অভাব লক্ষিত হয়। এই কারণে বাংলা সাময়িক-পত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থের অভাব অনেক সময়ে অনুভব করিয়াছি। সেই অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার অভিপ্রায়ে কয়েক বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে আমি যে-সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার সাহায্যে 'বাংলা সাময়িক-পত্র' নামে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছি; তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। শুধু ১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত যে-সকল বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রকাশকাল-সমেত সেগুলির একটি তালিকা বর্ত্তমান প্রবন্ধে মুদ্রিত হইল। এই তালিকায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা বিচিত্র নহে; কেহ যেন ইহাকে চূড়ান্ত বলিয়া মনে না করেন; কারণ এমন অনেক পত্র-পত্রিকা আছে, যাহা আমি নিজে দেখি নাই,—উল্লেখমাত্র পাইয়াছি।

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
১৮১৮			
এপ্রিল	দিগ্দর্শন (মাসিক)	জে. সি. মার্শম্যান।	প্রথম বাংলা মাসিক পত্র।
২৩ মে	সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক...)	ঐ	প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক প্রচারিত।
? জুন	বাঙ্গাল গেজেটি (সাপ্তাহিক)	হরচন্দ্র রায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য।	বাঙালী-পরিচালিত, এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।
১৮১৯			
ডিসেম্বর	গস্পেল মাগাজীন (মাসিক)		খ্রীষ্টতত্ত্ব বিষয়ে প্রথম মাসিক পত্র।
১৮২১			
সেপ্টেম্বর?	ব্রাহ্মণ সেবধি	'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা'র নামে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রচারিত।	

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
৪ ডিসেম্বর	সম্বাদ কৌমুদী (সাপ্তাহিক…)	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম ১৩ সংখ্যা)।…	রামমোহন রায়ই কার্য্যতঃ ইহা পরিচালনা করিতেন।
১৮২২			
ফেব্রুয়ারি	পশ্বাবলী (মাসিক)	লসন ও পীয়ার্স। পরে রামচন্দ্র মিত্র।	প্রত্যেক সংখ্যায় এক-একটি জন্তুর বিবরণ, এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই জন্তুর কাঠ-খোদাই চিত্র থাকিত।
৫ মার্চ	সমাচার চন্দ্রিকা (সাপ্তাহিক…)	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্র।
মে	খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি (মাসিক)		শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত।
১৮২৩			
অক্টোবর	সম্বাদ তিমিরনাশক (সাপ্তাহিক…)	কৃষ্ণমোহন দাস।	
১৮২৯			
৯ মে	বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক)	নীলরত্ন হালদার।	রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কিছু দিন ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন।
১৮৩০			
জুন	শাস্ত্রপ্রকাশঃ (সাপ্তাহিক)	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার।	ইহাতে কেবল শাস্ত্রীয় আলোচনা স্থান পাইত।
১৮৩১			
২৮ জানুয়ারি	সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক…)	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।	১৪ জুন ১৮৩৯ তারিখ হইতে দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।
২৩ ফেব্রুয়ারি	সম্বাদ সুধাকর (সাপ্তাহিক)	প্রেমচাঁদ রায়।	
৭ মার্চ	সমাচার সভারাজেন্দ্র (সাপ্তাহিক)	শেখ আলীমুল্লা।	মুসলমান-পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।
১৮ জুন	জ্ঞানান্বেষণ (সাপ্তাহিক)	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পরে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রভৃতি।	ইংরেজী শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র। ১৮৩৩ সনের জানুয়ারি মাসে ইহা দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্র হয়।
আগস্ট	অনুবাদিকা (সাপ্তাহিক)		
২২ আগস্ট	সম্বাদ রত্নাকর (সাপ্তাহিক)		
২৯ সেপ্টেম্বর	সম্বাদ সারসংগ্রহ (সাপ্তাহিক)		দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্র।
ডিসেম্বর ?	জ্ঞানোদয় (মাসিক)	রামচন্দ্র মিত্র।	

'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান

[কোল্‌ওয়ার্ল গ্রাণ্ট অঙ্কিত চিত্র হইতে]

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
১৮৩২			
এপ্রিল	বিজ্ঞানসেবধি (মাসিক)	অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ।	
?	দলবৃত্তান্ত		ইহাতে সামাজিক দলাদলির সংবাদ থাকিত।
২৪ জুলাই	সংবাদরত্নাবলী (সাপ্তাহিক)	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।	
?	জ্ঞানসিন্ধুতরঙ্গ (মাসিক)	রসিককৃষ্ণ মল্লিক।	
১৮৩৩			
সেপ্টেম্বর	বিজ্ঞানসারসংগ্রহ (পাক্ষিক···)	ডবলিউ এম উলেস্টন্, নবকুমার চক্রবর্ত্তী ও গঙ্গাচরণ সেনগুপ্ত।	দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্র।
?	চার আনা পত্রিকা		
১৮৩৪			
?	বৃত্তান্ত বাহক		
১৮৩৫			
১০ জুন	সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (মাসিক ···)	হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে উদয়চন্দ্র আঢ্য, অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য, প্রভৃতি।	
সেপ্টেম্বর	ভক্তিসূচক (সাপ্তাহিক)		
১৮৩৭			
১৩ এপ্রিল	সম্বাদ সুধাসিন্ধু (সাপ্তাহিক)	কালীশঙ্কর দত্ত।	
ডিসেম্বর	সম্বাদ গুণাকর (দ্বিসাপ্তাহিক)	গিরিশচন্দ্র বসু।	
১৮৩৮			
ডিসেম্বর ?	সংবাদ দিবাকর (সাপ্তাহিক)	গঙ্গানারায়ণ বসু।	
ডিসেম্বর	সংবাদ সৌদামিনী (সাপ্তাহিক)	কালাচাঁদ দত্ত।	দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্র।
?	সংবাদ মৃত্যুঞ্জয় (সাপ্তাহিক)	পার্ব্বতীচরণ দাস।	ইহার সম্পাদকীয়, সংবাদ, এমন কি বিজ্ঞাপনও কবিতায় রচিত।
১৮৩৯			
মার্চ	সংবাদ ভাস্কর (সাপ্তাহিক···)	শ্রীনাথ রায় ও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।	
২৯ নবেম্বর	সম্বাদ রসরাজ (সাপ্তাহিক)	কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্তু কার্য্যতঃ পরিচালক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।	

সমাচার দর্পণ।

১ সংখ্যা] শনিবার। ২৩ মে সন ১৮১৮। ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫।

সমাচার দর্পণ।

কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাসং ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু যে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাসং ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরীবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।—

এই সমাচারের পত্র প্রতিসপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্টর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মীয় ফেরদের নিয়োগ।—

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যে নূতন আইন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংগ্লণ্ড ও ইওরোপের অন্যং প্রদেশহইতে যে নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইওরোপ দেশীয় লোককর্ত্তৃক যে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তকহইতে ছাপান যাইবে এবং যে নূতন পুস্তক মাসে ইংগ্লণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও আলবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

মমলা বিক্রয়ের ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে ৮ জুন সোমবার সাড়ে দশ ঘড়ীর সময় কোম্পানির পুরাণা কুঠীর মধ্যে আতাবাটীতে মোকাম বান্দা আম দানী মমলা তাহাত সুরবয়া ও যেনজেন আইসে তাহা নিলাম বিক্রয় হইবেক নীচে দফাওআরী লিখিতে মতে জানিবা।

বান্দা আয়ুফল প্রথম রকম	৭৫০০ পোন
দ্বিতে দোসরা রকম	৭৫০০
মাদা — নীরস	১০০১
এমবোয়ানা আয়ুফল মোমামেতে	৮০
বান্দা তৈরী প্রথম রকম	১০০০০
মাদা নীরস	১৭১
এমবোয়ানা নীরস	১৪১

২ দফা এক টাকা ফিলাট বায়লো ও আমানত ফিশত ১০ দশ টাকার ওপর দিতে হইবেক নিলামের সময় মাতবরির কারণ তাহাতে কোন কসুরি করে তবে ঐ লাট পুনরায় বিক্রয় হইবেক ক্রয় করিতে কোন নোকসান হয় তাহা প্রথম খরিদারকে দিতে হইবেক মুনাফা হইলে কোম্পানির হইবেক।—

৩ তিন দফা ইস্তক নিলামের তারিখ লাগাইদ এক মাহার মধ্যে মমলা খরিদের বেবাক টাকা দিয়া মাল আলাহ করিয়া লইয়া যাইবেক যদি এই মাফিক না করে তবে ঐ আমানত এবং বায়নার টাকা কোম্পানিতে ওনাগার হইবেক এবং মমলা নগদ টাকায় পুনরায় বিক্রয় হইবেক বিক্রয় করিতে যে নোকসান হইবেক এবং বাজে

প্রথম বাংলা সংবাদ-পত্র 'সমাচার দর্পণে'র

প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
?	সংবাদ অরুণোদয় (দৈনিক)	জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।	
১৮৪০			
১০ মে	মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী (সাপ্তাহিক)	গুরুদয়াল চৌধুরী।	শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণে'র কথা ছাড়িয়া দিলে, ইহাই মফস্বলের প্রথম সংবাদপত্র। কাসিমবাজার-রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আনুকূল্যে প্রকাশিত।
মে	সংবাদ সুজনরঞ্জন (সাপ্তাহিক)	হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়।	
জুন	আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ (মাসিক)	শ্রীনারায়ণ রায়।	আয়ুর্ব্বেদ-সংক্রান্ত প্রথম মাসিক পত্র।
১ জুলাই	গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্ (সাপ্তাহিক)	জে. সি. মার্শম্যান। পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।	গবর্মেণ্টের আইনকানুনের বঙ্গানুবাদ ইহাতে স্থান পাইত।
?	জ্ঞানদীপিকা (সাপ্তাহিক)	ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।	
১৮৪১			
?	সংবাদ ভারতবন্ধু (সাপ্তাহিক)	শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	
?	সংবাদ নিশাকর (সাপ্তাহিক)	নীলকমল দাস।	
১৮৪২			
এপ্রিল	বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর (মাসিক···)	রামগোপাল ঘোষ প্যারীচাঁদ মিত্র।	দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্র।
জুন	বিদ্যাদর্শন (মাসিক)	অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ।	
?	সংবাদ ভৃঙ্গদূত (সাপ্তাহিক)	নীলকমল দাস।	
১৮৪৩			
জানুয়ারি	মঙ্গলোপাখ্যান পত্র (মাসিক)	জে. রবিনসন।	দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্র।
১৬ আগষ্ট	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (মাসিক)	অক্ষয়কুমার দত্ত।···	তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র।
১৮৪৪			
১৭ জুলাই	কায়স্থ কৌস্তুভ	রাজনারায়ণ মিত্র।	কায়স্থ-উৎপত্তির বিবরণাদি ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।
?	সর্ব্বরসরঞ্জিনী (সাপ্তাহিক)		
?	সংবাদ রাজরাণী	গঙ্গানারায়ণ বসু।	
?	পক্ষির বিবরণ	রামচন্দ্র মিত্র।	

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
১৮৪৬			
১২ জানুয়ারি	নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা (পাক্ষিক···)	নন্দকুমার কবিরত্ন।	হিন্দুধর্ম্মের সপক্ষতা করিবার জন্য ইহার আবির্ভাব।
১১ জুন	জগদুদ্দীপক ভাস্কর (সাপ্তাহিক)	মৌলবী ফরিদুদ্দীন।	মুসলমান-পরিচালিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। ইহাতে ফার্সী, হিন্দী, ইংরেজী, বাংলা ও উর্দ্দু এই পাঁচটি ভাষার রচনা থাকিত।
২০ জুন	পাষণ্ডপীড়ন (সাপ্তাহিক)	সীতানাথ ঘোষ।	কার্য্যতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন।
আগস্ট	সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা (মাসিক)	শ্যামাচরণ বসু।	সত্যসঞ্চারিণী সভা নামে বেদান্ত সভার মুখপত্র।
১৭ অক্টোবর	সমাচার জ্ঞানদর্পণ (সাপ্তাহিক)	উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য।	
?	জগদ্বন্ধু (মাসিক)	সীতানাথ ঘোষ।	
১৮৪৭			
জানুয়ারি	উপদেশক (মাসিক)	পাদরি জে. ওয়েঙ্গার।	
৯ ফেব্রুয়ারি	দুর্জ্জন দমন মহানবমী (মাসিক···)	মথুরামোহন দাসগুহ, পরে ঠাকুরদাস বসু।	
১৫ এপ্রিল	সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন (সাপ্তাহিক)	চৈতন্যচরণ অধিকারী।	দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্রিকা।
? মে	হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয় (মাসিক)	হরিনারায়ণ গোস্বামী।	
১৬ জুন	সংবাদ কাব্যরত্নাকর (সাপ্তাহিক)	ভারত ভট্টাচার্য্য।	উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যই ইহার প্রকৃত সম্পাদক।
? আগস্ট	হিন্দুবন্ধু (মাসিক)	উমাচরণ ভদ্র।	
? সেপ্টেম্বর	জ্ঞানসঞ্চারিণী (মাসিক ?)	গঙ্গানারায়ণ বসু।	
? সেপ্টেম্বর	রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক)	গুরুচরণ রায়, পরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।	রংপুরের প্রথম সংবাদপত্র। রংপুর কুণ্ডী পরগণার ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর আনুকূল্যে প্রকাশিত।
? সেপ্টেম্বর	সংবাদ সাধুরঞ্জন (সাপ্তাহিক)	নবকৃষ্ণ রায়।	প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই ইহার সম্পাদক। ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে ইহার প্রচার রহিত হয়।
? ডিসেম্বর	সংবাদ সুজনবন্ধু (সাপ্তাহিক)	নবীনচন্দ্র দে।	রাধাচরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক ১৮৫০ সনের গোড়ায় পুনঃপ্রকাশিত।
? ডিসেম্বর	সংবাদ দিগ্বিজয় (সাপ্তাহিক)	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।	
? ডিসেম্বর	সংবাদ মনোরঞ্জন (সাপ্তাহিক)	গোপালচন্দ্র দে।	
? ডিসেম্বর	আক্কেলগুড়ুম (সাপ্তাহিক ?)	ব্রজনাথ বন্ধু।	দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্রিকা।

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
১৮৪৮			
জুন	সংবাদ রত্নবর্ষণ (পাক্ষিক)	মাধবচন্দ্র ঘোষ।	
?	সংবাদ মুক্তাবলী (সাপ্তাহিক)	কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য।	"গঙ্গার পশ্চিম পার শিবপুর গ্রাম হইতে" প্রকাশিত।
১৭ সেপ্টেম্বর	সংবাদ অরুণোদয় (সাপ্তাহিক)	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।	
? অক্টোবর	সংবাদ কৌস্তুভ (সাপ্তাহিক)	মহেশচন্দ্র ঘোষ।	
?	জ্ঞানচন্দ্রোদয় (মাসিক ?)	রাধানাথ বসু।	
?	সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর (সাপ্তাহিক)	বিশ্বম্ভর কর।	
?	সংবাদ দিনমণি (সাপ্তাহিক)	শম্ভুচন্দ্র মিত্র।	
১৮৪৯			
মার্চ	সংবাদ রসসাগর (সাপ্তাহিক···) (পরে 'সংবাদ সাগর')	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।	১৫ জুলাই ১৮৫০ তারিখে ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যু হইলে রঙ্গলাল সম্পাদক হন। ১৮৫২ সনের এপ্রিল মাস হইতে কাগজখানির নামকরণ হয় 'সংবাদ সাগর'।
২ মে	বারাণসী চন্দ্রোদয় (সাপ্তাহিক)	উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য।	কাশী হইতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ; লিথোয় মুদ্রিত।
জুন	সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা (মাসিক)	গোবিন্দচন্দ্র দে।	
? জুলাই	সংবাদ রসমুদ্গার (সাপ্তাহিক)	গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের প্রতিকূলতাচরণ করিবার জন্য ইহার আবির্ভাব।
আগস্ট	কৌস্তুভ কিরণ (মাসিক)	ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী।	
? সেপ্টেম্বর	মহাজনদর্পণ (দৈনিক)।	জয়কালী বসু।	"দ্রব্যমূল্যের পত্রিকা"।
? নবেম্বর	ভৈরবদণ্ড (সাপ্তাহিক)	উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য।	কাশীতে লিথোয় মুদ্রিত হইত। 'সংবাদ রসমুদ্গারে'র বিপক্ষতা করিবার জন্য ইহার আবির্ভাব।
? ডিসেম্বর	সংবাদ সজ্জনরঞ্জন (সাপ্তাহিক···)	গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত।	১৮৬১ সনের জুন মাসে বারত্রয়িক-রূপে পুনঃপ্রকাশিত।
? ডিসেম্বর	সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রস্রায়িনী (সাপ্তাহিক···)	বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।	
? ডিসেম্বর	বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয় (সাপ্তাহিক)	রামতারণ ভট্টাচার্য্য।	
? ডিসেম্বর	সংবাদ রসরত্নাকর (পাক্ষিক)	যদুনাথ পাল।	

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
১৮৫০			
৪ মে	সত্যপ্রদীপ (সাপ্তাহিক)		শ্রীরামপুর হইতে মেরিডিথ টাউনসেণ্ড কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
? জুন	দূরবীক্ষণিকা (মাসিক)		খিদিরপুর-নিবাসী দ্বারকানাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
? জুন	ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা (মাসিক)		কোন্নগর ধর্ম্মসভার মুখপত্র।
জুলাই	সত্যার্ণব (মাসিক)	পাদরি জে. লং।	
আগস্ট	সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা (মাসিক)	মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক প্রধানতঃ পরিচালিত।
সেপ্টেম্বর	সংবাদ সুধাংশু (সাপ্তাহিক)	কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।	
সেপ্টেম্বর	সংবাদ বর্দ্ধমান (সাপ্তাহিক)	কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।	বর্দ্ধমান-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত।
১৮৫১			
১৪ মে	জ্ঞানদর্শন (পাক্ষিক)	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়।	
১ জুন	কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা (পাক্ষিক···)	কাশীদাস মিত্র।	কাশীতে লিথোয় মুদ্রিত হইত।
৭ জুন	সংবাদ জ্ঞানোদয় (সাপ্তাহিক)	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।	১৮৫৫ সনের জানুয়ারি মাসে হরিহর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পুনঃপ্রকাশিত।
? জুলাই	মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ (মাসিক)		দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্র। মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র। মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ. ভি. বেলীর আনুকূল্যে প্রকাশিত।
অক্টোবর	বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ (মাসিক)	রাজেন্দ্রলাল মিত্র।	ইহাই পূরাদস্তুর প্রথম সচিত্র মাসিকপত্র।
১৮৫২			
৩১ জানুয়ারি	জ্ঞানারুণোদয় (মাসিক)	কালিদাস মৈত্র যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।	শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত বাঙালী-পরিচালিত প্রথম সাময়িক-পত্র। চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে ইহা প্রকাশিত হইত।
১৫ জুন	সংবাদ বিভাকর (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক)	মনোমোহন বসু।	
৬ জুলাই	সংবাদ শশধর (সাপ্তাহিক)	কালিদাস মৈত্র।	শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
?	বিশ্ববিলোকন (সাপ্তাহিক ?)		
	[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, তারাচাঁদ সিকদার 'বিদ্যারত্ন' নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। ইহার প্রকাশকাল এখনও জানা যায় নাই।]		
১৮৫৩			
ফেব্রুয়ারি	ধর্ম্মরাজ (মাসিক)	তারকনাথ দত্ত।	
? এপ্রিল	বিদ্যাদর্পণ (মাসিক)	প্রিয়মাধব বসু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।	
? মে	.....? (মাসিক)		ইহা বিভাকর যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল; নাম জানা যায় নাই।
জুলাই	সুলভ পত্রিকা (মাসিক)	দ্বারকানাথ রায়।	
? অক্টোবর	ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা (মাসিক)		
? নবেম্বর	পাষণ্ডদলন (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক)		
?	চিকিৎসা রত্নাকর (মাসিক)	হলধর সেন।	আয়ুর্ব্বেদ-বিষয়ক পত্রিকা।
১৮৫৪			
জানুয়ারি	রসার্ণব (মাসিক)	রাধামাধব মিত্র।	
২৭ ফেব্রুয়ারি	সংবাদ দিনকর (সাপ্তাহিক)	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	
জুন	সমাচার সুধাবর্ষণ (দৈনিক)	শ্যামসুন্দর সেন।	দ্বিভাষিক (বাংলা ও হিন্দী) পত্র। ইহাই প্রথম হিন্দী দৈনিক পত্র।
আগস্ট	মাসিক পত্রিকা (মাসিক)	প্যারীচাঁদ মিত্র রাধানাথ সিকদার।	মহিলা-পাঠ্য প্রথম মাসিক পত্রিকা।
নবেম্বর	প্রকৃত মুদ্গর (মাসিক)		'মাসিক পত্রে'র প্রতিকূলতাচরণ করিবার জন্য আবির্ভাব।
১৮৫৫			
মার্চ	সিদ্ধান্ত দর্পণ (মাসিক)	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।	
২০ এপ্রিল	বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (মাসিক)	কালীপ্রসন্ন সিংহ।	বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার মুখপত্র।
? মে	সুর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র (মাসিক)	অদ্বৈতচরণ আঢ্য।	
? মে	জ্ঞানবোধিনী (সাপ্তাহিক)		
? মে	বঙ্গ বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক)	হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	
? সেপ্টেম্বর	বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা (মাসিক···)	নবীনচন্দ্র আঢ্য (?)।	

ক্রমশ

উল্কা

আমরা দেখেছি রাত্রে আকাশ থেকে তারা খ'সে পড়তে। চারিদিক আলোয় আলো হয়ে যায়। আমরা ভাবি, এ এক অমঙ্গল। এ কিন্তু তারকাপাত নয়—উল্কাপাত। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারদিকে নিরন্তর ঘুরছে, তেমনই অনেক গ্রহ-উপগ্রহের মত এই সব উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বাইরে আপন-আপন পথে অত্যন্ত বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে যখন এগুলি পৃথিবীর নিকটে আসে, তখন পৃথিবী করে তাদের আকর্ষণ। পৃথিবীর বায়ুর স্পর্শ লেগে এদের গতি যায় ক'মে এবং বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় জ্ব'লে উঠে এরা প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে গিয়ে মাটিতে পড়ে। ছোট ছোট উল্কাপিণ্ড আকাশেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উল্কাপিণ্ড যখন ভূপৃষ্ঠে খ'সে পড়ে, তখন তার উজ্জ্বল শিখা ৫ মিনিট থেকে ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত দেখা যায়। এর গতি মিনিটে ৮০০ থেকে ৯০০ মাইল। কখনও কখনও এই গতি গড়ে মিনিটে ১২০০০ মাইল পর্য্যন্ত উঠেছে। রাত্রিতেই যে উল্কাপাত হয় এমন নয়, দিনের বেলাতেও এরূপ হতে দেখা গেছে; তবে সূর্য্যের আলো অত্যন্ত প্রখর ব'লে দিনের বেলায় উল্কাপাত হ'লে তার আলো দেখা যায় না। শ্রাবণ ও কার্ত্তিক মাসের শেষে এই সব উল্কাপিণ্ড ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর অত্যন্ত কাছে এসে পড়ে, তাই এই সময় সাধারণত বেশির ভাগ উল্কাপাত চোখে পড়ে।

এক একটি উল্কার ওজন সামান্য এক আধ সের থেকে বিশ পঁচিশ মণ বা তারও বেশি হতে দেখা গেছে। উল্কাপিণ্ডকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে যে, এতে লৌহ, গন্ধক, তাম্র, টিন, নিকেল, ফস্‌ফরাস, কার্বন, অম্লজান, সিলিকম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরিন প্রভৃতি অনেক উপকরণ রয়েছে। কখনও কখনও প্ল্যাটিনাম, হীরক, ইরিডিয়াম, স্বর্ণ প্রভৃতি পদার্থও থাকতে দেখা গেছে। তবে প্রত্যেক উল্কাপিণ্ডেই যে ঐ সকল জিনিস মিশিয়ে থাকে এমন নয়। কোন কোনটিতে লৌহ ছাড়া আর কোন পদার্থই পাওয়া যায় নি।

দেড়শো বছর আগে উল্কার কথা পৃথিবীর লোকের কাছে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। অতি প্রাচীনকালে লোকে উল্কাপিণ্ড থেকে লৌহ সংগ্রহ ক'রে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত, কেউ বা সখ ক'রে ঘরের ভিতর ঝুলিয়ে রাখত। কলকাতার যাদুঘরে প্রায় ছ-সাতশো ছোট বড় উল্কাপিণ্ড সংগৃহীত আছে।

পৃথিবীর অনেক জায়গায় উল্কাপাত হয়েছে, তার অনেক বিবরণও পাওয়া যায়। চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে রুশিয়ার মরু-প্রান্তরে একবার প্রকাণ্ড উল্কাপাত হয়েছিল, তাতে নাকি হাজার মাইল দূর থেকেও তার প্রজ্বলিত শিখা দেখা গেছল। আগুন নিবে গেলে দেখা যায় যে, পাথরের স্তূপে সমস্ত ভূমিটাই ঢেকে গেছে আর সেইখানে বড় বড় গহ্বর হয়ে গেছে।

অনন্ত আকাশের রহস্য মানুষকে স্তব্ধ ক'রে দেয়। মানুষ নিরন্তর চেষ্টা করছে সে রহস্যের সন্ধান নিতে।

আনন্দপুর

শ্রীঅনন্তচন্দ্র বাগ

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর থানায় আনন্দপুর একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহার পূর্ব্ব-শ্রী এখন অনেকাংশে লুপ্ত হইলেও এখনও গ্রামটির নাম সমস্ত জেলায় সুপরিচিত। কত প্রাচীন কাহিনী ইহার সহিত জড়িত হইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'পল্লী-শ্রী'র পাঠক-বর্গের নিকট গ্রামটির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

মোগল-সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বকালে তাঁহার দেওয়ান রাজা তোড়লমল ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজস্ব-সচিবের পদে নিযুক্ত থাকিয়া যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জরিপ ও রাজস্ব নির্দ্ধারণ করেন, তখন সুবা-বাংলাকে কয়েকটি মহাল ও সরকারে বিভক্ত করা হয়। তাঁহার পরবর্ত্তী সুবেদারদিগের সময়ে ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে এক একটি মহাল পৃথক পৃথক পরগণায় পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি সুবা-বাংলাকে ১৩টি চাক্‌লায় ও বহুসংখ্যক পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রাচীন দলিলপত্র হইতে জানা যায় যে, আনন্দপুর মৌজা চাক্‌লা মেদিনীপুরের উত্তর-সীমান্তবর্ত্তী ও ভঞ্জভূম পরগণার অন্তর্গত ছিল এবং ইহার উত্তর সীমায় তমাল নদীর পরপারে ব্রাহ্মণভূম পরগণা হইতে চাক্‌লা বর্দ্ধমানের সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। পরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণভূম পরগণা চাক্‌লা মেদিনীপুরের অন্তর্গত হয়।

ঐতিহাসিক বিবরণ

এই গ্রামে যে সকল ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, কোন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক আনন্দপুরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং এখানে এক স্বাধীন রাজা বাস করিতেন। কালক্রমে কর্ণগড় রাজবংশের অভ্যুদয়ের সময় ইহা হীনাবস্থায় পতিত হইয়া কর্ণগড়ের করদরাজ্যরূপে পরিণত হয়। এই রাজ্যের পশ্চিম সীমায় ছিল রাজা জমাদার সিংহ ও অভয় সিংহের রাজ্য—গোদা-পিয়াশাল; দক্ষিণ সীমায় কাঁচাগেড়্যা বা কাঁচাগড়, উত্তরে তমাল নদীর পরপারে তৎকালীন বিষ্ণুপুরাধিপতির রাজ্য—দাড়া ও পদম পাটগ্রাম। গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে এখনও উচ্চ মরিচাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বের স্তূপটির তিন শত গজ পূর্ব্বে আর একটি স্তূপের চিহ্ন দেখা যায়। এই দুইটির মধ্যে গভীর পরিখা ছিল, কালক্রমে তাহা মজিয়া গিয়া কতকাংশ আবাদী জমি ও কতকাংশ শাল-জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিম সীমায় যে প্রাস্তরটি দেখা যায়, সেখানে পূর্ব্বে নিবিড় জঙ্গল ছিল। এই চতুঃসীমার মধ্যে এখানকার রাজা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে গড় খনন করিয়াছিলেন, এখনও তাহার চিহ্ন রহিয়াছে।

এই জেলায় বর্গী, চুয়াড়, পাইক, নায়েক প্রভৃতি দল যে সকল হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়াছিল—আনন্দপুরকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইয়াছে।

বর্গীর হাঙ্গামা

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মহারাষ্ট্র সেনাপতি ভাস্কর রাও নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হন। তিনি মীর হাবিবের পরামর্শে, অনুসরণকারী দলকে প্রতারিত করিয়া চন্দ্রকোণার পথে মেদিনীপুরে আসিয়াছিলেন এবং পলায়নকালে আনন্দপুরের সরল পথ দিয়া গিয়াছিলেন। বর্গীরা সে সময় আনন্দপুরের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিল এবং সমস্ত গ্রামবাসী তাহাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল।

মেদিনীপুর জেলার জঙ্গল-মহালে অসভ্য চুয়াড় জাতি বাস করিত। ইহারা কৃষিকার্য্য করিত না, পশুপক্ষী শিকার ও দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীরকাশিম এক সনন্দ দ্বারা বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েকটি জেলা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদান করেন। কোম্পানি তৎকালে রাজস্ব আদায় করিতেন মাত্র; নবাবের ক্ষমতাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সুযোগে জঙ্গল-মহালের চুয়াড় ও পাইকগণ ব্রাহ্মণভূম, ভঞ্জভূম, বগড়ী, বাহাদুরপুর প্রভৃতি পরগণাতে প্রকাশ্যভাবে নিরীহ প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া অশান্তির সৃষ্টি করে। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি জঙ্গল-মহালে সৈন্য পাঠাইয়া চুয়াড়দলকে দমন করিয়া জমিদারকে রীতিমত রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করিবার সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু সৈন্য সংগ্রহে বিলম্ব হওয়ায় একটি বৎসর কাটিয়া যায়। অবশেষে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ফার্গুসন সসৈন্যে জঙ্গল-মহালে আসেন এবং দেশে শান্তি স্থাপিত হয়।

চুয়াড় হাঙ্গামা

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চুয়াড়গণ পুনরায় দলবদ্ধ হইয়া গোবর্দ্ধন দিবাপতি নামক জনৈক বাগ্দী-সর্দ্দারের নেতৃত্বে ও বরাহভূমের গঙ্গানারায়ণ ভূমিজের সাহায্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। বিদ্রোহীরা প্রথমে শিলদা পরগণায় দুইটি গ্রাম পোড়াইয়া দিয়া ক্রমশ রায়পুর, চন্দ্রকোণা, নারায়ণগড় প্রভৃতি পরগণার প্রজাগণের উপর অবাধে অত্যাচার চালাইতে থাকে এবং বরারামপুর, শালবনি প্রভৃতি স্থানে লুণ্ঠন আরম্ভ করে। উহারা মেদিনীপুর

পরগণায় উপস্থিত হইলে প্রজাগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে থাকে। তৎকালে মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী আবাসগড় ও কর্ণগড়ে চুয়াড়দিগের প্রধান আড্ডা ছিল। যদিও মেদিনীপুর, আনন্দপুর প্রভৃতি স্থানে কোম্পানির সিপাহী ছিল, তথাপি সংখ্যার অল্পতাবশত চুয়াড়দমনে বিলম্ব ঘটেল ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ চুয়াড়গণ আনন্দপুর আক্রমণ করিয়া বহু প্রজা ও কোম্পানির দুইজন সিপাহীর প্রাণনাশ করিলে অবশিষ্ট সিপাহীগণ মেদিনীপুরে পলাইয়া যায়। ২রা এপ্রিল বিদ্রোহীদল দুইবার আনন্দপুর আক্রমণ করিয়া গ্রামটিকে পুড়াইয়া দেয়। ১৬ই মার্চ আনন্দপুর লুণ্ঠন করিয়া বিদ্রোহীদল পরদিন মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু কোম্পানির দেওয়ানের চতুরতায় তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। প্রজাদের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া তদানীন্তন কালেক্টর সাহেব রেভিনিউ বোর্ডে যে বিবরণ দাখিল করেন, তাহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা মেদিনীপুর জেলায় সিপাহী পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। এই সিপাহীদল কর্ণগড় ও আবাসগড় আক্রমণ করে এবং চুয়াড়গণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। জুন মাসে চুয়াড়দলের সমস্ত আড্ডা কোম্পানির অধিকারে আসে। পলায়িত প্রজারা ক্রমশ গৃহে ফিরিয়া চাষ-আবাদের প্রতি মন দেয়।

জঙ্গল-মহালের চুয়াড় হাঙ্গামার দমন হইতে না হইতে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বগড়ী পরগণার নায়েকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানি পাইকগণের জায়গীর জমি বাজেয়াপ্ত করেন এবং উহার আয় পুলিসবিভাগের ব্যয়-নির্ব্বাহে নিয়োজিত করেন। এই সকল জমি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় পাইকগণ বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। বগড়ী পরগণার নায়েকগণেরও জায়গীর জমি এই সময় বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। তাহারা অচল সিংহ নামক একজন সর্দ্দারের অধীনে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। ব্রাহ্মণভূম ও ভঞ্জভূম পরগণার পাইকগণ উহাদের সহিত যোগ দেওয়ায় বিদ্রোহ ভীষণ ভাব ধারণ করে। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

নায়েক হাঙ্গামা

জঙ্গল-মহালে চুয়াড় দমনের পর শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান, মানভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি পরগণা লইয়া জঙ্গল-মহাল জেলা নামে পৃথক একটি জেলা গঠিত হয়। ২০টি মহাল এই জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ভঞ্জভূম পরগণার সহিত আনন্দপুর এই জেলার অংশ ছিল। পরে সমস্ত অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হইলে জঙ্গল-মহাল জেলা উঠাইয়া উহার কতকগুলি গ্রাম ও পরগণা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং অবশিষ্টাংশ পার্শ্ববর্ত্তী জেলার সামিল করা হয়।

জঙ্গল-মহাল জেলা

আনন্দপুরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা উচ্চ মরিচাস্তূপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, পশ্চিমে মজুরা মৌজা অবস্থিত এবং উত্তর সীমা দিয়া তমাল নদী প্রবাহিত আছে। এই মৌজার আয়তন ৬২৫ একর। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে যে লোক-গণনা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে, সে সময় আনন্দপুরে বসতবাটির সংখ্যা ছিল ৭৮৫ এবং লোকসংখ্যা ছিল ২৯৫৯। ইহার মধ্যে পুরুষ ছিলেন ১৪৬৯ এবং স্ত্রীলোক ১৪৯০। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বসতবাটির সংখ্যা পাওয়া যায় ৭৪৪। এ সময় এই গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ৩২৮৯; তন্মধ্যে ১৬৫৬ জন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক ১৬৩৩। সমগ্র কেশপুর থানায় এরূপ জনবহুল গ্রাম পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান চতুঃসীমা, আয়তন ও লোকসংখ্যা

এখানকার জলবায়ু সাধারণত স্বাস্থ্যকর। গ্রামের বাহিরে বিস্তীর্ণ মাঠ ও নদী থাকায় নির্ম্মল বায়ু চলাচলের পথে বাধা হয় না। সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ এখানে নাই বলিলেই চলে। গ্রামে ৮টি বড় ও ৯টি ছোট পুষ্করিণী ও ৪টি টিউব-ওয়েল থাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব হয় না।

জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য

আনন্দপুরে ২৫০ ঘর তন্তুবায় বাস করে। ইহারা ময়ূরভঞ্জ, চাঁইবাসা, পুরুলিয়া, জলেশ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে তসরের গুটি আনাইয়া সুতা বাহির করে এবং দেশী প্রণালীতে সাদা, রঙিন, ময়ূরকণ্ঠী প্রভৃতি রঙের ধুতি শাড়ি কোটের কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করে। এই সকল কাপড় বাজারে বিক্রয় হয়। তসর-গুটির উপরের অংশ হইতে কেটে নামক এক প্রকার সুতা বাহির হয়। উহা হইতে ধুতি,

শিল্পবাণিজ্য

চাদর ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজের ব্যবসায়ীগণ পর্য্যন্ত এখানকার কেটের কাপড় লইয়া থাকে। পূর্ব্বে বৎসরে প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা মূল্যের তসর ও কেটের কাপড় আনন্দপুর হইতে বিক্রয়ের জন্য দেশ-দেশান্তরে প্রেরিত হইত। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ে মন্দা পড়িলেও এখনও তসর কাপড়ের জন্য আনন্দপুরের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে।

ধান্যই এখানকার একমাত্র ফসল। এখানকার মৃত্তিকা সাধারণত বালিমিশ্রিত বলিয়া অল্প পরিশ্রমে ধান্যের আবাদ হয়, কিন্তু ফসল ভাল হয় না। জল-সেচনের বন্দোবস্ত না থাকায় কৃষির অবনতি হইয়াছে। বর্ত্তমানে জনসাধারণ কৃষির উন্নতি বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং আজকাল চিনা-বাদাম; আখ, তামাক, কপি প্রভৃতি ফসলের আবাদ হইতেছে।

কৃষি

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে জঙ্গল-মহাল জেলা গঠিত হইবার পর আনন্দপুরে একটি মুন্সেফ-কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। পুরাতন কাগজপত্র ও দলিলাদি হইতে জানা যায় যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দেও এই কোর্টের অস্তিত্ব ছিল। এই আদালতের পার্শ্ববর্ত্তী কুলি-রাস্তা অদ্যাপি "মুন্সেফের কুলি" বলিয়া খ্যাত।

মুন্সেফ-কোর্ট ও সব্‌রেজেষ্ট্রি অফিস

গভর্মেণ্টের ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ এপ্রিল তারিখের রিপোর্ট অনুসারে ঐ বৎসর ১৫ই সেপ্টেম্বর আনন্দপুরে একটি সব্‌রেজিষ্ট্রি অফিস স্থাপিত হয়। তৎকালে ইহার নাম ছিল কেশপুর সব্‌রেজিষ্ট্রি অফিস। বর্ত্তমানে কেশপুর ও শালবনি থানার সমস্ত দলিল এখানে রেজিষ্ট্রি হইয়া থাকে।

স্থানীয় মধ্য-ইংরেজী স্কুলটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন ইহা মধ্য-বাংলা স্কুল ছিল।

স্কুল, পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি

ইউনিয়ন বোর্ডের চেষ্টায় ১৯৩৭ সালে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে তাহার ছাত্রী-সংখ্যা হইয়াছে এক শত। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম এখানে একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

আনন্দপুরে পোস্ট-অফিস, সাধারণ পাঠাগার ও মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির কাছারি আছে। এই কাছারিবাটী ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এই ইমারতে সরেয়াতি জমা বাদে প্রায় ১৭ হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে।

আনন্দপুরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে যে পল্লী রহিয়াছে, তাহার নাম যথাক্রমে রাজার ডাঙা ও সোনার বাগান। কিংবদন্তী, সোনার বাগানে পূর্ব্বে রাজার বাগান ছিল।

কিংবদন্তী

পূর্ব্বদিকে পরিখার মধ্যে যে শালজঙ্গল রহিয়াছে, তাহার নাম যুগনীর জঙ্গল। হয়তো এখানে কোন যোগিনীর আস্তানা ছিল। যুগনীর জঙ্গলের ভিতর বাখুল নামে একটি স্থল আছে। অল্পদিন পূর্ব্বেও সেখানে বাঁধানো মেঝে দেখা যাইত, এক্ষণে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সাধারণের ধারণা এখানে রাজার অন্তঃপুর ছিল।

পূর্ব্বপ্রান্তের মরিচার মধ্য দিয়া একটি যাতায়াতের রাস্তা আছে—উহার নাম দরজাগোড়া। এখানে কেল্লার গেট বা দরজা ছিল বলিয়া প্রকাশ। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে ইহার নিকটের অনেক চাকরাণ জমি ঘাট-দরজাগোড়া নামে অভিহিত। এই দরজার রক্ষকরূপে যে সকল পাইক বা বরকন্দাজ ছিল, তাহারা বেতনের পরিবর্ত্তে রাজার দেওয়া জায়গীর জমি ভোগ করিত। ইহাই "ঘাট-দরজাগোড়ার চাকরাণ"।

দক্ষিণ প্রান্তের মরিচা হইতে প্রায় ৭০০ গজ দক্ষিণে রেণুঘাড় গ্রামে যে পুষ্করিণীটি তালাও বলিয়া খ্যাত তাহার উত্তর পাড়কে বলা হয়—দমদমা। কিংবদন্তী, রাজার গোলন্দাজ সৈন্যগণ এই স্থল হইতে বহিঃশত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিত ও শত্রুর উপর গোলাবর্ষণ করিত।

পশ্চিম দিকে, দুই মাইল দূরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার উত্তর পার্শে দেউলবাড় নামে একটি মৌজা আছে। এখানে প্রস্তরনির্ম্মিত একটি সুউচ্চ দেবমন্দির ও তৎপার্শে পুষ্করিণী ছিল। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তরোপরি দেবদেবীর মূর্ত্তি, জীবজন্তুর আকৃতি ও মনুষ্যমূর্ত্তি এখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে দেউলবাড় জনশূন্য।

জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন—যাঁহারা ঘোষণা করিয়া বেড়ান, আমাদের ভারত ইতিহাসের অলঙ্কারে অনলঙ্কৃত, তাঁহারা ভ্রমান্ধ। রীতিমত ধারাবাহিক ঐতিহাসিক পুস্তকের অসদ্ভাব থাকিলেও ভারতের স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাসের অভাব কোথায়? বাস্তবিক তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই বহুল।

উপসংহার

সুনিপুণ সহিষ্ণুতা ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট ইতিবৃত্তের উপকরণ পর্য্যাপ্ত ও সুপ্রচুর। আজ একটি প্রাচীন পল্লীর ইতিহাস ও কিংবদন্তী পাঠকসমীপে উপনীত করা হইল। মেদিনীপুরের অন্যান্য পল্লীর ইতিহাস প্রকাশিত হইলে এই জেলার প্রকৃত উপকার করা হইবে।

পল্লী-উন্নয়ন ও শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য

ডাঃ অনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার, মেদিনীপুর

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার তুলা, রেশম-বস্ত্র ও চিনি বিদেশে রপ্তানি হইয়া বাংলার পল্লীতে অজস্র অর্থ আনিয়া দিত। তখন দেশের ধনী, বিদ্বান সকলেই দেশে বাস করিতেন। তাঁহাদের সকলকে লইয়া যে পল্লীসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই পল্লীর সমস্ত অভাব-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিত। ক্রমশ দেশের এই সকল শিল্প-বাণিজ্য বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটিয়া গেল। পল্লীসমাজের ভাঙন সেই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। পল্লীতে এখন আর অর্থাগমের উপায় রহিল না; পল্লীর অর্থে শহর ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় গ্রাম ছাড়িয়া লোকে শহরে আসিয়া জুটিল। ধনী গেল, বৈদ্য গেল, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গেল—যে কেহ বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ও সাহসী ছিল, সকলেই শহরে আসিয়া আশ্রয় লইল। যাহারা নিতান্ত উপায়হীন, এমন কৃষকের দলই গ্রামে পড়িয়া রহিল। সুতরাং গ্রামের সমাজ ধ্বংস হইল এবং তাহার সংস্কৃতির অবসান হইল। যাহারা পল্লীতে পড়িয়া রহিল, তাহাদের বংশধরগণ না পাইল শিক্ষা, না পাইল অর্থ; কোন প্রকারে জীবনধারণ করিয়া থাকিল মাত্র। স্বাস্থ্য-নীতি তাহারা ভুলিয়া গেল। তাহাদের অজ্ঞতার জন্য অনেক কুসংস্কার আসিয়া তাহাদের জীবনধারাকে কলুষিত করিতে লাগিল। গ্রামগুলিও ক্রমশ আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া ব্যাধির ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। রোগে ভুগিয়া, অকালে মরিয়া পল্লীবাসীর অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিল।

আদিম প্রকৃতির ভাব—বন্য। আদিম মানুষ তাহার বাহু ও বুদ্ধির বলে বনজঙ্গল কাটিয়া, প্রকৃতির বক্ষ হইতে জল ও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার বাসভূমি রচনা করিয়াছিল। কিন্তু মানুষের দৈহিক শক্তি যতই কমিতে লাগিল, প্রকৃতির বন্যভাব ততই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পল্লীবাসী জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ায় গ্রামগুলি জঙ্গলে পূর্ণ হইল; পুকুর দীঘি মজিয়া পানায় ভরিয়া গেল, বড় বড় বাড়ি, দেউল ভাঙিয়া পড়িল।

এতদিন পল্লীর স্বাস্থ্য ও দুর্দ্দশার প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই। কেবল যে আমাদের দেশ তাহা নহে; ইউরোপ ও আমেরিকাতেও পল্লীগুলি অবজ্ঞাত হইতেছিল। কৃষির অপেক্ষা শিল্প হইতেই দেশের অর্থাগম হয় এবং বড় বড় নগরেই যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি শিক্ষিত ও ধনী সমাজ মনোযোগ দিয়াছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন সৈন্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয়, তখন পল্লীতে পল্লীতে সবল, সুস্থদেহ পুরুষের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং যুদ্ধশেষে সকল জাতি পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যোন্নয়নের প্রতি মন দিতে আরম্ভ করে। এখন সকলেই বুঝিয়াছে, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য ভাল করিতে হইবে, পল্লীর অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

আজ শতাধিক বৎসর ধরিয়া বাংলার পল্লীবাসী জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া আছে। বিচ্ছিন্নভাবে নিজেকে লইয়াই তাহার জীবন—একযোগে গ্রামের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে তাহার কোন চেষ্টা বা আগ্রহ দেখা যায় না। এ কথা পল্লীবাসী বুঝিতে পারে না যে, স্বাস্থ্যের অভাব হইলে কৃষি বা অন্যান্য কার্য্য করিতে

পারা যায় না। কর্ম্মহীন হইয়া থাকিলে দারিদ্র্য আসিয়া পড়ে ; দারিদ্র্যের কবলে থাকিলে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা কিছুই লাভ করা যায় না। আজ এইরূপ চক্রে পড়িয়া বাংলার পল্লীসমাজ নিষ্পেষিত হইতেছে। এখন এই চক্রের কোন এক স্থলে ছিদ্র করিয়া তাহার গতি রুদ্ধ করিয়া দেওয়াই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

পল্লী-উন্নয়নকার্য্য স্থায়ী ভাবে করিতে হইলে কি ভাবে চলিতে হইবে, তাহাই এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমত, পল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কু-অভ্যাসগুলি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিতেছে, তাহা দূর করিয়া সু-অভ্যাস গঠন করাইতে হইবে। স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে এই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ শিক্ষা কখনই কাজে লাগানো হয় না। গ্রামে এখন আদর্শের অভাব হইয়াছে। স্বাস্থ্য-নীতি অনুযায়ী জীবন-যাত্রার প্রণালী দেখাইবার জন্য এবং উদাসীন পরস্পরবিচ্ছিন্ন পল্লীবাসীকে একযোগে কার্য্য করিতে শিখাইবার জন্য শিক্ষিত যুবকদিগকে স্কুল ও কলেজের অবকাশকালে গ্রামে থাকিয়া পল্লী-উন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে।

সকল গ্রামে এককালে পল্লী-উন্নয়নের কার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব নয় বলিয়া প্রথমে সুবিধাজনক কয়েকটি গ্রামে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। এই কার্য্য সুচারু ও স্থায়ী ভাবে করিতে হইলে, গ্রামবাসীকে লইয়া সমিতি গঠন করিয়া পরিকল্পনামত কাজ করিতে হয় এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ও তাহাদের সহিত আলোচনা করার জন্য একটি গৃহেরও প্রয়োজন দেখা যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের সু-অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং বয়স্ক লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের কু-অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

পল্লী-স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন, এখন সেগুলির উল্লেখ করিব—

(১) বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।

(২) সার-ডোবাগুলির সংস্কার করিয়া রীতিমত সার ও আবর্জ্জনা রক্ষা করার ব্যবস্থা।

(৩) ছোট ছোট ডোবা ভরাট করাইয়া তাহাতে শাক-সব্জীর চাষ করা। পরিত্যক্ত ভিটার মাটি ও পুকুরের পলি উঠাইয়া সহজেই অনেক ডোবা ভরাট করা যায়।

(৪) নালা কাটাইয়া জলনিকাশের ব্যবস্থা করা।

(৫) অনাবশ্যক ঝোপ-জঙ্গল কাটাইয়া বাসগৃহে আলো ও বাতাসের প্রবেশপথ মুক্ত করিয়া দেওয়া।

(৬) পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা। গো-জাতির উন্নতি করিয়া দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। গৃহের ব্যবহারের অতিরিক্ত দুগ্ধ বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা।

(৭) সমবায়-প্রণালীতে ডিস্পেন্সারি ও ডাক্তার রাখিবার ব্যবস্থা করা।

(৮) মেথরের অপেক্ষা না রাখিয়া পায়খানার ব্যবস্থা করা।

এই সকল কার্য্য সফল করিতে হইলে, দেশের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা গ্রামবাসীর অন্তরে আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলুন ; গ্রামবাসী দলবদ্ধ হইয়া নিজেদের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে গ্রামের সংস্কারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করুক।

আহারে বিচার

শ্রীবৃদ্ধ

আজকাল আহারকালে আমরা বিচার ছেড়ে দিয়েছি। বৃদ্ধের বচনটি আপদকালে খাটে, আহারকালে নয়—এই কুসংস্কার আমাদের অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে সুশীল বালকের মত 'যা পাই তা খাই'-নীতি পালন ক'রে হিতে বিপরীত হচ্ছে এবং দেহের ধাতু দূষিত হয়ে উঠছে।

কোন কোন খাদ্য পরস্পর গুণবিরোধের জন্য, কোন

কোনটি সংযোগবশত, কোন কোনটি বা সংস্কারবশত, কোন কোনটি আবার দেশ কাল ও মাত্রাদির দ্বারা স্বভাব বিরুদ্ধ হয়। বিরুদ্ধ-ভোজনের ফলে ক্লৈব্য, অন্ধতা, বিসর্প, জলোদর, বিস্ফোট, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, আধ্মান, গলরোগ, পাণ্ডুরোগ, কুষ্ঠ, গ্রহণী, শোথ, অম্লপিত্ত, জ্বর ইত্যাদি রোগ হওয়া সম্ভব। অতএব এদিকে আমাদের একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

সংযোগবিরুদ্ধ গোটা কয়েক জিনিসের উল্লেখ করছি—

(১) লবণের সঙ্গে দুগ্ধ

(২) মৎস্য বা মাংসের সঙ্গে দুগ্ধ

(৩) দুগ্ধের সঙ্গে লাউ, কুমড়া, অম্লফল, দধি, তৈল-সংযুক্ত চাউলের পিঠা, শাক, মূলা, জাম, রসুন ও মদ্য

(৪) কলার সঙ্গে তাল ও দধি

(৫) কাঁসার পাত্রে ঘৃত দশ দিন রাখার পর ভোজন

(৬) মধু উষ্ণ ক'রে পান

(৭) মধু ও জল বা মধু ও ঘৃত সমপরিমাণে আহার

যে সকল খাদ্যদ্রব্য পরস্পর সংযুক্ত হ'লে সহজে জীর্ণ হয়, এখন সেগুলির উল্লেখ করা গেল—

(১) চিঁড়া বা মুড়ির সহিত ঝুনা নারিকেল

(২) মিষ্ট আমের সহিত গরম দুগ্ধ

(৩) কাঁঠালের সহিত কলা

(৪) কলার সহিত লবণ-জল

(৫) চাউলের সহিত উষ্ণ দুগ্ধ

(৬) দুগ্ধের সহিত জল

(৭) পলান্নের সহিত ঘোল

(৮) সন্দেশের সহিত শীতল জল

(৯) পিঠার সহিত শীতল জল

(১০) মাষকলাইয়ের সহিত চিনি

(১১) পায়সের সহিত মুগের যুষ

(১২) দধির সহিত লবণ

(১৩) খিচুড়ির সহিত সৈন্ধবলবণ

(১৪) লুচির সহিত চিনি

(১৫) সরিষার তৈলের সহিত ওল

(১৬) ঘৃতের সহিত কাগজী লেবু

(১৭) মৎস্য মাংসের সহিত আমানি

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, এই পরস্পরসংযুক্ত খাদ্যের কোন একটিকে অধিক আহার করলেও, অপরটির দ্বারা পরিপাক শক্তির সাহায্য হয়।

এটা সকলেই জানেন যে, খাদ্যের প্রধান প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে ক্ষয়নিবারণ; অর্থাৎ কাজ করতে করতে শরীরের যে অংশগুলি নষ্ট হয়ে যায়, তার পুনর্গঠন। সুতরাং যাঁরা মস্তিষ্ক চালনা করবেন, তাঁদের এমন জিনিস খেতে হবে যা থেকে মস্তিষ্কের উপকার হয়। এজন্য কতকগুলি খাদ্য নিতান্ত প্রয়োজন—

(১) দুধ—মনে রাখা উচিত যে জীবনের প্রথম বৎসর কেবল দুধের দ্বারাই শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়। দুধ চিরজীবনের প্রধান ও উৎকৃষ্ট খাদ্য।

(২) ফল—মস্তিষ্কগঠনের উপযোগী লবণজাতীয় পদার্থ ইহাতে অধিক পরিমাণে রয়েছে। টাটকা ফল শরীরকে সুস্থ ও নীরোগ রাখে।

(৩) তরিতরকারি—টাটকা কচি তরকারি প্রত্যহ আহার করা উচিত।

(৪) ডিম—সকল অবস্থাতেই পুষ্টিকর খাদ্য। শক্ত ক'রে সিদ্ধ করলে দুষ্পাচ্য হয়ে ওঠে।

(৫) মাছ—মৎস্য সুপাচ্য ও মস্তিষ্কগঠনে সমধিক সমর্থ।

(৬) মাংস—মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী মাংসপ্রিয়। তবে মাছ ও দুধ ভাল ক'রে খেলে মাংসের আবশ্যক থাকে না।

সাধারণ ভাবে যাতে বদহজম না হয়, অনিদ্রা না দেখা দেয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আহার করা উচিত। মসলা-যুক্ত গুরুপাক খাদ্য বুদ্ধিজীবীর পক্ষে অপকারী।

আহার-প্রণালী সম্বন্ধে এবার দু একটা কথা ব'লে রাখি। বাংলার শতকরা ৮০ জন অজীর্ণে ভুগে থাকে শুধু এই প্রণালীটুকু জানে না ও মানে না ব'লে। আমরা সকল কাজের সময় পাই, কেবল সময় জোটে না খাওয়ার ও ভগবানকে স্মরণ করার। কোন রকমে আহারটুকু গিলে ফেললেই খাওয়া শেষ করা হ'ল—এই আমাদের ধারণা। আহারের সময় প্রত্যেক খাদ্য উত্তমরূপে চিবিয়ে, স্বাদ উপলব্ধি ক'রে খাওয়া উচিত। তারপর খাওয়ার সময় মস্তিষ্কের অবসর দিতে হবে। এটুকু সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে মস্তিষ্ক ও পাকস্থলী একসঙ্গে কাজ করতে পারে না। অপরের সঙ্গে একত্রে খাওয়ার অভ্যাস ভাল,

খাওয়ার সময় হাসি ঠাট্টা গল্প প্রভৃতিতে মস্তিষ্ক অবসর লাভ করে এবং পাকস্থলীর ক্রিয়া ভাল হয়। একলা খেতে হ'লে যতটা পারা যায় খাদ্যকে উপভোগ করা উচিত। আহারকালে, সাংসারিক ছোটখাট মজার কথা, সাময়িক সংবাদ বা কোনরূপ আনন্দদায়ক চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখা যায়।"

অনেকে রাত্রে ঘুমোবার আগে চা বা কফি পান ক'রে থাকেন। চা বা কফিতে চিন্তার সুবিধা হয়, কিন্তু যাঁরা দুর্ব্বল বা সহজে উত্তেজিত হন, তাঁদের পক্ষে এ দুটোই অনিষ্টকর। শোবার সময় গরম দুধ, গরম জল বা গরম সরবৎ খাওয়া খুব ভাল। এতে হজমের সুবিধা হয়।

পল্লী-মঙ্গল

বালিসাহী পল্লীমঙ্গল-সমিতির প্রচেষ্টা

১। পল্লী-পাঠাগার

কাঁথির সার্কেল অফিসারের উৎসাহে এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর পণ্ডা প্রভৃতির চেষ্টায় রামনগর পল্লী-পাঠাগারের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কাঁথির সার্কেল অফিসারের নিকট হইতে জীবনচরিত, ভ্রমণ, ইতিহাস, কৃষি, ব্যবসা, শিল্প ও খেলাধূলা সংক্রান্ত পঁয়ত্রিশখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। সাধারণের ব্যবহারের জন্য এই পাঠাগারে 'কৃষি-লক্ষ্মী', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'পল্লী-শ্রী' এবং দুইটি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়।

২। কৃষির উন্নতি

বালিসাহী ও বড়বাকুয়া গ্রামে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো ও নানাবিধ শাকসব্জীর চাষ-আবাদ হইতেছে। এই অঞ্চলে দশ হাজার ইক্ষুদণ্ড, সাড়ে সাত হাজার নেপিয়ার ঘাসের চারা, তেরো সের বাদামের বীজ এবং দশ মণ শিলহু-আলুর বীজ বিনামূল্যে চাষীদিগকে দেওয়া হইয়াছে। সার-সংরক্ষণের জন্য উক্ত গ্রাম দুইটিতে কুড়িটি manure pit করা হইয়াছে।

৩। রাস্তানির্ম্মাণ ও মেরামত

পল্লী-মঙ্গল সমিতির চেষ্টায় বিনাব্যয়ে আরিহা গ্রামে তিনটি, বড়বাকুয়া গ্রামে একটি, ইসলামপুর গ্রামে তিনটি ও দক্ষিণ শীতলা গ্রামে একটি রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামত করা হইয়াছে।

৪। ম্যালেরিয়া-নিবারণ

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর পণ্ডা ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ পণ্ডা, বি. এল. মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় ও উৎসাহে নারিহা ও বাগ্‌দিহা গ্রামে অনেকগুলি জঙ্গল ও পুষ্করিণী পরিষ্কার করা হইয়াছে।

৫। প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাকেন্দ্র

রামনগর রাও-হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দেবরায় মহাশয়ের চেষ্টায় বালিসাহী গ্রামে একটি প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

৬। নারিকেলছোবড়া-বয়নশিল্প

কাঁথির মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস. এন. মিত্র, আই. সি. এস. মহাশয়ের চেষ্টায় বালিসাহী গ্রামে একটি নারিকেলছোবড়া-বয়নশিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। রামনগর থানায় অসংখ্য নারিকেলগাছ আছে। আশা করা যায়, এই শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থায় সমগ্র রামনগরবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হইবে এবং প্রজাবৃন্দের অর্থাগমের উপায় হইবে।

শ্রীরাধাশ্যাম দাস মহাপাত্র
২৪।১।৩৯ সম্পাদক, বালিসাহী পল্লীমঙ্গল-সমিতি

দুর্ম্মুঠ পল্লীমঙ্গল-সমিতির কার্য্য

১। রাস্তা মেরামত

দুর্ম্মুঠ পল্লীমঙ্গল-সমিতির চেষ্টায় গত ডিসেম্বর মাসে দৈসাই ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে চারিটি বড় রাস্তার সংস্কার হইয়াছে। ইহাতে কিছুই অর্থব্যয় হয় নাই, সর্ব্বসাধারণে কায়িক পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

২। নৈশ-বিদ্যালয়

দুর্ম্মুঠ গ্রামে একটি অবৈতনিক নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় চল্লিশ জন দরিদ্র কৃষক ছাত্র বিনা বেতনে গত সাত মাস যাবৎ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে।

৩। পল্লী-লাইব্রেরি

দুর্ম্মুঠ গ্রামে একটি পল্লী-লাইব্রেরি স্থাপিত হইয়াছে। কাঁথির সার্কেল অফিসার ও পল্লীমঙ্গল-সমিতির সভ্যগণের চেষ্টায় এই পাঠাগারে অনেকগুলি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে এবং স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অনেক লোক পাঠাগারের সভ্য হইয়াছেন। এই লাইব্রেরিটি স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

৪। খেলার মাঠ

গভর্মেণ্টের অর্থ-সাহায্যে ও স্থানীয় অধিবাসীগণের চাঁদায় দুর্ম্মুঠ গ্রামে ১৯৩৮ সালে একটি খেলার মাঠ নির্ম্মিত হইয়াছে।

৫। ম্যালেরিয়া-নিবারণ

বর্ত্তমান বৎসরে দুর্ম্মুঠ ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি গ্রামে অনেকগুলি পুষ্করিণীর আবর্জ্জনা দূর করা হইয়াছে এবং অনেক জঙ্গল কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কার্য্যে জনসাধারণের আন্তরিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীবরেন্দ্রনাথ মাইতি
২৭।১২।৩৮ দুর্ম্মুঠ পল্লীমঙ্গল-সমিতির সম্পাদক

পাঁচথুবী গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন

মেদিনীপুরের জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট পল্লী-উন্নয়নের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তদনুসারে পিঙ্গলা থানার অন্তর্গত পাঁচথুবী গ্রামে পল্লী-মঙ্গলের কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বারোটি পুষ্করিণী পরিষ্কার করা হইয়াছে; দৈর্ঘ্যে ১৩৭৪ ফুট ও প্রস্থে ৪৫ ফুট পরিমিত জমির জঙ্গল কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং গ্রাম্য রাস্তাগুলির সংস্কার করা হইয়াছে।

পাঁচথুবী গ্রামে কৃষি-কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় গ্রামবাসীর মনে নূতন উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে। আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, টম্যাটো প্রভৃতি সব্জী, মতিহারি তামাক, পিয়াজ, চিনাবাদাম প্রভৃতি উৎপন্ন হওয়ায় গ্রামের কৃষিক্ষেত্রগুলির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে।

গ্রামের মক্তবটির গৃহ ঝড়ে ভগ্ন হওয়ায় গ্রামবাসী উহার সংস্কার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই মক্তবটি অবৈতনিক এবং গ্রামবাসী ইহার সমস্ত খরচ চালাইয়া থাকেন।

পাঁচথুবী হইতে ক্ষিরাই যাইবার জন্য নদীর উপর একটি পুল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে জেলাবোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল।

১৮।১।৩৯ শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাইতি

মেদিনীপুরে মোস্লেম পুরাকীর্ত্তি

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস

যাঁহারা মেদিনীপুরের পুরাতত্ত্বের সহিত পরিচিত তাঁহারা সকলেই জানেন যে অতীত গৌরবের শ্মশানভূমি এই মেদিনীপুর এক সময়ে মোগল, আফগান ও মহারাষ্ট্র বীরগণের রঙ্গভূমি ছিল। কালের বশে সেই সব বীরের স্মৃতিচিহ্ন একে একে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও কিছু কিছু তাহাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। বিলুপ্তপ্রায় এইরূপ দুই চারিটি কীর্ত্তির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিয়াছি—

চন্দন শহীদের মস্‌জিদ

এই মস্‌জিদটি সহরের মিঞাবাজারে প্রতিষ্ঠিত। জনপ্রবাদ সম্রাট ঔরংজীবের সময়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান সৈয়দ রাজি। ইনি ভাগলপুরের জনৈক মৌলানা শাহবাজের খলিফা বা বংশধর ছিলেন। সৈয়দ রাজির অপর নাম চন্দন শহীদ। ইনি ১০৯০ হিজরীতে দেহত্যাগ করেন। ইহার পুত্র মীর সৈয়দ গৌড়ের বাদশাহ ফেরকশায়ারের নিকট হইতে মেদিনীপুর থানার অন্তর্গত কাথুয়া মৌজা জায়গীর প্রাপ্ত হন। সনন্দের তারিখ আনুমানিক ১১৩৪ হিজরী (১৭১২ খৃষ্টাব্দ)।

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লাট সার্ ষ্টুয়ার্ট বেলি, সার্ জন উড্‌বরণ, সার্ লানসিকেট হেয়ার মহোদয়গণ এবং পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুর, সার্ ভালেন্টাইন চিরোল মহোদয় এই মস্‌জিদটি ও তাহার অভ্যন্তরস্থিত হস্তলিখিত কোরাণখানি দেখিয়া অতীব মুগ্ধ ও প্রীত হইয়াছিলেন।

এই মস্‌জিদের প্রাঙ্গণে একটি চন্দন বৃক্ষ বর্ত্তমান। সেই বৃক্ষের পত্র মর্দ্দন করিলে বীর শোণিতের ন্যায় লোহিত-বর্ণের নির্য্যাস নির্গত হয় বলিয়া ঐ বীর সাধক চন্দন শহীদ নামে প্রখ্যাত। চন্দন শহীদের মসজিদের মধ্যে কোরাণের একখানি বিরাট হস্তলিখিত পুঁথি ও একটি প্রাচীন শিলালিপি বিদ্যমান। বাঙ্গলার বাহিরের কথা বলিতে পারি না; তবে বাঙ্গলার মধ্যে এরূপ একখানি কোরাণের হস্তলিপি কোথাও নাই। শিলালিপিটি ভূতপূর্ব্ব রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর শ্লাক সাহেব যখন কাঁথিতে অবস্থান করেন; সেই সময় হিজলীর মস্‌নদ-ই আলির মস্‌জিদ হইতে সংগ্রহ করিয়া কাঁথি মহকুমা-অফিসে আনিয়া রাখেন। পরবর্ত্তী কালে স্থানীয় পরলোকগত ডেপুটি মৌলবী আবুল কাদের মহোদয় যখন কাঁথি মহকুমার হাকিম ছিলেন, সেই সময় তিনি এই প্রস্তরখণ্ডটি মহকুমা অফিস হইতে এই মস্‌জিদে স্থানান্তরিত করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা হিজলীর কোন মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ মাত্র। শিলালিপির অনুবাদ এইরূপ—

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়াছেন। ঈশ্বরকে মান্য করিবে; তাঁহার প্রচারককে মান্য করিবে এবং তোমাদের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান তাঁহাদিগকে মান্য করিবে।

এক বই দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। তাঁহার প্রচারক মহম্মদ। ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর মহান,—এক বই দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর মহান এবং জয় মাত্র তাঁহারই।

সেখ গুরুদিন নো-ও-ভীর পুত্র খাজা শিবলী কর্ত্তৃক ১০১৯ হিজরীতে (১৬১০ খৃষ্টাব্দে) খোদিত।

চোল শাহের মস্‌জিদ

এই মস্‌জিদটি সহরের সিপাহি বাজারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। মস্‌জিদের মধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডে দুইছত্র কবিতা সুন্দরভাবে খোদিত আছে। শিলালিপির অর্থ এইরূপ—

শাহজাহান শাহ গাজির রাজত্ব কালে (তাঁহার রাজত্বের ভিত্তি অটল হউক) খিজিরের চক্ষুর সম্মুখে আদিল মহম্মদের সাহায্যে এই সঞ্জীবনী সুধা দৃশ্যমান হইল। এই সুধার উৎস-পার্শ্বে আলেক্‌জাণ্ডার পানপাত্র হস্তে সুধালাভের নিমিত্ত আগ্রহভরে দণ্ডায়মান। এই সুধার উদ্ভবে বসুধা জ্যোতিষ্মান হইল। জীবজগৎ অমরতা লাভ করিল। জ্ঞান আসিয়া তৃষাতুর কণ্ঠে কহিল—আলি মহম্মদের সুধার উৎস হইতে আমার তৃষ্ণা দূর কর।

যত দূর অনুমিত হয় এবং অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে তাহাতে এই শিলালিপিটি এই মস্‌জিদ সংশ্লিষ্ট ত একেবারেই নয়, বরং স্থানান্তর হইতে আনিত বলিয়া বোধ হয়। তা ছাড়া ইহা একটি জলাশয়ের স্মৃতি-চিহ্ন বলিয়া মনে হয়। ইহা ১০৪৩ হিজরী (১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে খোদিত।

দেওয়ান কিফাউতুল্লার মস্‌জিদ

এই মস্‌জিদটি সহরের কিল্লাপুকুরের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত এবং দেওয়ান থানার মস্‌জিদ বলিয়া সুবিদিত। বৃটিশ রাজত্বের প্রাক্কালে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। কারুকার্য্য ছাড়া ইহার অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য ইতিহাস নাই। বর্দ্ধমানের দেওয়ান কিফাউতুল্লা ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

গাজি সাহ মোস্তাফা মাদানির মস্‌জিদ

মেদিনীপুর সহরের পুরাতন জেলের মধ্যে এই মস্‌জিদ বিদ্যমান। শাহ মোস্তাফার কিংবদন্তী প্রাচীনদের মুখে রটিয়া আসিতেছে। এই আস্তানাটি বহু প্রাচীন। মেদিনীপুরে মুসলমান রাজত্বের প্রাক্কালে ইহা নির্ম্মিত হয়। জনশ্রুতি এই মাদানির আস্তানাকেই মেদিনীমাতার মন্দিরে পরিণত করিয়াছে।

পীর পল্‌ওয়ানের আস্তানা

বর্ত্তমান কালেক্টরী কাছারীর পূর্ব্ব প্রান্তে এই পীরের আস্তানাটি প্রতিষ্ঠিত। এই মুসলমান সাধুটি একজন বীর সাধক বলিয়া পরিচিত। বীরত্বের চিহ্নস্বরূপ ইহার আস্তানায় বড় বড় মুদ্গর বর্ত্তমান। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট ইনি সমভাবে শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করেন। এই পীরের ইতিহাস এখনও অনাবিষ্কৃত। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে এই আস্তানাটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি।

বাল্‌গ্ শহীদের কবর

সহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে মেদিনীপুর রেল-ষ্টেশনের অনতিদূরে এই ফকিরের সমাধিস্থান প্রতিষ্ঠিত। বাল্‌গ্ ফকিরের দুইটি পুত্রের কবরও এইস্থানে বিদ্যমান। স্থানীয় জনসাধারণ এই স্থানটিকে "ফকিরের কূয়া" নামে অভিহিত করেন। সমাধিস্থানে একটি কূপ আছে। কূপটির সহিত একটি ঝরণার যোগ থাকায় উহার জল কখনও শুষ্ক হয় না। কূপটির জল অতীব সুস্বাদু ও লৌহসংযুক্ত বলিয়া উৎকৃষ্ট পানীয়রূপে প্রখ্যাত। এই ফকিরের ইতিহাসও আজ অজ্ঞাত।

ইয়াদ্‌গার শাহর আস্তানা

সহরের নরমপুর পল্লীতে এই আস্তানাটি প্রতিষ্ঠিত। বাদশাহ শাহজাহানের আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। চন্দন শহীদ ও পীর পল্‌ওয়ানের ন্যায় ইয়াদ্‌গার শাহও হিন্দু-মুসলমানের পূজা পাইয়া থাকেন। ইয়াদ্‌গার শাহ চন্দন শহীদের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া জানা যায়। লোক-পরম্পরায় ইহা বাদশাহ ঔরংজীব নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু মূলে ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

পীর লোহানির সমাধিস্থান

খড়্গপুরের মধ্যে জগন্নাথ রাস্তার পার্শ্বে পীর লোহানি সাহেব নামক এক মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। পীর সাহেবের আদি নাম আমীর খাঁ। ইনি সম্ভবতঃ লোহানি বংশীয় ছিলেন, তাই পীর লোহানি নামে প্রখ্যাত। আস্তানাটি প্রস্তর নির্ম্মিত সমচতুষ্কোণ চত্বর। পূর্ব্বে এই চত্বরের পশ্চিম দিকে একটি উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর, অপর তিন দিকে অনতি-উচ্চ প্রস্তর-দেওয়াল ছিল। সম্প্রতি ইহাকে মস্‌জিদ আকারে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। আস্তানাটির মধ্যে পীর সাহেবের, তাঁহার ভগ্নী ফতে খাতুনের ও লাল খাঁ এবং তাজ খাঁ নামক দুই ভাগিনেয়ের দেহ সমাহিত আছে। আস্তানার সম্মুখে পীর সাহেবের কয়েকটি শিষ্যের সমাধি বিদ্যমান। শত হস্ত পশ্চিমে পীর

সাহেবের গুরুর সমাধিও দৃষ্ট হয়। এই আস্তানাটি অতীব প্রাচীন এবং ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ নবাবী আমল হইতে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি নিষ্কর দেওয়া আছে।

আলি শাহর গড়

ডেবরা থানার মধ্যে আলি শাহর গড় নামে একটি প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। আলি শাহ জনৈক পরাক্রান্ত মুসলমান জমিদার ছিলেন। অন্যূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই গড়টি নির্ম্মিত হয় এবং জমিদারের নামানুসারে গ্রামের নামও আলিশা গ্রাম হয়। আলি শাহর কীর্ত্তিরাজি এখন মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত। গড়ের চতুর্দ্দিকে যে পরিখা ও মৃত্তিকাস্তূপের প্রাচীর ছিল, অদ্যাপি স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখা যায়। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে এই গড়ের অভ্যন্তরে পুষ্করিণী খননকালে একটি কূপ বাহির হয় এবং সেই কূপ মধ্য হইতে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের ব্যবহার্য্য কয়েকটি মূল্যবান তৈজসপত্র পাওয়া গিয়াছিল।

শাহ জীউর আস্তানা

ডেবরা থানার অন্তর্গত সাহাপুর পরগণায় মাড়ওলা গ্রামে এই আস্তানা বর্ত্তমান। শাহ জীউ আলি শাহর গুরু ছিলেন এবং শাহ জীউর নামানুসারে সাহাপুর পরগণার নামকরণ হইয়াছিল। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব-বিভাগে সাহাপুর মহাল সরকার-মান্দারণের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে শাহ জীউ ও আলি শাহ অন্যূন ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। শাহ জীউর অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক কাহিনী এই প্রদেশে অদ্যাবধি প্রচলিত।

কুরুমবেড়া মসজিদ

কেশিয়াড়ির তিন মাইল অন্তরে কুরুমবেড়া দুর্গ নামে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি জীর্ণ দুর্গ আছে। এই দুর্গ মধ্যে একটি মসজিদ বিদ্যমান। মসজিদটির গাত্রে একটি শিলা-লিপি-ফলক রহিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে ১১০২ হিজরীতে (১৬৯১ খৃঃ) সম্রাট ঔরংজীবের রাজত্বকালে মহম্মদ তাহির কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। মসজিদটির প্রস্তরগুলি হইতে অনুমিত হয় যে কোন হিন্দু-মন্দিরের উপকরণ লইয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। একই প্রাঙ্গণে একই প্রাচীরের আবেষ্টনে হিন্দু-মন্দিরের ও মুসলমান-মসজিদের এমন প্রতিষ্ঠা জেলার অপর কোথাও দেখা যায় না। মুসলানদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা এই মসজিদটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে মহারাষ্ট্রীয়গণ উড়িষ্যায় আধিপত্য স্থাপন করিলে এ প্রদেশ হস্তগত করিয়া এই দুর্গ ও শিবমন্দির স্থাপন করেন।

তল কেশিয়াড়ির মসজিদ

মোগল রাজত্বের সময় কেশিয়াড়িতে একটি প্রাচীন তহশীল কাছারী ছিল। সে সময় এ প্রদেশে বহু সংখ্যক মোগলের আমদানি হওয়ায় তাঁহারা যে স্থানে বাস করিতেন সে স্থান আজিও মোগল পাড়া নামে অভিহিত। মোগল পাড়ায় অনেক মসজিদ ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। একটি জীর্ণ মসজিদে আরবী ভাষায় লিখিত একখানি প্রস্তর-ফলক আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে সম্রাট ঔরংজীবের সময় ঐ মসজিদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিটি একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমানের প্রতিমূর্ত্তি। তল কেশিয়াড়ি গ্রামের মসজিদটি বাদশাহ শাহ আলমের সময় প্রতিষ্ঠিত। মসজিদটির গঠনপ্রণালী সুন্দর ও কারুকার্য্য-শোভিত। সংস্কারাভাবে ইহা এখন জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণ এখানে এখনও উপাসনাদি করিয়া থাকেন।

নারায়ণগড় মসজিদ

নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত কশবা গ্রামে একটি মসজিদ আছে। মসজিদটি বিশেষ কারুকার্য্যখচিত ছিল, তবে সম্প্রতি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। মসজিদটির ছাদ ভগ্ন। একখানি প্রস্তর-ফলকে সাতটি ছত্র পার্শি ভাষায় খোদিত রহিয়াছে। শিলালিপির অনুবাদ এইরূপ ;—

শাহানশাহ শাহ সুজা বাহাদুরের প্রতিনিধিবর্গের অবস্থানকালে মানাদার মহম্মদ সফি এই মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। মসজিদ-ই-দিলপিজির। ইহার নির্ম্মাণের তারিখ ১০৬৫ হিজরী (১৬৫৫ খৃঃ)। পূর্ব্বোক্ত শিলালিপি হইতে প্রতীত হয় যে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাঙ্গলার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা শাহ সুজা ১০৬৫ হিজরীতে এই মসজিদটি নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে এই মসজিদটি কশবার উত্তর মহল্লা পল্লীর এক মুসলমান বংশের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে।

আলি সাহেবের সমাধি

নারায়ণগড় থানার রাস্তার পার্শ্বে এই সমাধি প্রতিষ্ঠিত। এই আলি শাহ একজন মুসলমান ফকির ছিলেন। অধুনা লুপ্তপ্রায় কোন মসজিদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া এই প্রস্তরটি অনুমিত হয়। খোদিত শিলালিপির অনুবাদ এইরূপ—

কি সুন্দর মসজিদ ও অট্টালিকা! কি পরিচ্ছন্ন ও সমুজ্জ্বল! ধনী নির্ধনের ভগবদারাধনা ও পূজা-গৃহই বটে! নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিতে ও নামের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিষ্ঠাতা কত না যত্ন করিয়া ইহাদের স্থাপন করিয়াছেন! ইহাদের নির্ম্মাণের তারিখ হিসাব করিয়া জানা গেল—শাহ আলমগীরের শুভ রাজত্বকাল ১০৭৯ হিজরী (অর্থাৎ ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ)

মকদুম সাহেবের আস্তানা

পটাশপুর থানার অন্তর্গত অমশি গ্রামে পীর মকদুম সাহেবের একটি আস্তানা আছে। আস্তানার সংলগ্ন একটি জীর্ণ মসজিদে একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তর-ফলকের কিয়দংশ কালবশে নষ্ট হইয়া গেলেও যেটুকু উদ্ধার করা গিয়াছে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। খোদিত শিলালিপির অর্থ এইরূপ—

এই মসজিদটি পৃথিবীতে সত্য সত্যই খোদাতালার আবাসভূমি। এইস্থানে ভক্তি সহকারে প্রার্থনা কর; কেননা তাহাই মুক্তির পন্থা। ইসলাম ধর্ম্মের অনুরক্ত ভক্ত মকদুম শিহাবুদ্দিন আউলিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। স্বর্গের দূতকে ইহার নির্ম্মাণ-তারিখ জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল ১০৭২ হিজরী (অর্থাৎ ১৬৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে)।

পীর মকদুম সাহেব জনৈক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইহার অলৌকিক জীবনের অনেক কাহিনী এই অঞ্চলে শ্রুত হওয়া যায়। ইনি ১১০২-৩ হিজরীতে পশ্চিম প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় আগমন করেন। অমশির তদানীন্তন রাজা অমর সিংহ ভয়ানক মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন। সকালে গাত্রোত্থান করিয়া মুসলমানের মুখদর্শন করিবার আশঙ্কায় তিনি রাজফটকে একখানি চর্ম্মপাদুকা ঝুলাইয়া রাখিতেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থীকে অগ্রে পাদুকাকে সেলাম করিয়া পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণের আদেশ প্রদান করিতেন। মকদুম সাহেব এইরূপ অন্যায় আদেশের প্রতিকার মানসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থী হন। দ্বাররক্ষীগণ তাঁহাকে অগ্রে পাদুকা-বন্দনা করিতে বলিলে তিনি তাহা না করিয়া অবিলম্বে দ্বার-রক্ষীগণকে তরবারির আঘাতে ভূতলশায়ী করেন। রাজা ইহা শুনিবামাত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া মকদুম সাহেবের মস্তক ছেদনের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। অবশেষে রাজা নিজেই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে মকদুম সাহেব তরবারির আঘাতে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন। চক হিজলীর নবাব মসনদ-ই-আলি শাহ ইহার একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

হিজলীর মসজিদ

কাঁথি মহকুমায় রসুলপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার অনতিদূরে এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত। ইহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ প্রায় ৫০×১৫ ফিট। উপরে তিনটি গম্বুজ আছে। মসজিদটি খুব উচ্চ। ইহার প্রতিষ্ঠাতা হিজলীর অন্যতম নবাব তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলি। মসজিদটির সম্মুখে ও পার্শ্বে নবাব ও তাঁহার ভ্রাতা সিকান্দরের এবং তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির সমাধি আছে। তাজ খাঁ ১৫০৫-১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হিজলীর নবাব ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহার কোন বংশধর পূর্ব্বোক্ত মসনদ আলি শাহ হইবেন।

মির্জ্জা দিদার আলির সমাধি

বাদশাহ ঔরংজীব তাঁহার রাজত্বকালে তমলুকে এক দ্বাদশ-দ্বারসংযুক্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সম্প্রতি ইহা শুধু "বার দুয়ারী" নামেই স্মৃতিতে পর্য্যবসিত। কেননা বহুকাল হইল ইহা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এই অঞ্চলে নব পোতায় বর্ত্তমানে একটি মস্‌জিদ ও ইদ্‌গা রহিয়াছে।

হিজলীর ফৌজদার সসনদ্ আলি মহম্মদ খাঁ তমলুকের তদানীন্তন কৈবর্ত্ত রাজার খাজনা প্রদানের শৈথিল্য নিমিত্ত রাজসম্পত্তি জনৈক খোজা মির্জ্জা দিদার আলি বেগের সহিত বন্দোবস্ত করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে মির্জ্জার মৃত্যুর পর কৈবর্ত্তরাজা নরনারায়ণ ও কৃপানারায়ণের পত্নীযুগল এই সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। তমলুক রাজ-তোরণদ্বারের পশ্চিমদিকে মির্জ্জার সমাধি আজিও বিদ্যমান। সমাধিস্থানের বর্ত্তমান মালিক মহিষাদলের রাজাবাহাদুর। খোজা দিদার আলি তমলুক পরগণার পশ্চিম সীমান্তে একটি বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজিও তাহা এই অঞ্চলে "খোজার বাঁধ" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে।...

—মেদিনীবাণী

সম্পাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সৌমি
মেদিনীপুর জেলা-পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পল্লী-শ্রী
কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

১ম বর্ষ] মাঘ, ১৩৪৫ [৯ম সংখ্যা

বাংলা সাময়িক-পত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৮ সন হইতে ১৮৫৫ সন পর্য্যন্ত যে-সকল বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, গত বারে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়-সমেত তালিকা দিয়াছি। এবার ১৮৫৬ সন হইতে ১৮৬৭ সনের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা সাময়িক-পত্রের একটি তালিকা দেওয়া হইল।

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
১৮৫৬			
? জানুয়ারি	মর্ম্ম ধুরন্ধর (মাসিক)		
এপ্রিল	বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা		
? মে	সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা (মাসিক)	নবকৃষ্ণ বসু ও শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
৪ জুলাই	এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক)	ও'ব্রায়েন স্মিথ ; রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্যারীচরণ সরকার...	৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮ হইতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।
? জুলাই	সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা (মাসিক)	কালীপ্রসন্ন সিংহ	
আগস্ট	অরুণোদয় (পাক্ষিক)	রেভারেণ্ড লালবিহারী দে	ইহা সচিত্র পত্রিকা।
অক্টোবর	অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা (মাসিক)	দ্বারকানাথ হোড় ও মধুসূদন সরকার	
ডিসেম্বর	উলুবেড়িয়া পাক্ষিক পত্রিকা (পাক্ষিক)	বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	
১৮৫৭			
২৪ ফেব্রুয়ারি	হিন্দুরত্নকমলাকর (সাপ্তাহিক)	গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	
এপ্রিল	বিজ্ঞানমিহিরোদয় (মাসিক...)	শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি	১৮৫৮ এপ্রিল হইতে পাক্ষিকে পরিণত হয়।
এপ্রিল	সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা (মাসিক)	কানাইলাল পাইন	

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
? জুন	লোক লোচন চন্দ্রিকা (মাসিক)	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	
?	ভারতবর্ষীয় সভা। মাসিক বিজ্ঞাপনঠ।		
১৮৫৮			
১৩ জানুয়ারি	সুবোধিনী (পাক্ষিক)	রামচন্দ্র দিচ্ছিত	চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র
জানুয়ারি	রচনা-রত্নাবলি (মাসিক)	প্রাণনাথ দত্ত, বৈদ্যনাথ চন্দ্র প্রভৃতি	বিনামূল্যে বিতরিত।
? জানুয়ারি	বিচারক (সাপ্তাহিক)	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	অ্যাডিসনের 'স্পেক্‌টেটরে'র ধরণে গঠিত।
১৮ জানুয়ারি	কলিকাতা বার্ত্তাবহ (দ্বিসাপ্তাহিক)		
? জুন	হিতৈষিণী পত্রিকা (মাসিক)	কানাইলাল পাইন	কলিকাতা হিতৈষিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক পত্র।
? আগস্ট	চমৎকারমোহন (ত্রিসাপ্তাহিক)	কেদারনাথ দত্ত	দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্র।
অক্টোবর	কলিকাতা পত্রিকা (মাসিক)	মথুরানাথ দত্ত	
১৫ নবেম্বর	সোমপ্রকাশ (সাপ্তাহিক)	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ	বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে 'সোমপ্রকাশে'ই প্রথম রীতিমত রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা সুরু হয়।
১৮৫৯			
১৭ ফেব্রুয়ারি	পূর্ণিমা (মাসিক)	বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী	
? এপ্রিল	হিতবিলাসিনী পত্রিকা (মাসিক)		কলিকাতা হিতবিলাসিনী সভার মুখপত্র।
৩ সেপ্টেম্বর	সৌদামনী (দ্বিসাপ্তাহিক)	শ্যামাচরণ সান্যাল ও বিপিনবিহারী সরকার	
১৯ সেপ্টেম্বর	সংবাদ দ্বিজরাজ (সাপ্তাহিক)	গোসাইদাস গুপ্ত	'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অভাব পূরণার্থই ইহার আবির্ভাব হয়।
১৮৬০			
জানুয়ারি	সত্যপ্রদীপ (মাসিক)		খ্রীষ্টান ভার্নাকিউলার সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র।
এপ্রিল	রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ (সাপ্তাহিক)	মধুসূদন ভট্টাচার্য্য	কাকিনীয়ার ভূম্যধিকারী শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর ব্যয়ে প্রকাশিত।
এপ্রিল	জ্ঞানচন্দ্রিকা (মাসিক)	বলাইচাঁদ সেন	
মে	কবিতাকুসুমাবলী (মাসিক)	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র।

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
জুন	মনোরঞ্জিকা (মাসিক)	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	ঢাকা হইতে প্রকাশিত।
? জুন	মনোহরু (সাপ্তাহিক)	উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
আগস্ট	নব্যব্যবহারসংহিতা (মাসিক···)	রামচন্দ্র ভৌমিক	ঢাকা হইতে প্রকাশিত। ইহাতে সরকারী আইনকানুনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইত।
? সেপ্টেম্বর	রাজপুর পত্রিকা (? মাসিক)		
? সেপ্টেম্বর	বিজ্ঞান কৌমুদী (মাসিক)	জগন্মোহন তর্কালঙ্কার	বিজ্ঞানের আলোচনাই এই পত্রিকা প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

কালীপ্রসন্ন সিংহ

?	ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী (মাসিক)	কৈলাসচন্দ্র সরকার	ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।
?	সংস্কারসংশোধনী (মাসিক)		বিক্রমপুর কুকুটীয়স্থ জ্ঞানমিহির বিকাশিনী সভা হইতে প্রচারিত।
১৮৬১			
মার্চ	ঢাকাপ্রকাশ (সাপ্তাহিক)	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ; গোবিন্দচন্দ্র রায় ; প্রসন্নকুমার ভৌমিক···	ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
? মে	বঙ্গহিতাথিনী (? সাপ্তাহিক)	শিবকৃষ্ণ দত্ত	
মে	ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র (পাক্ষিক)	তারকচন্দ্র চূড়ামণি	রাজনীতি-সংক্রান্ত বিষয়সকল ইহাতে প্রকাশিত হইত।
জুন	সংবাদ সজ্জনরঞ্জন (দ্বিসাপ্তাহিক)	গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	এই পত্রিকা প্রথমে ১৮৪৯ সনের শেষাশেষি প্রকাশিত ও ১৮৫৮ সনে রহিত হয়।
? জুলাই	পরিদর্শক (দৈনিক)	জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী।	১৮৬২ সনের নবেম্বর মাস হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কয়েক মাসের জন্য সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।
?	সুধাকর (? সাপ্তাহিক)	মথুরানাথ তর্কভূষণ	
?	ফরিদপুর দর্পণ (পাক্ষিক)		
?	যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল (? সাপ্তাহিক)		
?	শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তিকৌমুদী পত্রিকা (মাসিক)		
?	গদ্যপ্রসূন (মাসিক)	মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	ঢাকা হইতে প্রকাশিত
?	গদ্য মাসিক (মাসিক)	ঐ	ঐ
১৮৬২			
জানুয়ারি	বিশ্বমনোরঞ্জন (সাপ্তাহিক)		আজিমগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) হইতে প্রকাশিত। স্বত্বাধিকারী—নবকিশোর সেন।
জানুয়ারি	ভারতরঞ্জন (সাপ্তাহিক)		ইহারও স্বত্বাধিকারী নবকিশোর সেন।
এপ্রিল	মঙ্গলোদয় (সাপ্তাহিক)		
১২ মে	শুভকরী পত্রিকা (মাসিক)	রামসদয় ভট্টাচার্য্য	বালীগ্রামে প্রতিষ্ঠিত শুভকরী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৪ মে	চিত্তরঞ্জিকা (মাসিক)		ঢাকা কলেজের ছাত্র সারদাকান্ত সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
? জুন	অমাবস্যা (মাসিক)		
? জুন	বঙ্গোজ্জ্বল (সাপ্তাহিক)		
জুন	ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা (সাপ্তাহিক)	রামচন্দ্র ভৌমিক	
? সেপ্টেম্বর	অবকাশরঞ্জিকা (মাসিক)	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	
১৮৬৩			
জানুয়ারি	অমৃতপ্রবাহিণী (পাক্ষিক)	বসন্তকুমার ঘোষ	যশোহর হইতে প্রকাশিত।
জানুয়ারি	সংবাদ ভারতবন্ধু (? সাপ্তাহিক)		মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র।

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
জানুয়ারি	আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা (সাপ্তাহিক)	দ্বারকানাথ দাস	
ফেব্রুয়ারি	রহস্য-সন্দর্ভ (মাসিক)	রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রাণনাথ দত্ত	'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র অভাব পূরণার্থ এই সচিত্র মাসিকপত্রখানি প্রকাশিত হয়।
এপ্রিল	গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা (মাসিক···)	হরিনাথ মজুমদার	কুমারখালি হইতে প্রকাশিত।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

এপ্রিল	অবোধবন্ধু (মাসিক)	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	অল্প দিন চলিয়া ইহার প্রচার রহিত হয়। ১৮৬৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা পুনঃ-প্রচারিত হয়।
জুন	সাহিত্য সংক্রান্তি (মাসিক)		যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ইহাতে লিখিতেন।
১৫ জুন	ভারত পরিদর্শন (সাপ্তাহিক)	যদুনাথ তর্কভূষণ	প্রথম কয়েক মাস শান্তিপুর কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী নবেম্বর মাস হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের পুরাণ-সংগ্রহ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত।
জুলাই	ঢাকাদর্পণ (সাপ্তাহিক)	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	
আগস্ট	বামাবোধিনী পত্রিকা (মাসিক)	উমেশচন্দ্র দত্ত	মহিলাপাঠ্য মাসিক পত্রিকা।

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
? সেপ্টেম্বর	উদ্যোগবিধায়িনী (মাসিক)		পাবনা উদ্যোগবিধায়িনী সভার মুখপত্র।
৩০ নবেম্বর	সচিত্র ভারত সংবাদ (পাক্ষিক)		
১৮৬৪			
জানুয়ারি	রচনাবলী (মাসিক)		রঙ্গপুর হইতে প্রকাশিত।
জানুয়ারি	কাব্যপ্রকাশ (মাসিক)	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	ঢাকা হইতে প্রকাশিত।
মার্চ	পাবনাদর্পণ (মাসিক)	রামসুন্দর রায় ও কাশীনাথ মিশ্র	পাবনা হইতে প্রকাশিত।
এপ্রিল	শিক্ষাদর্পণ। ও সংবাদলার (মাসিক)	ভূদেব মুখোপাধ্যায়	
মে	ধর্ম্মপ্রচারিণী (মাসিক)	অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রনাথ গুহ	বেহালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিণী সভার মুখপত্র।
? সেপ্টেম্বর	হিন্দু ইণ্টারপ্রীটার (পাক্ষিক)		দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্র—কলিকাতার গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
অক্টোবর	ধর্ম্মতত্ত্ব (মাসিক)		ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রস্বরূপ ছিল।
? ডিসেম্বর	পরিদর্শন (মাসিক)	যদুনাথ তর্কভূষণ	সাপ্তাহিক 'ভারত পরিদর্শন' এক বৎসর যাইতে-না-যাইতে লোপ পাইলে, ইহা মাসিক আকারে 'পরিদর্শন' নামে বাহির হয়।
১৮৬৫			
জানুয়ারি	সত্যান্বেষণ (মাসিক)	জগন্মোহন তর্কালঙ্কার	বউবাজার ব্রহ্মোপাসনালয় হইতে প্রকাশিত।
মার্চ	বিজ্ঞাপনী (সাপ্তাহিক)	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	ঢাকা হইতে প্রকাশিত।
এপ্রিল	হিন্দু হিতৈষিণী (সাপ্তাহিক)	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	ঢাকা হিন্দু হিতৈষিণী সভার মুখপত্র।
১৭ এপ্রিল	রাজনীতি সংগ্রহ (সাপ্তাহিক)	রামগোপাল বসু মল্লিক	
জুন	বিদ্যোন্নতিসাধিনী (মাসিক)	হরচন্দ্র চৌধুরী	শেরপুর (ময়মনসিংহ) বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভার মুখপত্র। ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত ইহাই প্রথম সাময়িক-পত্র।
জুলাই	সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী (ত্রৈমাসিক)	লালমাধব মুখোপাধ্যায়	জোড়াসাঁকো প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত।
? ডিসেম্বর	হিন্দুরঞ্জিকা (মাসিক)	শ্রীনাথ সিংহ রায়	বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত।

সংবাদ সাগর

পুস্তক সংখ্যা ৪৪১। ৩৯ আষাঢ় সোমবার ১২৫৯ বাং। ইং ১১ জুলাই ১৮৫২ সাল। (নূতন সংখ্যা ৪০।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

—০০—

১ জুলাই ১৮৫২।—শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র রায়, জামসেদ্‌পুর টাটার কুলি-রেজিষ্টারী এবং ই. বি. ক্রাফ্‌টর সাহেব টিটা খাংরের জেলি অফিসর নিযুক্ত হইলেন।

২ জুলাই ১৮৫২।—শ্রীযুক্ত ই. ই. উইকস সাহেব বালেশ্বর জিলার প্রেসীডেন্সী কালেক্টর এবং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

শ্রীযুক্ত রবিনট এণ্ডিলি সাহেবের অনুপস্থান জিলা অলবারাজা না হওন সময়ে শ্রীযুক্ত সি. ই. লাল সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

৪ জুলাই ১৮৫২।—শ্রীযুক্ত বাবু মাহবেন্দু চৌধুরী যিনি রাজশাহিস্থ হালদার বংশের মুন্সেফ ছিলেন তিনি প্রথম শ্রেণীস্থ মুন্সেফ পদে উন্নত হইলেন।

সংবাদ সাগর

৩০ আষাঢ় সোমবার ১২৭৯।

—০—

বিডন সাহেব।

উকিল বিডন সাহেবের নাম বোধ করি পাঠকগণের অচেনা থাকিতে পারিবেক তিনি এক বার কোনও বাঙ্গিয়া হইলে টা: কুসের মোকদ্দমা প্রধান বিচারালয়ের ব্যবস্থাধীনে আনিয়া কমিসনর ও তৎনিম্ন সংস্থাপনালক্ষি দিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ছিলেন, অধুনা তিনি স্বয় পূর্ব্বের স্থানে আলোক দিবার যে এক নূতন ফন্দি উঠিয়াছে, প্রাহা নিবারণ করণ অন্য পুনরায় কোমর বান্ধিয়া সুপ্রিম কোর্টে গত বৃহস্পতিবারে এক মোসন করিয়াছিলেন, বিজবর বিচার পতিগণ ঐ বিষয়ে মনোযোগ করিবার অভিপ্রায় ব ক্ত করিয়াছেন, পরে কি হয় বলা যায় না।

—০০—

শ্রীরামপুর হইতে শশধর নামক এক নূতন সংবাদ পত্র প্রকাশ হইয়াছে শ্রুত হইলাম, কিন্তু অদ্যাবধি আহা আমারদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

—০০—

আমরা সিটিজন পত্র পাঠ করিয়া এক ভয়ানক হত্যার ব্যাপার অবগত হইলাম, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে সুখড়র গ্রামে এক সামান্য জাতির স্ত্রী মদনোন্মত্তা হইয়া স্বীয় উপপতি সংস্রাগে নিযুক্ত থাকন কালীন ঐ দুশ্চরিত্রার এক ৮।১০ বয়স্ক সন্তান তাহা দেখিয়াছিল, ব্যভিচারিনী কর্ত্তৃপিন দুষ্কর্ম্ম সংসাগন করিবার উপায় অন্য কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সহস্র আপন পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, হায়! কি পিতাপ্রাণ মদনরাজ তিনা করিতে পারেন?

—০০—

রাসমণী দাসী ও মথুরামোহন বিশ্বাস এই দুই মানুষ মহাশয়েরা ছাড়াছাড়ি এবং টাকা ভাগা ভাগির বিষয় প্রায় সকলেই সুবিদিত আছেন, তাহা আমারদিগের লেখা বাহুল্য, শ্রীমতি রাসমণির সুপাত্র দৌহিত্র শ্রীযুত বাবু যদুনাথ দে সুবিবেচনা ও সৎপরামর্শ প্রদানপূর্ব্বকমথুরামোহনের প্রতি প্রিমকোর্টেদেঅভিযোগ রাইয়াছিলেন তাহা তত্রত্যপ্রাড্‌বিবাকগণঅতিসূক্ষ্ম সুবিবেচনা করিয়া রামমণিরপক্ষে ডিক্রীদিয়াছেন, মথুর বাবু এক্ষণে "পুনঃ মুসিকাহও" হইলেন, দেখা যাইক পরে কি হয়, বাবুজি কি শ্রীমতির পর থাকেন, কি পুনরায় আপনার হন, যদ্যপি পর থাকেন, তবেই পোয়াপৌচি, নতুবা আপনার হইতে পারিবেক, "শঙ্কর ছিলেন ঘটিবাটী গোল ছিলে মুখে নাখি"।»

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদ সাগর' পত্রিকার একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

[গত সংখ্যার 'পল্লী-শ্রী' দ্রষ্টব্য]

প্রকাশকাল	নাম	সম্পাদক	মন্তব্য
১৮৬৬			
? ফেব্রুয়ারি	চিকিৎসক (মাসিক)		মেডিক্যাল কলেজের বাংলা ক্লাসের ছাত্রগণ কর্তৃক প্রকাশিত চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্র।
ফেব্রুয়ারি	সর্ব্বার্থ সংগ্রহ (মাসিক)		
সেপ্টেম্বর	নব-প্রবন্ধ (মাসিক)	তিনকড়ি ঘোষাল	
? সেপ্টেম্বর	বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা (মাসিক)		বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। ১২৭৪ সালের পৌষ মাস হইতে ইহা ভূদেব-পরিচালিত 'শিক্ষা দর্পণে'র সহিত সম্মিলিত হয় এবং 'শিক্ষা দর্পণ। ও মাসিক পত্রিকা' নাম ধারণ করে।
? ডিসেম্বর	মুর্শীদাবাদ সংবাদসার (পাক্ষিক)		মুর্শিদাবাদ হইতে প্রচারিত।
১৮৬৭			
জানুয়ারি	তত্ত্ববিকাশিনী (মাসিক)		ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।
জানুয়ারি	পল্লী-বিজ্ঞান (মাসিক)	রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়	'সংস্কার সংশোধিনী' পত্রিকার পর, বিক্রমপুর হইতে প্রকাশিত ইহাই দ্বিতীয় মাসিক পত্র।
ফেব্রুয়ারি	অবোধ-বন্ধু (মাসিক)	যোগেন্দ্রনাথ ঘোস	ইহা প্রকৃতপক্ষে 'অবোধ-বন্ধু'র দ্বিতীয় পর্য্যায়। ১৮৬৩ সনের এপ্রিল মাসে 'অবোধ-বন্ধু' প্রথম প্রকাশিত হয়।
সেপ্টেম্বর	প্রকৃতরঞ্জনন্দিনী (মাসিক)	সত্যব্রত সামশ্রমী	ধর্ম্মমূলক মাসিক পত্রিকা। বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা বিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকিত।
সেপ্টেম্বর	অবকাশ-বন্ধু (মাসিক)	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	
নবেম্বর	নব পত্রিকা (মাসিক)	হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	

দেশলাইয়ের ইতিহাস

পৃথিবীর আদিম যুগে মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত না। তারা থাকত গাছের গর্ত্তে অথবা পাহাড়ের গুহায়, পরত গাছের বাকল আর খেত কাঁচা মাংস। মানুষ যেদিন প্রথম আগুনের পরশ পেলে আর তার ব্যবহার শিখলে, সেদিন থেকে সে আগুনকে নিভতে দেয় নি। কোথা থেকে যে এ আগুন প্রথম এসেছিল, সে কথা সঠিক বলা যায় না। হয়তো কোন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাৎ অথবা বনের দাবানল থেকেই মানুষ প্রথম আগুন পেয়েছিল। যাই হোক, আগুন পাবার পর থেকে সে তার রীতিমত পরিচর্য্যা করেছিল ;—বৃষ্টিতে অথবা জালানির অভাবে তাকে নিভতে দেয় নি ; এমন কি কোথাও যেতে হ'লেও আগুনকে সঙ্গে নেওয়া হ'ত।

ক্রমে মানুষ জানলে দুটো শুকনো কাঠ ঘ'ষে আগুন করার উপায়। কিন্তু কাঠ ঘষলেই আগুন বেরোয় না—তার কায়দা সকলে জানত না ব'লে সকলে আগুন তৈরি করতে পারত না।

তারপর মানুষ লোহার ব্যবহার শিখলে। এখন সে চকমকি-পাথর ও লোহা ঠুকে আগুনের ফুলকি বার করতে লাগল। সেই ফুলকি—শোলা বা আর কিছু শুকনো জিনিসের ওপর ফেলে আগুন ধরানো হ'ত। মানুষ কিন্তু এতেই না থেমে আগুন তৈরি করার আরও সহজ উপায় ভাবতে লাগল। অনেক দিন পরে, দেশলাই আবিষ্কার হওয়ায় আগুন পাওয়ার ব্যবস্থা সহজ হয়ে গেল।

১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে গড্‌ফ্রে হক্‌উইজ দেশলাইটা অনেকখানি তৈরি ক'রে এনেছিলেন। ১৮০৫ সালে প্যারির একজন লোক কাঠকে লম্বা লম্বা টুকরোয় কেটে তাতে গন্ধক মাখিয়ে, মুখের দিকে পটাসিয়াম ক্লোরেট আর চিনি মাখিয়ে দেশলাই-কাঠি তৈরি করেন। এ কাঠি জ্বালতে হ'লে পটাস আর চিনি মাখানো মুখটাকে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডে ডোবাতে হ'ত। ঐ দেশলাই কোথাও নিতে হ'লে এক শিশি অ্যাসিডও সঙ্গে নিতে হ'ত। কিন্তু ঐ অ্যাসিড বড় ভয়ানক। কাপড়ে পড়লে কাপড় পুড়ে যায়, হাতে লাগলে হাতে ফোস্কা হয়। তা ছাড়া এ ভাবে দেশলাই ব্যবহার করতে পয়সা লাগত অনেক। কাজেই সকলে এ রকম দেশলাই ব্যবহার করতে পারত না।

ব্যবহারের উপযোগী দেশলাই প্রথম তৈরি করেন—জন ওয়াকার নামে একজন ইংরেজ। তিনি সরু সরু কাঠির মুখে অ্যান্টিমনি ও পটাস লাগিয়ে দিলেন এবং প্রত্যেক বাক্সের পাশে একটা ভাঁজ করা শিরিষ কাগজ আটকে দিলেন। দেশলাই জ্বালতে হ'লে ঐ ভাঁজের মধ্যে কাঠির মুখটা দিয়ে এক হাতে কাঠিসুদ্ধ ভাঁজটাকে টিপে ধরতে হ'ত, আর অন্য হাতে কাঠিটাকে ঘ'ষে দিতে হ'ত। কিন্তু এতে সময় সময় গোটা বাক্সটাই জ্ব'লে উঠত। মানুষ এখন খুঁজতে লাগল এমন একটা জিনিস, যা কম তাপে জ্ব'লে ওঠে।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, প্রায় একই সময়ে, জন ওয়াকার এবং জার্মানি ও অষ্ট্রিয়ার লোকেরা একরকম দেশলাই তৈরি করলেন। এ দেশলাইয়ের কাঠিগুলো অনেকটা এখনকার কাঠির মত। ফস্‌ফরাসের সঙ্গে পটাস, গন্ধক, সোরা, সীসা প্রভৃতি মিশিয়ে তার মাথার বারুদ তৈরি হয়েছিল। এ দেশলাই ব্যবহারেও বিপদ ছিল। দুঁটো কাঠির মধ্যে ঘষাঘষি হ'লে দেশলাই জ্ব'লে উঠত ; ভুলে দেশলাইটাকে মাড়িয়ে ফেললে বাক্সসুদ্ধ দেশলাই জ্ব'লে উঠত। পকেটে দেশলাই নিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিলে বা চেয়ারে বসতে গিয়ে হাতলের ধাক্কা লাগলেও দেশলাই জ্ব'লে উঠত।

কিন্তু মানুষ যা করতে চায়, তার শেষ না ক'রে সে ক্ষান্ত হয় না। 'সেফটি (safety) দেশলাই' বার করলেন—জে. ই. লাওস্টরম নামে সুইডেনের একজন লোক। তিনি দেশলাইয়ের কাঠিতে ফস্‌ফরাস না দিয়ে বাক্সের খোলের দুপাশে ফস্‌ফরাস মাখিয়ে দিলেন। কাঠি বাক্সের ফস্‌ফরাস মাখানো দিকে ঘষলেই জ্ব'লে ওঠে। এখন আমরা এই দেশলাই ব্যবহার করি।

পল্লী-পার্ব্বণ—পৌঝুরি

শ্রীচারুচন্দ্র সেন

পল্লী আমাদের জন্মভূমি, পল্লী আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র, পল্লী আমাদের সমাধিস্থল। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা পল্লীমায়ের সহিত সর্ব্বতোভাবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। পল্লীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখের সহিত আপনাদিগকে জড়িত রাখিয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্ণয় করিতে পারিলে আমরা মায়ের প্রকৃত সন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব। পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা সেই-জন্য সকলেরই কর্ত্তব্য। আমরা আজকাল লেখাপড়া শিখিবার ও অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য পল্লী ছাড়িয়া শহরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ফলে পল্লীর উন্নতি অবহেলিত হইতেছে। শহর ছাড়িয়া গ্রামের দিকে এখন আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। অতীত কালে পল্লীর বুকে যে সকল রত্নরাজি লুক্কায়িত ছিল, তাহার সন্ধান করিয়া দেশের লোকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলে অতীত-গৌরবের মহিমায় আমাদের ভবিষ্যৎ পন্থা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। দেশের প্রবাদবাক্য, ছড়া, কবিতা, গান, ব্রতকথা ইত্যাদির মধ্যে দেশের একটা নিজস্ব ধারা বর্ণিত হইয়াছে। সেই ধারার সহিত বর্ত্তমান জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করিলে দেশের অনেক উপকার করা হয়। এমনই একটি পার্ব্বণ সম্বন্ধে সাধারণের মুখে প্রচারিত গাথা নিম্নে বিবৃত হইল। পার্ব্বণটির নাম—পৌঝুরি।

সারা বৎসর ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অবিশ্রাম পরিশ্রমের পর পল্লীমায়ের চাষী দুলালগণ পৌষ মাসে ধান্য কাটিয়া গোলাজাত করে এবং পুনরায় সম্বৎসরের খরচের যোগাড় করিয়া আনন্দে কালাতিপাত করে। এই আনন্দের পরিস্ফুরণই পৌঝুরির আখ্যানভাগ। বহু পূর্ব্বে মাঘ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ গণনা করা হইত। পৌষ মাস বৎসরের শেষ ভাগ এবং এই মাসে সকলের ধান্যাদি আমদানি হইত বলিয়া অতি আদরের সহিত তাহার সম্বর্দ্ধনা করা হইত। পল্লীর শ্রী এই পার্ব্বণ-কথার ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মেদিনীপুর জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক প্রকার ছড়া প্রচলিত আছে। পৌঝুরির গান জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অংশে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি হইতে পৌষ মাসের শেষ মকর-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রদোষকালে কুমারী বালিকাগণ কর্ত্তৃক এই গান গীত হয়। একটি মাটির মালসাতে গোময় ও মাটি ভর্ত্তি করিয়া তাহার উপর গাঁদাফুল-সংযুক্ত পাঁচটি কাঠি পুঁতিয়া দেওয়া হয়। প্রতি সন্ধ্যায় বালিকাগণ সিন্দুর এবং এক একটি কড়ি ও কিছু চাউল লইয়া পৌঝুরির পূজা করিয়া থাকে এবং সমবেতকণ্ঠে এই ছড়া গাহিয়া নীরব কুটীর মুখরিত করিয়া তুলে।—

পৌষ মাসের পৌঝুরি
ধান-কাপাসে ঘর করি।
এস পৌষ যেও না
জন্ম জন্ম ছেড় না।
যদি বা ছাড়বে তুমি
পরাণে মরব আমি।
এক কড়া কড়ি নয় দুই কড়া কড়ি
তা দিয়ে গো পূজা করি সোনার পৌঝুরি।
পৌঝুরি গো এস
পিঁড়ি নিয়ে ব'স।
হব তোমার দাসী
জলে জলে ভাসি।
আম কাঁঠালের পিঁড়িখানি ঝিকি যৌ মৌ করে
তায়ে বস গো রাইঠাকুরাণী জল গ্রহণ করে।
জল গ্রহণ করতে করতে হ'ল সন্ধ্যার বেলা
এখান থেকে সন্ধ্যা দিলাম মাকড় গাছের তলা।
ফুলগাছ ফুলগাছ ঝাকড়ি
সতীন বেটি মাকড়ি।
সাত সতীনের সাত কৌটা
আমার আছে গো নব কৌটা।

নব কৌটা নড়ে চড়ে
সাত সতীনের মুখটি পুড়ে।

* * *

তুষলা গো রাই
তোমার দৌলতে মোরা ছ'বুড়ি ছ'টা খাই।
ছ'বুড়ি ছ'টা দুধের লাড়ু, গাঙ্গ সিনানে যাই
গাঙ্গের জলে রাঁধি বাড়ি মকরের জল খাই।
চার মাস বরষা পুখুর না যাই;
পুখুরের পাতাটি ঢলা না ঢুলি?
ইরি মিরি মুক্তার ঝুরি,
সেই মুক্তা জাগে
ভায়ের বিয়েতে লাগে।
ভাই মণ্ডল কানে কুণ্ডল দিব—দাদার বিয়ে
আলপিনানে চাল নাইকো নাচব দেয়ে দেয়ে।
সোনার খাটে হেলন দিয়ে রূপার খাটে পা গো
পাখ নয় পক্ষী নয় তুষু (১) করে খেলা গো।
আর ডেকো না সোনার কোকিল
কৃষ্ণ-হারা হয়েছি গো
দেখ গো দিদি রোহিণী,
সত্য যুগে বাণ মেরেছে,
অগম জলে কদমতলে ডুবেছে আমার ধনমণি।
কাদা খেয়ে উঠল ভ্রমরের ডালা
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে ধর বরণ-ডালা।

* * *

লাউগাছ লাউগাছ উঠল চালে
পৌঝুরি যাবেন মহাপালে
ভাত খাবে গো সোনার থালে
মুখ ধোবে গো ঝারির জলে।
পান সুপারি দিবেন গালে॥
মামীর পুখুরে ফেললাম বাটি
মামীর হ'ল চাঁদপানা বেটি।
বেগুন বাড়িতে ফুটল ফুল
আমার মামীর সাত হাত চুল।
ওরে মাকটি দিয়ে যাবে বর
আমার মা-বাপ লক্ষেশ্বর।
সোনার বাটিতে চুয়াচন্দন রূপার বাটিতে তেল
কৃষ্ণকে মনে করে বুকে রইল শেল।
কলিকাতার এলাচদানা বিষ্ণুপুরের পান
বড় করে বাঁধ খিলি তুষুর হবে অপমান।

* * *

ওরে মহেশ্য
দে না পয়সা।
রাখে কিনব পঞ্জরী
তুষু মাকে বিদায় দিয়ে হব রথের ভিখারী॥
আশুথ পাতাটি চৌচাকুলে বেনা পাতাটি সরু
হেঙ্গল দিয়ে সেঙ্গল দিব ননদিনী মরু।
ননদিনী মরিলে কি বলে কাঁদিব
সরায় চাল রেখে দরিয়ায় ঝাঁপ দিব॥

* * *

কুচ কুচতি কুচর বান
কেন রে কুচ এতক্ষণ।
ধান এসেছে ছালা ছালা
তা তুলতে গেল বেলা

[এইরূপে—ডাল এসেছে, টাকা এসেছে, কড়ি-সরিষা ইত্যাদি]

* * *

১। চাল গোটা দুই রাঁধ গো সখী
ভাত গোটা দুই খাই।
কড়ির চাঙ্গারী মাথায় দিয়ে বামুনঘর যাই॥
বামুনভাই বামুন ভাই ঘরে আছ হে
আমার তুষুলার বিয়ে হবে শনি মঙ্গলবারে।
কড়ি দিব হে ঝারে ঝারে
পৈতা দিও হে একুশ ভারে॥

২। চাল গোটা দুই ইত্যাদি
* * * নাপিতঘর যাই
আলতা দিও হে ভারে ভারে॥

৩। চাল গোটা দুই ইত্যাদি
* * * ময়রাঘর যাই—
মিষ্টি দিও হে ভারে ভারে॥

[তারপর তেলীঘর, দোকানীঘর, গয়লাঘর ইত্যাদি]

সিন্দুর ঠেকাতে রেখে তুষুর চাল-কড়ি
বরণ-ডালা মাথায় করে দণ্ডবৎ করি॥

(১) তুষুর অপর নাম তুষুলা

সংক্রামক রোগে শুশ্রূষার ব্যবস্থা

শ্রীবুদ্ধ

পরলোকগত স্বনামখ্যাত ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয়ের বাড়িতে এক বৈঠকে কথাপ্রসঙ্গে একবার সংক্রামক রোগের শুশ্রূষার কথা ওঠে। তিনি এই সম্পর্কে যা বলেছিলেন, 'পল্লী-শ্রী'র পাঠকপাঠিকার জন্য আমার দিনলিপি থেকে তার মর্ম্মার্থ সঙ্কলন ক'রে দিলুম। বাঙালীর সংসারে এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক সময় অর্থনাশ ও মনস্তাপ সহ্য করতে হয়, তা-না বললেও চলে।

রোগীর শুশ্রূষার ভার প্রধানত সব দেশেই রমণীদের হাতে ন্যস্ত থাকে। নারীপ্রকৃতি স্বভাবতঃই ধীর মধুর ও স্নেহপ্রবণ। শ্রমশীলতা ও সুহিষ্ণুতা তাঁদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। রোগীর সেবার ভার যে রমণীদের হস্তে অর্পিত হয়, সেটা যেন একপ্রকার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল ব'লেই মনে হয়।

য়ুরোপে সেবা-শুশ্রূষা শিক্ষার সুব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকগণ সেই শিক্ষা লাভ ক'রে শুশ্রূষা-ব্যবস্থা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন ক'রে থাকেন। আমাদের দেশে কিছুদিন থেকে বড় বড় শহরে স্ত্রীলোক-'নার্সে'র ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময় হিন্দু-পরিবারে এদের দ্বারা সেবাকার্য্য সুবিধাজনক হয় না। অনেক সময় জাতি ও ধর্ম্ম নিয়েও অনেক স্থলে গোলমাল ঘটে।

পরিবারস্থ স্ত্রীলোকের ওপর রোগীর সেবা-শুশ্রূষার ভার রাখতে হ'লে এ বিষয়ে তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। সেবাকারীর অজ্ঞতাবশত অনেক সময় পরিবারের মধ্যে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

যে কোন সংক্রামক রোগে, রোগীর সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির মেশামেশি যত কম হয় ততই মঙ্গল। সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে এজন্য পৃথক ক'রে রাখা উচিত। রোগীর জন্য এরূপ একটি স্বতন্ত্র ঘর নির্ব্বাচন করা উচিত, যার ভিতর যথেষ্ট আলো ও হাওয়া ঢুকতে পারে। বায়ু ও আলোকবিহীন গৃহে রোগ ও রোগের সংক্রামক গুণ বেড়ে যায়, তা ছাড়া রোগীর চিত্তও প্রফুল্ল থাকে না। গৃহটি এক পাশে হ'লেই ভাল হয় এবং সেখানে পরিবারস্থ লোকেদের যাতায়াত যত কম হয় ততই ভাল। গৃহের ভিতর বা গৃহের নিকট দিয়ে সর্ব্বদা লোকের আনাগোনা থাকলে রোগীর বিশ্রামের শুধু যে ব্যাঘাত ঘটে তা নয়, সুস্থ ব্যক্তির শরীরেও রোগ সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

রোগীর শয়নঘরে গৃহসজ্জা যত কম থাকে ততই রোগীর পক্ষে শুভ। গৃহসজ্জা যত বেশি হয় গৃহের ভিতর বায়ু সঞ্চালন ততই কম হয়, সুতরাং রোগের উপশমের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। যাঁরা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করবেন তাঁদের আহার, বিশ্রাম ও শয়নের জন্য রোগীর গৃহের পার্শ্বে আর একটি ঘর থাকা দরকার। শুশ্রূষাকারীর শয়নের জন্য ভিন্ন বিছানা রাখা উচিত। রাত্রিকালে রোগীর সহিত এক বিছানায় শয়ন করা নিতান্ত দোষের। অনেক স্থলে স্বামী থেকে স্ত্রীর অথবা স্ত্রী থেকে স্বামীর দেহে এই ভাবে ক্ষয়কাশ প্রবেশ করে। বিছানা ছাড়া ঔষধ ও পথ্যাদি রাখবার জন্য একটি টেবিল, একটি চেয়ার বা টুল, একটি ফুলদানি, রোগীর কাপড়-চোপড় রাখার জন্য একটি আলনা, একটি পিকদানি, একটি জলের কুঁজো ও গেলাস্ এবং একটি ঘড়ি রোগীর ঘরে থাকলেই যথেষ্ট। ঘরটি বড় হ'লে বড় জোর একটি আরাম-চৌকি রাখা যেতে পারে। কেন না, যিনি সেবা করবেন, প্রয়োজনমত তিনি উহা ব্যবহার করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায়—আলমারি, সিন্দুক, বাক্স, বোঝা করা ময়লা কাপড় ও বিছানায় রোগীর ঘর ভরাট হয়ে আছে। মনে রাখা উচিত যে, সংক্রামক রোগের বীজাণু—বস্ত্র বা শয্যাদির সঙ্গে একবার সংলগ্ন হ'লে তাকে সহজে দূর করা যায় না এবং ঐ বস্ত্র ও শয্যা থেকে রোগের বিস্তার ঘটে।

রোগীর মলমূত্র ত্যাগের আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত। অধিকাংশ সংক্রামক রোগে মলমূত্রের সহিত ব্যাধির বীজাণু দেহ থেকে নির্গত হয়। অতএব গৃহের যে

জায়গাটি পরিবারের মলমূত্র ত্যাগের জন্য ব্যবহার করা হয়, সেখানে রোগীর গমন যুক্তিযুক্ত নয়। সংক্রামক রোগ হ'লে রোগীর জন্য পৃথক পাত্র রেখে দিয়ে, মলমূত্র ত্যাগের পর—তার সঙ্গে বিশোধক ঔষধ (disinfectant) মিশিয়ে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা উচিত।

যিনি শুশ্রূষা করবেন, বস্ত্রাদি ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁকে সাবধান হতে হবে। যে কাপড় প'রে রোগীর শুশ্রূষা করা হবে, সেই বস্ত্রে বাড়ির অন্য কোন জায়গায় যাওয়া নিরাপদ নয়। বাঙালীর ঘরে এই নিয়ম পালনে বিশেষ অমনোযোগিতা দেখা যায়। রোগীর ঘর থেকে বাইরে এসে বিশোধক সাবান দিয়ে হাত-পা ধুয়ে বস্ত্রপরিবর্ত্তন ক'রে গৃহের অন্যান্য কাজ করা উচিত। স্ত্রীলোকদের এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য। প্রায়ই দেখা যায়, তাঁরা রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে সেই অবস্থাতেই রান্নাঘর বা ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে গৃহপরিজনের আহারাদির ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু এই সামান্য অনবধানতার ফলে পরিবারে রোগের বীজ ছড়িয়ে পড়ছে—একথা তাঁরা বোঝেন না। অবশ্য রোগ সংক্রামক কি না, তা প্রথম অবস্থায় ঠিক করা বড়ই কঠিন, সুচিকিৎসকেরাও অনেক সময় এ বিষয়ে নিশ্চয় ক'রে কোন কথা বলতে পারেন না। তবুও রোগীর ছোঁওয়া কাপড় প'রে বাড়ির অন্যত্র না যাওয়াই ভাল।

রোগীর ঘরের বাইরে তার মলমূত্রত্যাগের পাত্র, জল, সাবান, বিশোধক ঔষধাদি সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযোগী ক'রে রাখা উচিত। যথাস্থানে থাকলে দরকারের সময় এগুলির জন্যে ছুটাছুটি করতে হয় না, সুতরাং রোগী বা শুশ্রূষাকারীর কোন অসুবিধা হয় না। যাদের অবস্থা সচ্ছল নয়, যাদের গৃহে স্থানাভাব, লোকবল কম এরূপ পরিবারে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে রোগীকে সাধারণ চিকিৎসালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। হাসপাতালে সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষার যেরূপ সুব্যবস্থা হয়েছে, সাধারণ লোকের বাড়িতে সেরূপ হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

শুশ্রূষা সম্বন্ধে আর দুই একটি বিষয়ে নজর রাখা কর্ত্তব্য। যাঁদের শিশু-সন্তান পালন করতে হয়, তাঁদের উপর রোগীর সেবার ভার না দেওয়াই ভাল। শুশ্রূষার ভার পালা ক'রে দুই তিন জনের উপর রাখা উচিত। অনেক সময় দেখা যায়, তিন চার জন লোক রোগীর কাছে দিন রাত ব'সে আসেন। এতে কোন দিক দিয়াই ভাল হয় না। পালা ক'রে কাজ করলে অল্প পরিশ্রমে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে পারা যায়। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যেন সময়ে অসময়ে রোগীর ঘরে ভিড় ক'রে রোগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত এবং রোগীর ঘরের হাওয়া কলুষিত না করেন। মনে রাখা উচিত, এরূপ ভালবাসার অত্যাচারে রোগের উপশম হওয়া দূরে থাক, রোগের বিস্তারই হয়ে থাকে।

মেদিনীপুরে সমবায় সম্মিলন

গত ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মেদিনীপুরে বিভাগীয় সমবায় সম্মিলন হয়েছিল। বাংলার সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ মুকুন্দবিহারী মল্লিক এই সম্মিলনের উদ্বোধন করতে মেদিনীপুরে এসেছিলেন এবং মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় এরূপ সম্মিলন এই প্রথম, তাই সেদিনকার অধিবেশন দেখতে স্থানীয় সরোরা সিনেমাগৃহে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম. এ., বি. এল. তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। তারপর সমবায় বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এম. বি. মল্লিক সভার উদ্বোধন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সমবায়-নীতির মূলমন্ত্র প্রত্যেককে তার নিজের ও অপরের জন্য ভাবতে শেখানো। সমবায়ীকে স্বাবলম্বন ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা দেওয়াই সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হ'লে প্রত্যেক সমবায়ীকেই তার সহকর্ম্মীর কাছ থেকে

কোন কিছু গোপন না ক'রে খোলাখুলিভাবে চলতে হবে। সমবায়ীর মনে অসাধুতার স্থান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এক সমবায় সমিতির বিভিন্ন সভ্যের বিভিন্ন রকম অভাব থাকতে পারে, তা সত্বেও সেই অভাব দূর করতে প্রত্যেক সমবায়ীকেই চেষ্টা করতে হবে। যে সভ্য চাষ করেন তাঁর হয়তো বলদ কেনবার জন্যে টাকার দরকার; সমিতি তাঁকে টাকা যোগাবেন, কিন্তু তাঁকেও মনে রাখতে হবে যে, তাঁর হাতে টাকা হ'লেই সকলের আগে সমিতির দেনা শুধতে হবে। যদি তিনি মনে করেন যে, সমবায় সমিতির ব্যবস্থামতে ঋণের দায় জামিনদারকেও মাথা পেতে নিতে হয়, অতএব তাঁর টাকা শোধ না দিলেও চলতে পারে, তা হ'লে তিনি সমবায় প্রথার মূলে আঘাত করবেন। এ রকম সভ্য থাকলে সমবায় সমিতি ভেঙে যেতে বাধ্য।

আইনকর্ত্তারা মনে করেছিলেন যে, সমবায়ী তার দায় সম্বন্ধে নিজে থেকেই সজাগ থাকবে, তাই তাকে টাকা দিতে বাধ্য করবার জন্য আইনে কোন বিধান রাখেন নি। তবুও আইনকর্ত্তার উদ্দেশ্য যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, এমন কথাও বলা যায় না। বাংলার এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে লোকে সমবায় আন্দোলনের ভাল দিকটা দেখতে পেয়েছে, তারা মিতব্যয়িতা শিখেছে, অপরের সঙ্গে একত্র হয়ে নিজেদের অভাব দূর করতে শিখেছে। ২৪ পরগণায় সুন্দরবন অঞ্চলে গোসবা দেখে এলে এই কথাটিই মনে উদয় হয়। সার্ ডানিয়েল হ্যামিল্টনের শিক্ষায় সেখানকার অধিবাসী সমবায় প্রথায় নিজেদের সকল রকম অভাবই মোচন ক'রে চলেছে।

১৯১২ সালের সমবায় আইন থেকে যতটা সুফল পাবার আশা করা হয়েছিল, তা না পাওয়ায় এর ব্যাপকভাবে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে একটি 'বিল' বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় উপস্থাপিত করাও হয়েছে। নূতন আইনে গভর্মেণ্টের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমবায় সমিতিকে সাহায্য ও পরিচালনা করবার, এমন কি অর্থসাহায্য দেবারও বিধান থাকবে। যদি কেউ আইনের বিধি ভঙ্গ করে, তা হ'লে তাকে বাধ্য করার জন্যে দায়িত্বশীল 'অফিসার' ও সুপরিচালিত সমিতিকে ক্ষমতা দেওয়া হবে। এ সকল বিধানের সমালোচনা ক'রে কেউ কেউ বলেন যে, এর ফলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বাধীনতা খর্ব্ব হবে। এ কথার উত্তরে বলা যায় যে, স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, স্বাধীনতা নিয়মানুবর্ত্তিতারই নামান্তর।

বাংলায় ৫১ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা ৭০ জনের উপজীবিকা—চাষ; অতএব তাদের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে না পারলে দেশের কোন উন্নতি হতে পারে না। চাষীর অভাবের অন্ত নেই। এ দেশের লোক পুরুষানুক্রমে একই জমি চাষ ক'রে আসছে। আজ তাকে শিখতে হবে, যে জমির ফসল তার পূর্ব্বপুরুষদের অভাব মিটিয়ে এসেছে, তাতে এখন তার অভাব মিটবে না, তাই তাকে আয় বাড়াবার জন্যে চাষের সঙ্গে অন্য কিছু করতে হবে। সমবায় প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

কৃষি-খাতক আইনের উল্লেখ ক'রে মাননীয় মিঃ মল্লিক বলেন যে, গভর্মেণ্টের উদ্দেশ্য নয় যে, কারুর অযথা ক্ষতি বা কারুর অন্যায়ভাবে সুবিধা হোক। আজ চাষী-খাতক তার দেনা শুধতে পারছে না, তাই তার বাঁচার মত ব্যবস্থা রেখে উদ্বৃত্ত টাকা নিয়ে মহাজনের সঙ্গে তার দেনা সম্বন্ধে একটা রফা করাই আইনের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি সংশোধন 'বিলে'র উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এর দ্বারা বর্ত্তমান আইনের অনেক অসুবিধা দূর হবে। অল্প-মেয়াদী ঋণের টাকা একত্রে পরিশোধ করার প্রস্তাব করা হ'লে ১৯ বা ২১ ধারামতে ব্যবস্থা করার কোন বাধা থাকবে না; সকলের আগে বাকি-খাজনার টাকা দিতে হবে এবং ২৩ ধারামতে আসল খাজনার টাকা কমানো যাবে না।

অতঃপর সভাপতি অভিভাষণ পাঠ করেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় সভাপতির অভিভাষণের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ প্রকাশিত হয়েছে।

মেদিনীপুর বিভাগীয় সমবায় কন্‌ফারেন্সের সভাপতি বি. আর. সেন, আই. সি. এস.-এর অভিভাষণ

ভদ্রমহোদয়গণ,

আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পথে যে কয়টি গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়, আজ তাঁরই একটির সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য আমরা সমবেত হয়েছি। আমি যে সমস্যার কথা বলছি, তার নাম সমবায় আন্দোলন। বিভাগীয় কন্‌ফারেন্সে এর আলোচনা হওয়া খুবই ভাল এবং এরূপ আলোচনার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার সমস্ত গৌরব সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এম. বি. মল্লিক মহাশয়ের প্রাপ্য। যেদিন থেকে তিনি এই বিভাগটির ভার নিয়েছেন, সেদিন থেকেই তিনি আন্দোলনকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন; তাঁকে ঠিকমত চালিত ক'রে জাতীয় জীবনের উপকারে আনার জন্য যা কিছু করা দরকার সমস্তই করছেন। কিছুদিন আগে তিনি ভারতের কয়েকটি প্রদেশে গিয়ে সমবায়-নীতি ও কাজের প্রণালী দেখে এসেছেন। তাঁর এই নূতন অভিজ্ঞতা এদেশে সমবায় ঋণ-দান-ব্যবস্থার উপকারে লাগবে। এ জেলায় যাঁরা জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে সমবায় আন্দোলনের শক্তিতে বিশ্বাস রাখেন, তাঁদের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর কর্ম্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট
মিঃ বি. আর. সেন

সমবায় আন্দোলনকে আমি যে ভাবে দেখতে পাই, আজ সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলব। কাউকে দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই আমাদের চিন্তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠুক।

বাংলায় সমবায় আন্দোলন এখন যে অবস্থায় রয়েছে, তাতে গতির লক্ষণ নেই। পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কটের ফলে উপজাত দ্রব্যের দাম অনেক প'ড়ে গেছে, তাই প্রাথমিক সমিতিগুলির খাতকদের আয়ও ক'মে গেছে। ফসলের দাম যখন বেশি ছিল, তখন যে দেনা তারা ক'রে ফেলেছে, এখন তা শোধ দেওয়া তাদের পক্ষে শক্ত হয়ে পড়েছে। বাকি ঋণের পরিমাণ এত বেড়ে গেছে যে, প্রাথমিক সমিতি ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পক্ষে নূতন ঋণ দান ক'রে আগেকার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হয়েছে। এই সব কারণের সঙ্গে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক-আইনের সংযোগ হওয়ায় গ্রামে ঋণ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। আবশ্যকমত ঋণ না পাওয়ায় কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত হচ্ছে এবং পর্য্যাপ্ত ফসল উৎপাদন না হওয়ায় চাষীর আয় কমছে ও দেনা বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে কতকগুলি সর্ত্তে সুদ মাপ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে; কিন্তু খুব কম লোকের পক্ষেই তার সুযোগ নেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। প্রাথমিক সমিতির সভ্যগণের বর্ত্তমান অবস্থার অনুপাতে সুদের হার বেশি থাকায় বকেয়া ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এর ফলে সারা দেশে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে, সমবায় আন্দোলনের পক্ষে সেটা আদৌ শুভকর নয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, স্বল্প সুদে ঋণ দিতে পারাই সমবায় আর্থিক-ব্যবস্থার একমাত্র নীতি নয়; রিজার্ভ মূলধন গ'ড়ে তুলতে উচ্চহারে সুদের ব্যবস্থা রাখতে হয়; কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করলে এরূপ তর্কে মন সায় দিতে চায় না।

দেশব্যাপী নৈরাশ্যের ভিতরে যেটি আশার সঞ্চার করে, সেটি এই যে, এখন সমবায় আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও হিতকাঙ্ক্ষীরা কি কারণে এই আন্দোলন বর্ত্তমান সঙ্কটময় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাই আগাগোড়া খতিয়ে দেখছেন। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই আন্দোলন ব্যর্থ হবার মূল কারণ সমবায়ীদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব।

সমবায়ের নীতি না শিখিয়েই তাদের সমবায়ের গণ্ডির ভিতর আনা হয়েছিল। আরও এক কথা এই, কেবল ঋণ দেবার ব্যবস্থাতেই সমস্ত আন্দোলনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সমিতির সভ্যগণ সহজে ঋণ পাবার সুযোগ-টুকুই নিয়েছিলেন, তাঁরা শেখেন নি—কি জন্য সে ঋণ শোধ হওয়া দরকার। এ সম্বন্ধে মাননীয় মিঃ এন. আর. সরকার সম্প্রতি যে সব উক্তি করেছেন, তাতে বলেছেন, লোকের যেন ধারণা হয়েছিল, সদাশয় গবর্মেণ্ট তাদের বিপদে সাহায্য করবেন এবং তাদের দেনা মকুব ক'রে দেবেন।

এখন প্রশ্ন এই—এরূপ অবস্থায় কি ভাবে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। গ্রামে যে ঋণ-দান-ব্যবস্থা ছিল, এখন সেটা ভেঙে পড়তে বসেছে, এখনই সমবায় আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এরূপ বলা যেতে পারে যে, গ্রামবাসীর ঋণভার কমাবার ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্র থেকেই করা হয়, তা হ'লে রাষ্ট্রকেই দেখতে হবে ঋণ-দানের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে কি না, এবং সে ব্যবস্থায় গ্রামবাসীর দৈনন্দিন অভাব মিটতে পারে কি না ও তাকে আবার ঋণ করার দায় থেকে বাঁচাতে পারে কি না। এ সবই এক বড় সমস্যার অঙ্গ। সে সমস্যা কৃষককুলকে আর্থিক সচ্ছলতা ও সুখে রাখার সমস্যা। কোন গবর্মেণ্টই অর্থসাহায্য দিয়ে দেশের পল্লী-ঋণের ব্যবস্থা করার দায় নিতে পারেন না। গবর্মেণ্টের পক্ষে যা সম্ভবপর, তা হচ্ছে বর্ত্তমান সমবায় আন্দোলনের সুব্যবহার করা এবং মহাজনী রীতির কুপ্রথা দূর ক'রে মহাজনকে গ্রামের অর্থসচ্ছলতায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার মত আর কিছু ব্যবস্থা করা।

বাংলায় সমবায় আন্দোলনকে তার অসাড় অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হ'লে যে সকল ব্যবস্থা অবিলম্বেই করা উচিত, সে সম্বন্ধে গত কয়েক মাস ধ'রে যথেষ্ট আলোচনা চলেছে। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, প্রথমেই খাতকদের বকেয়া ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করার ক্ষমতার অনুপাতে কমিয়ে আনতে হবে। এই আলোচনার সূত্র ধ'রে অনেকগুলি জটিল প্রশ্ন এসে পড়ে। বকেয়া ঋণের পরিমাণ কমালে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। সেই ক্ষতির ভাগ কি ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে? অবশ্য আমানতকারীকেই ক্ষতির অংশ বেশি পরিমাণে নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে কয়েকটি ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকার বকেয়া সুদ কম হারেও দিতে পারছে না, আসলও ফেরত দিতে পারছে না। আমানতকারী যদি সুদের সঙ্গে আসলের অংশও ফিরে না পায়, তা হ'লে সমবায় আন্দোলনের প্রতি তার সহানুভূতি ও আস্থা থাকবে না। আন্দোলনের দিক থেকে সেটা মোটেই শুভ হবে না। কেউ কেউ বলেন, Loan Company বা ব্যবসায় ব্যাঙ্ককে যখন ক্ষতি সইতে হয়, তখন তাদের আমানতকারী বাইরের কোন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থসাহায্য পাবার আশা করে না। অতএব সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের আমানতকারীর জন্য পৃথক ব্যবস্থার দরকার নেই। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান পল্লী-ঋণ-ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করলে এই মত কি ঠিক ব'লে মনে হয়? এই যদি সকলের মত হয় যে, গ্রামের ঋণ-দান-ব্যবস্থায় সমবায় অন্দোলনকে এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে বাঁচিয়ে রাখা উচিত এবং এই ব্যবস্থায় অর্থের উৎস যোগাবে আমানতকারীরা, তা হ'লে এমন কিছু করা কখনই উচিত হবে না, যাতে আমানতকারীদের এই আন্দোলনে বিশ্বাস নষ্ট হতে পারে। আশা করা যায়, সমস্যার এই দিকটির প্রতি সমবায় বিভাগের সযত্ন ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি পড়বে।

বকেয়া ঋণ কমাবার ব্যবস্থার পর আন্দোলনে নূতন প্রাণসঞ্চার করা একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য প্রাথমিক সমিতিগুলিকে পুনর্গঠিত ক'রে এবং নূতন সমিতি তৈরি ক'রে তাদের মারফৎ কৃষিকার্য্যের সাহায্যে স্বল্প মেয়াদে নূতন ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। বর্ত্তমানে কৃষকের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, উৎপন্ন ফসলের দাম বাড়বার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। এখন চাষীর উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার উপায় করতে না পারলে এবং তার আয় না বাড়াতে পারলে সমবায় সমিতিগুলির কাজের কোন উন্নতিই করা হবে না। যেখানে গতি নেই, মৃত্যু সেখানেই। একথা সমবায় আন্দোলনের সম্বন্ধে যেমন খাটে, আর কিছুতে তেমন খাটে না। আদায়ের কাজে মন দেওয়া অথবা বর্ত্তমান সমিতি-গুলিকে পুনর্গঠিত করা দরকার; কিন্তু কেবল সেই উপায়ে দেশের সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

বকেয়া ঋণের পরিমাণ কমানো ও নূতন ফসলের জন্য ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা ছাড়া আরও একটা উপায় অবলম্বন করা দরকার হয়ে পড়েছে। আইনে এমন ক্ষমতা রাখতে হবে, যাতে ঋণ পরিশোধের দায় এড়ানো শক্ত হয়ে পড়ে। বাংলার সমবায় আন্দোলনের যে গতি-হীনতা এখন এসেছে, তার প্রধান কারণ লোকের টাকা দেবার ক্ষমতা থাকলেও টাকা না দেবার প্রবৃত্তি। জমিদারের খাজনাই হোক, অথবা মহাজনের দেনাই হোক, যা ন্যায্য প্রাপ্য, সেটি না দেবার প্রবৃত্তি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কিছু দিন আগে বন্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগের কমিশনর মিঃ এচ. পি. ভি. টাউমেণ্ড একটি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কৃষি - খাতক - আইনের সাহায্যে মহাজনকে ঠকিয়ে টাকা না দেবার প্রবৃত্তি বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে। এ সব খাতক যেন ধ'রে নিয়েছে যে কৃষি-খাতক-আইন ঋণ পরিশোধ পিছিয়ে দেবার জন্য, ঋণ পরিশোধের সহজ ব্যবস্থা করার জন্য নয়। প্রজার অবস্থার উন্নতির জন্য বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইনের যে সংশোধন করেছেন অথবা খাসমহাল ও চিরস্থায়ী অঞ্চলে খাজনার হার সম্বন্ধে যে তদন্ত আরম্ভ করেছেন, সে সবও সামাজিক সৌধের ভিত্তি ও দায়ের বন্ধন আলগা ক'রে দিয়েছে। এ কথাও বলতে হয় যে, কিছু দিন ধ'রে কতগুলি দায়িত্ববোধহীন আন্দোলনকারীর দল এই প্রবৃত্তি বাড়িয়ে তুলেছে। প্রজার রাজনৈতিক বা আর্থিক স্বাধীনতা এদের ততটা কাম্য নয়, যতটা দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা। আইনের দ্বারা এই প্রবৃত্তি বন্ধ করার প্রয়োজন সুস্পষ্ট দেখা যায়। এ কথা সত্য যে, এই সমস্যার সুন্দর সমাধান হবে তখন, যখন খাতক শিখবে—সমবায় নীতির একটি মূলমন্ত্র নিয়মিত ভাবে টাকা শোধ দেওয়া। কিন্তু এ শিক্ষা দিতে হ'লে যে সময় লাগবে তার ভিতরে কোন কিছু না করলে সমস্ত ব্যাপারটি আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাবে।

এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি সহজেই মনে হয় সেটি এই—সমবায় আন্দোলনের প্রসারের পক্ষে গভর্মেণ্টের ক্ষমতা কতদূর উপযোগী। সমবায় আন্দোলনের এই মূলনীতি সকল সভ্যের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে,

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

তারা বুঝবে যে যখনই টাকা ধার করা হবে, সে টাকা অনুৎপাদক উদ্দেশ্যে ব্যয় করা চলবে না এবং হাতে টাকা হ'লেই সব আগে সুদের সঙ্গে আসল ফিরিয়ে দিতে হবে, যাতে সে টাকা সমিতির অন্য সভ্যরা নিয়ে আবশ্যক-মত কাজে লাগাতে পারে। এক কথায়, সমবায় আন্দোলনকে পুনর্জীবন দিতে হ'লে সমবায় নীতি ও তার ব্যবহার-পদ্ধতি শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলায় সমবায় আন্দোলন যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন এ শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। আজ ত্রিশ বছর পরেও এ শিক্ষার অভাব র'য়ে গেছে। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, গবর্মেণ্ট একক এ শিক্ষা দেবার ভার নিতে পারেন না, এ ব্যাপারে গবর্মেণ্ট দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহায্যের অপেক্ষা রাখেন। এ কথা কি বলা চলে যে, দেশের শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল সম্প্রদায় এ বিষয়ে তাঁদের সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করেছেন? গবর্মেণ্টের ধ্বংসমূলক সমালোচনা করার প্রবৃত্তি আমাদের দেশের লোকের মজ্জাগত হয়ে গেছে। গত কয়েক বছরে সমবায় বিভাগের মত অন্য কোন বিভাগকে এতটা সমালোচনা সহ্য করতে হয় নি। এই ধ্বংসমূলক সমালোচনায় হাত থেকে সমবায় বিভাগকে বাঁচাবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন; কারণ, এ বিষয়ে অনেকে আমার চেয়ে বেশি জানেন এবং তাঁরাই এ সম্বন্ধে যা বলবার তাই বলবেন। সকলেই যদি এখন সমবায় বিভাগের প্রতি নিষ্ফল সমালোচনা বন্ধ রেখে সমাজের প্রকৃত উপকারের জন্য তাকে পুনর্জীবন দিতে পারেন, তা হ'লেই তাঁদের সুবিবেচনা ও জনহিতের পরিচয় দেওয়া হবে।

মেদিনীপুর সমবায় সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

মেদিনীপুর জেলায় প্রথমে খেলাড় ইউনিয়ন ও বেলেবেড়ে ব্যাঙ্কিং ইউনিয়ন নামে দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু তারা নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করতে না পারায় প্রথম অবস্থায় বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে লাগল। এই জেলার অন্যান্য স্থানেও অর্থাভাবে অপর সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুরূপ অসুবিধা লক্ষিত হ'ল। এ কারণ মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ. আর. গুরুলে আই. সি. এস. মহোদয় একটি সমবায় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। তাঁর পরবর্ত্তী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর তাঁর ঐ সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট মেদিনীপুর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক যথারীতি রেজেষ্ট্রিভুক্ত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সভাপতি করিয়া কার্য্যারম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে তপশীলভুক্ত সমিতি-সমূহের অতিশয় বৃদ্ধি হয় ও অন্যান্য ব্যাঙ্কও স্থাপিত হয়। বাংলা দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় সমবায় বিভাগের দ্রুততর প্রসার মেদিনীপুর জেলার পক্ষে বড়ই গৌরবের বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পর পর কয়েক বৎসর যাবৎ আকস্মিক অজন্মা, আর্থিক অসচ্ছলতা ও অদৃষ্টপূর্ব্ব রাজনৈতিক বিগ্রহের ফলে সমিতি সকলের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যদিও কয়েকটি সমিতি মাত্র অর্থাভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে, অধিকাংশ সমিতিই আজও কালের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কোন রকমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, অন্যান্য ব্যাঙ্গিগত ব্যাঙ্ক সকলের মত ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় নি। এই সুফল সমবায় বিভাগের উপর জনসাধারণের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্ভ্রব-জনিত সংপথে পরিচালনের ফল সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল মাত্র অতীত গৌরবের দিকে চেয়ে ব'সে থাকলে চলবে না—তা মূর্খতার নামান্তর মাত্র। ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য; অন্যথায় দেশের বিশেষ অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। গ্রাম্য সমিতিগুলির আর্থিক দুরবস্থার প্রকৃষ্ট কারণ তাদের সভ্যগণের ঋণপরিশোধে অসঙ্গতি, ফলে গ্রাম্য সমিতি সকল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ঋণ যথাকালে পরিশোধ করতে অপারগ। দেনার ভার ক্রমশ বাড়ছে। সমবায় সমিতির সাফল্যের মূলমন্ত্র যথাযথ ভাবে ঋণের আদান ও প্রদান—অন্যথায় সমূহ বিপদ। সমবায় সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলেন—সমবায় সমিতির কর্জ্জদাদন সম্বন্ধে একমাত্র ভয়ের কারণ এই যে, তা যথাকালে ফেরত পাওয়া যায় না।

মেদিনীপুর জেলায় বর্ত্তমানে সাতটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক আছে। তাদের মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। তাদের অধস্তন ১২১৯টি সমিতির কাছে এখনও তাদের প্রায় দশ লক্ষ টাকা বাকি আছে—আদায় হয় নি। তাদের মজুত তহবিলে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মাত্র জমা আছে, আর গত বৎসর তারা আমানতকারীদের কাছ থেকে ১৮ লক্ষ টাকা জমা নিয়েছে। বর্ত্তমান বর্ষে তারা ২৫৩৯৯ টাকা লাভ করেছে। সমিতি সকলের দুরবস্থার জন্য তারা অতি সাবধানে টাকা ধার দিয়েছে, ফলে বহু টাকা ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুত প'ড়ে আছে, তা থেকে বিশেষ কিছু আয়বৃদ্ধি করা ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অধীনস্থ ঐ সকল (১২১৯) সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৫০০০ ও তাহাদের মূলধন সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা। তাদের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহের নিকট দেনা দশ লক্ষ টাকা ও অসদস্য আমানতকারীর গচ্ছিত বাবদ দেনা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই সমূহ কৃষি-সমিতিই বেমিয়াদী দায়িত্বপূর্ণ এবং তাদের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ এত বেশি যে, যে কোন দিন ঐ সকল সমিতির অধিকাংশেরই ধ্বংস হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

ঐ সকল সমিতি ব্যতিরেকে এই জেলায় আরও আটটি কৃষি-ক্রয়-বিক্রয় সমিতি আছে—কিন্তু তারা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু কাজ করে নি। চারিটি কৃষি-সমিতির মধ্যে লালগড় কৃষি-সমিতি আর মাড়বার জন্য কয়েকটি কল এনেছে ও সভ্যদের জমিতে জল সরবরাহের জন্য একটি পাম্পও রেখেছে। স্বারিবেড়িয়া কৃষি-সমিতি মহিষাদল রাজসরকার থেকে কিছু জমি বন্দোবস্ত নিয়ে তাতে সমবায় প্রথায় তরিতরকারি উৎপন্ন করছে। তাদের উৎপন্ন জিনিস ১৯৩৮ সালের প্রদর্শনীতে জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে ও প্রদর্শনী-কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুরস্কার পায়। এই জেলায় এমন কি সমস্ত বাংলা দেশে খেলাড়-মুড়াকাটা জলসরবরাহ-সমিতিই একমাত্র জলসরবরাহের প্রতিষ্ঠান। নৈসর্গিক সাধারণ জলাশয় থেকে জল নিয়ে সভ্যদের জমিতে বিলি করা হয়ে থাকে। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে বহু বাঁধ ও অন্যান্য জলাশয় আছে, সেই সমস্ত জায়গায় এই রকম সমিতি স্থাপন করলে জলসরবরাহের চিন্তা এক রকম দূর হয়।

এই জেলায় ১২টি সাধারণ সমবায় সমিতি আছে। সেগুলি প্রধানত শিল্পী, শ্রমিক ও অন্যান্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের সাহায্য ক'রে থাকে। যদিও তাদের আর্থিক অবস্থা এখনও খুব আশাপ্রদ নয় বা তাদের অসুবিধাও এখন বহু, তবুও তারা দিন দিন জনসমাজে বেশ সমাদর লাভ করছে, আর আশা করা যায়, তারা অদূর-ভবিষ্যতে সভ্যদের বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারবে।

এই জেলায় ৬১টি ম্যালেরিয়া-নিবারণী-সমিতি আছে, তাদের সদস্য সংখ্যা ১১১১ জন। তারা তাদের নির্দ্ধারিত এলাকার মধ্যে ম্যালেরিয়া নিবারণের কাজ ক'রে থাকে।

একটি শিক্ষক-সাহায্য-সমিতি আছে। তার সভ্য-সংখ্যা ৪৬৩ জন। মৃত সদস্যের ওয়ারিশদের সাহায্যার্থে এই সমিতির অর্থব্যয় হয়ে থাকে। ১২টি পল্লী-সংগঠন-সমিতিও সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য নিজ নিজ সদস্যদের আর্থিক উন্নতি, কৃষি-বিষয়ে শিক্ষার প্রচার ও আপন এলাকার স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা। এই সমিতিগুলি অল্পদিন মাত্র স্থাপিত হ'লেও এদের কাজ বেশ আশাপ্রদ। এরা সাফল্য লাভ করলে, সমবায় পদ্ধতির এই বিভাগের বহুলপ্রচার ঘটবে।

ঘাটাল মহকুমায় হরিনগর মহিলা-সমিতি নামে একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান আছে। এই সমিতির সকল সদস্যই মহিলা এবং ইহার যাবতীয় কাজ মহিলাদের হিতার্থেই হয়ে থাকে। যদিও বর্ত্তমানে ইহার সভ্যসংখ্যা মাত্র ১৫ জন—তবুও এইরূপ সমিতির বিশেষ প্রয়োজন আছে। উপরোক্ত সকল সমিতি ব্যতীত পচেটগড়ে একটি উৎপাদনকারী সঙ্ঘ আছে। এই জেলার অপরাপর সকল সমিতির ফিরিস্তি দাখিল ক'রে আমি আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করতে চাই না।

যদিও নানা রকমের বহু সমিতি বিভিন্নভাবে কাজ করছে, কিন্তু কয়েকটি মাত্র প্রকৃত উন্নতি করতে পেরেছে। প্রাথমিক সমিতি সমূহের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট দেনা বেড়ে চলেছে, আর অনাদায়ী দেনার মাত্রা খুব দ্রুত গতিতে বাড়ছে। অধিকাংশ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বাধ্য হয়ে তাদের সমিতি সমূহের কাছ থেকে প্রাপ্য দেনার বাবদ সুদের হার শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে কমিয়েছে। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৯৩৭ সাল থেকে ঐ সুদ কমিয়ে নয় টাকা ছয় আনা স্থলে আট টাকা সাত আনা করেছে। সমিতি সকলকেও ঐ ভাবে তাদের সভ্যদের কাছ থেকে প্রাপ্য সুদের হার কমাতে হয়েছে, এমন কি, যারা শীঘ্রমধ্যে পরিশোধ করছেন তাদের জন্য কিছু ছাড়রফাও করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদায় বিশেষ আশাপ্রদ হচ্ছে না। কাজেই রুচিৎ একটা আধটা নূতন সমিতি স্থাপন করা হচ্ছে। বাংলার সমস্ত জায়গার মতন এই জেলাতেও আজ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ সমবায় বিভাগের কাজ এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে—কেন না, ঐ সময় থেকে যেন একটা আর্থিক অসচ্ছলতার ঢেউ সমস্ত জগৎ ভাসিয়ে দিয়েছে। সরকার বাহাদুরও স্থির করছেন যে, তাঁরা নূতন সমিতি তো আর স্থাপন করবেন না, অধিকন্তু যে সমস্ত সমিতি দেনার দায়ে এক রকম অচল, সেগুলিকে তুলে দেবেন। কিন্তু এ রকম অবস্থায় বেশিদিন থাকা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। যদি বেশিদিন ভালভাবে কাটাবার ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে প্রথমত প্রয়োজন, নূতন উপায় উদ্ভাবন ক'রে এই সকল ধ্বংসোন্মুখ সমিতির ঋণভার লাঘবের চেষ্টা ক'রে এদের নূতন ভাবে বাঁচিয়ে তোলা, আর দ্বিতীয়ত, নূতন পন্থায় সমবায়ের নীতি প্রচার ক'রে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সমবায় সম্বন্ধে সজাগ ও সচেষ্ট ক'রে তোলা।

* * *

আমার বিবেচনায় সমবায় সম্বন্ধে শিক্ষাদান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এরূপ একদল শিক্ষিত কর্ম্মী প্রয়োজন, যাঁরা সমবায় সম্বন্ধীয় মূল-নীতি ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত ও

অশিক্ষিত সকলের মধ্যে সমভাবে প্রচার করবেন। প্রত্যেক গ্রাম বা গ্রামের অংশবিশেষ নিয়ে একটি ক'রে সমবায় কেন্দ্র স্থাপন ক'রে সকলকেই, তা তাঁরা সমাজের যে স্তরেরই হোন না কেন, সমবায় সমিতিতে যোগদান ক'রে কি রকমে দেশের ও দশের উপকার করা যায় বা তাঁরাই বা কিরূপ উপকৃত হবেন—এ বিষয়ে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদেরও সমবায়ের নীতি বিশেষভাবে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। এমন কি, যদি তাঁরা শহরে বাস করেন, তা হ'লেও। শিক্ষিত যুবকদের যদি এই কাজে ব্রতী করতে পারা যায়, তার চেয়ে সুখের কথা আর নেই। সে ক্ষেত্রে তাঁরা নিজ নিজ এলাকার মধ্যে কৃষকদের শিক্ষা ও সংস্কারের ভার নিতে পারবেন। এই উপায়ে তাঁরা নিজেরাও লাভবান হবেন ও তাঁদের প্রতিবেশী কৃষকদের নেতৃস্থান লাভ করবেন। আজকালকার গ্রাম্য-স্বায়ত্তশাসনের যুগে যদি এই সব যুবক প্রকৃত কর্ম্মী হন, তা হ'লে তাঁরা কৃষি-প্রজাদের সাহায্যে ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির সদস্যপদ লাভ ক'রে প্রকৃত দেশের কাজ করতে পারবেন। ধ্বংসোন্মুখ সমবায় সমিতি সকলের নবজাগরণের জন্য এই সব যুবকদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। যদি এই ভাবে আন্তরিক চেষ্টা হয়, তা হ'লে গ্রাম্য সমিতিগুলির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এটা খুবই সম্ভব যে, যাঁরা ধনী, তাঁরা গরিব কৃষকদের সঙ্গে বেমিয়াদী দায়িত্বপূর্ণ সমিতিতে যোগ দিয়ে তাদের দেনার দায় ঘাড়ে নিতে চাইবেন না, যদি না তাতে তাঁদের বিশেষ কিছু লাভের সূচনা না থাকে। কিন্তু যদি এই সকল সমিতি কেবল মাত্র টাকা লেনদেনের কাজ না ক'রে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে গ্রামের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকর কাজও করে, যার ফলে দেশের সকলে সমান ভাবে লাভবান হবেন, তা হ'লে ধনী নির্ধন সকলেই আনন্দে যোগদান করবেন। আপাতদৃষ্টিতে এটা এক রকম অসম্ভব কাজ বলে মনে হ'লেও যদি সকলে একযোগে চেষ্টা করেন, উন্নতি এক প্রকার নিশ্চিত। আজকাল সমবায় বিভাগ কয়েকজন অতিরিক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগ ক'রে তাঁদের পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট এলাকার ভার দিয়ে কাজের সুবিধা ক'রে দিয়েছেন। ঐ সঙ্গে যদি কিছু অর্থসাহায্যও করেন, তা হ'লে এই কাজ সুচারু রকমে হতে পারে। না হ'লে বিশেষ কিছু লাভ হবে ব'লে মনে হয় না। গ্রাম্য সমিতিগুলির প্রাণসঞ্চার করতে হ'লে তাদের সাময়িক-ভাবে অভাব মোচন করা বিশেষ প্রয়োজন, তার জন্যে তাদের অল্পদিনের মেয়াদে কিছু ঋণ দেওয়া দরকার, যাতে সেই সব টাকা খাটিয়ে কৃষক-সভ্যরা কিছু জমিয়ে তাদের পূর্ব্বতন দেনা শোধ করতে পারে। যে স্থলে কৃষকরা তাদের সমূহ দেনা পরিশোধে অপারগ, সেরূপ ক্ষেত্রে তাদের পরিশোধের ক্ষমতার সঙ্গে তাৎপর্য্য রেখে তাদের ঋণের ভার কতক কমিয়ে তাদের পরিশোধ করবার সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি কৃষকেরা ঐ রকম সাহায্য পায় আর যদি সমস্ত সমিতি ধনী ও দরিদ্রের একত্র সমাবেশে গঠিত হয়ে দেশের মধ্যে সমবায়-ভাবধারার প্রচার করে, তা হ'লে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি আবার নূতন অনুপ্রেরণায় জেগে উঠবে।

কেবল মাত্র পুরাতন সমিতিগুলির পুনরুদ্ধার করলেই চলবে না, নূতন নূতন পথে কাজ করবার জন্যে নূতন সমিতিও স্থাপন করতে হবে। কোন সমিতি গঠন ক'রে তোলবার সময় সেটা কি ক'রে লাভবান হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে জনসাধারণ, বিশেষত শিক্ষিত যুবকসমাজ, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যোগদান করেন।

সচরাচর একটি ভুল প্রায়ই দেখা যায়। এই সকল প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের স্থাপয়িতা-সদস্যদের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাঁদের অনভিজ্ঞতার ফলে কর্ম্মীদের সহস্র চেষ্টা ও শুভেচ্ছা সত্ত্বেও সেরূপ উন্নতি করতে পারে না। বিশেষ তারা যখন সকল প্রকার কলা-কৌশল-অভিজ্ঞ সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই সব কর্ম্মীদের অধিকাংশই অবৈতনিক, যদি একবার কোন কারণে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েন, তার ফল অতি খারাপ হয়, তাঁদের আশাভঙ্গ হয় ও এই সকল প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ক্রমশ মন্দ হয়ে ধ্বংসপথে পতিত হয়। এই রকমে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের পতন হ'লে, শুধু সেইটিই ধ্বংস হয় না, নিকটবর্ত্তী আরও অনেক আশাপ্রদ প্রতিষ্ঠানকে নষ্ট ক'র। বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে কোন একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হ'লে প্রথমেই

সরকার বাহাদুরের অনুমতি প্রয়োজন। আমার বিবেচনায় এইরূপ কোন সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব হ'লেই প্রথমে তার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে তদন্ত ক'রে দেখা দরকার। যদি দেখা যায় যে, এই সমিতি হতে সুফল সম্ভব, তখন সরকারের সমবায় বিভাগের কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে নিয়োগ ক'রে এই সমিতিকে সাফল্যের পথে অগ্রসর ক'রে দিতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় সরকার বাহাদুরের তহবিল হতে এই বিশেষজ্ঞের যাবতীয় খরচ বহন করা কর্ত্তব্য। অবশ্য পরে যখন এই সমিতি আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হয়ে উঠবে, তখন তার যোগ্যতা অনুসারে সেই ব্যয় সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সমিতিকে বহন করতে হবে। এই ব্যবস্থায় প্রতি বৎসর সরকারী তহবিল হতে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হবে সন্দেহ নেই। তবে আশা করা যায় যে, জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নে সমবায় বিভাগের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তার দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার বাহাদুর সে ব্যয়ভার বহনে কুণ্ঠিত হবেন না।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, যদি কোন রকমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সমবায় সম্বন্ধে উৎসাহিত করতে পারা যায়, তা হ'লে শীঘ্রমধ্যেই সাফল্যলাভ সম্ভবপর। যদি কলেজের ছাত্ররা বা যে সকল যুবক অল্পদিন মাত্র শিক্ষা সমাপন করেছেন বা যে সকল যুবক সমস্ত কাজ ত্যাগ ক'রে দেশের জনসাধারণের উন্নতির চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের প্রচারকার্য্যের দ্বারা প্রকৃত দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারা যায় যে, আজকালকার বেকার-সমস্যার দিনে প্রকৃত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় নির্দ্ধারণ করতে হ'লে একমাত্র সমবায়ের নীতি অনুসরণ ক'রে চলা কর্ত্তব্য এবং দেশের যে কোন লোক, তা তিনি সমাজের যে কোন স্তরের বা যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থারই হোন না কেন, সমবায় সমিতির বহুল স্থাপন হ'লে তার সুফল সমানভাবেই লাভ করবেন, তা হ'লে সাফল্য এক প্রকার সুনিশ্চিত। বর্ত্তমান কালে যাবতীয় কলেজ শহরে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যান্য বহুলোকই নানা কাজে বা কাজের চেষ্টায় শহরে বাস করেন। এই সব লোককে সমবায়ের মূল নীতি তার সুফলসহ শিক্ষা দিয়ে তাদের নিজ নিজ জীবনে সমবায়ের নীতি প্রচলিত ক'রে নিতে শিক্ষা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে এই সকল শিক্ষা কিছুদিন শহরে হওয়া উচিত—তা হ'লে শিক্ষিত সমাজ নিঃসঙ্কোচে তাতে যোগ দেবেন। সরকার বাহাদুরের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যাতে এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এ রকম লোক নিযুক্ত হন, যাঁরা সমবায় সম্বন্ধীয় হিসাব-নিকাশ, পরিচালনা, সংগঠন ও অন্যান্য সকল রকম জটিল প্রশ্নে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সুবক্তার অতিশয় প্রয়োজন, যাঁরা দেশের জনসাধারণের মধ্যে সমবায়ের উপলব্ধি জাগিয়ে তুলতে পারবেন। দেশের হিতার্থে কেবলমাত্র আদর্শ-বাদী হ'লে চলবে না। কাজ চাই—আর সেই কাজ করবার জন্যে চাই এমন কয়েকজন কর্ম্মী যাঁরা দেশের জন্যে চিন্তা করবেন, আর প্রয়োজনানুসারে যত কষ্টের পরিশ্রমই হোক না কেন পশ্চাদপদ হবেন না। এই সব কর্ম্মীদের সরকার বাহাদুরের তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ কাজ মোটেই সহজসাধ্য নয়, বিশেষ যোগ্য লোক না হ'লে এ কাজ সম্ভব হবে না—কিন্তু যদি কর্ম্মকর্ত্তাদের সত্যই এ কাজে সাফল্য লাভের আগ্রহ থাকে, তা হ'লে সুযোগ্য লোকের অভাব থাকবে না। আমাদের দেশীয় কৃষক ও অন্যান্য সকলে শীঘ্রই বুঝতে পারবেন, সমবায় প্রথায় উৎপাদন করলে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পায় ও উৎপন্ন দ্রব্য থেকে প্রভূত লাভ হয়। তখন সকলেই তাতে যোগদান করবেন।

ছাত্রসঙ্ঘের মধ্যে সমবায়ের ধারা প্রচার করতে হ'লে বয়স্ক ছাত্রদের নিয়ে কলেজে একটা যৌথ কারবার স্থাপন করতে পারা যায়, তাতে পার্শ্ববর্ত্তী স্কুলের ছাত্ররা ও শিক্ষকরাও যোগ দিতে পারেন। সাধারণের মধ্যেও এই রকম একটা যৌথ কারবারের সৃষ্টি করা যেতে পারে। ক্রেতারা সবাই এর সভ্য হবেন, তাঁদের যা কিছু প্রয়োজন এই কারবার থেকে কিনবেন। তাঁরা পাইকারী দরে জিনিস কিনে এনে খুচরা দরে নিজেরা কিনবেন। বছরের শেষে লাভের অংশ ভাগ ক'রে নেবেন। অথবা ঐ লাভের টাকা জমিয়ে নিজেদের প্রয়োজনমত দু একটা জিনিসও উৎপাদন করতে পারবেন, যেমন কাপড়, সাবান, মোজা প্রভৃতি। তাঁরা নিজেদের দুধসরবরাহের ব্যবস্থাও এই রকম যৌথ উপায়ে করতে পারেন। তাঁদের এই সমৃদ্ধি দেখে ক্রমে অন্যান্য লোকও যোগ দিতে চাইবে। এই শহরে বহু প্রতিষ্ঠান আছে, তারাও নিজেদের প্রয়োজনমত

পৃথক ভাবে যৌথ কারবার স্থাপন করতে পারে। এই রকম কয়েকটি যৌথ কারবার প্রচলিত হ'লে তারা একটি বৃহৎ সমবায় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই স্থানে যৌথ কারবারের বিশেষ সাফল্য ঘটে নি, সেটা সমবায় নীতির দোষে নয়, উদ্যোক্তাগণের অনভিজ্ঞতার ফলে ও তাঁদের কার্য্য পরিদর্শনের সময়াভাবের জন্যে। যে সকল কর্ম্মীরা শহরের যৌথ প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন, তাঁরা যদি সফল হন, তা হ'লে তাঁরা সমবায়ের ভাব ও ধারা তাঁদের স্বগ্রামে ও পরবর্ত্তী জীবনে কর্ম্মস্থলে প্রচার করবেন, সরকার বাহাদুরও তাঁদের নূতন প্রচেষ্টায় অর্থ ও শিক্ষিত লোক দিয়ে সাহায্য করবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হয়, কিন্তু তা সাময়িক। জনসাধারণের মধ্যে যদি সমবায়ের প্রসার হয়, তা সফল হতে বাধ্য। সকল সময়ে সরকারের দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না, দেশের শিক্ষিত লোকদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য সরকার বাহাদুরকেও এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করতে হয়েছে। কিন্তু দেশের সাধারণের ওপর এর ভবিষ্যৎ আশা। দেশের শিক্ষিত নর-নারী প্রচারকার্য্যে ব্রতী হোন—দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমবায়ের মূল-নীতি শিক্ষা দিন। তাতেই দেশের কল্যাণ সাধন হবে। মেদিনীপুরও পূর্ব্ব-গৌরব ফিরে পাবে। ইউরোপের নানা দেশে এই ভাবেই সুফল ফলেছে।

আমাদের জেলায় যে সকল নৈসর্গিক সুবিধা আছে সেগুলি আমাদের মনে রাখা দরকার। সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে অভিজ্ঞ লোকের পরিচালনায় ঐগুলির সুযোগ নিয়ে নূতন সমবায় সমিতি স্থাপন করা উচিত। যদি ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে আমরা লাভজনক ক'রে তুলতে পারি তা হ'লে কার্য্যকরী মূলধনের কোন অসুবিধা হবে না। আপনারা জানেন, এই জেলার উত্তর-পশ্চিমে নানাবিধ ধাতব পদার্থ পরিপূর্ণ পর্ব্বতমালা আছে। একটি বিস্তৃত প্রদেশ আজও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, যেখানের সামান্য উন্নতি সাধন করলে প্রভূত লাভের সম্ভাবনা। এই জেলার বুকের উপর দিয়ে রূপনারায়ণ, রসুলপুর, হলদী, কংসাবতী, শিলাবতী, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদ ও নদী প্রবহমান। বঙ্গোপসাগর এই জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কতকাংশ ঘিরে আজও দাঁড়িয়ে আছে। বর্ত্তমান তমলুক শহরের নিকটে তাম্রলিপ্ত এককালে ভারতের অন্যতম বন্দর ছিল, ইতিহাসে তার বহুলপ্রমাণ আছে।

এই জেলার বিভিন্ন অংশে নানাবিধ শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রসার হয়েছিল, আর তাদের কার্য্য-প্রচেষ্টায় বহু শহর গ'ড়ে উঠেছিল। গত এক শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাদের অবস্থা সচ্ছলই ছিল, আজও বহু শহরের ধ্বংসাবশেষ পুরাতন সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। আজও সেই সব শিল্পীদের বংশধরেরা কোন রকমে তাদের জাত-ব্যবসা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সরকারী ও পারিপার্শ্বিক সাহায্যের অভাবে ও দারুণ প্রতিযোগিতায় কিছু ক'রে উঠতে পারছে না। আনন্দপুর ও কেশিয়াড়ির সিল্ক ও তসর ব্যবসা আজও পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় দেয়। চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই রামজীবনপুর, রাধানগর, কেশিয়াড়ি প্রভৃতির তাঁতের কাপড় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। ঘাঁটাল, খড়ার ও রামজীবনপুরে এখনও কাঁসা-পিতলের কাজ হয়ে থাকে। তমলুক ও সবঙ্গের মাদুর বেশ বিখ্যাত। কিন্তু এ সবই ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল, কাজেই সে রকম ভাল ভাবে চলে না। কিন্তু যদি সমবায় নীতির অনুসরণ ক'রে সেগুলি সংস্কার করা হয় আমার দেশের নষ্ট সমৃদ্ধি ও গৌরব আবার ফিরে আসবে।

মেদিনীপুরে যক্ষ্মা চিকিৎসাগার

ঝাড়গ্রাম-রাজের দান

ঝাড়গ্রামের জমিদার কুমার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেবের মহানুভবতা ও দানশীলতার কথা মেদিনীপুর-বাসীর নিকট প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এ জেলায় এমন কোন ভাল কাজ হয় নি, যাতে তাঁর মুক্তহস্তের দানের পরিচয় পাওয়া যায় নি। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর দানশীলতার কথা সগৌরবে স্মরণ করবে। আজ তাঁরই দানে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর সুশোভন সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি মেদিনীপুরে যক্ষ্মা-রোগের চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠার কথা শুনে তিনি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ২০০০৲ অর্থসাহায্য পাঠিয়েছেন।

চিকিৎসাগারের পরিকল্পনামতে শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করা হবে। দরিদ্র জনসাধারণের যাতে সুবিধা হয়, সেজন্য চিকিৎসাগারটিকে মেদিনীপুর এডোয়ার্ড-মেমোরিয়াল হাসপাতালের সংলগ্ন করার প্রস্তাব হয়েছে। হাসপাতালের Outdoor wardএর আমূল সংস্কার করা হবে। এজন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ও মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের কাছ থেকে যথাক্রমে ৯০০০৲ ও ৫৯০০৲ অর্থসাহায্য পাওয়া গেছে।

দুর্গতদের দুঃখনিবারণের জন্য ঝাড়গ্রাম-রাজের অকাতর দানকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্য প্রস্তাবিত চিকিৎসাগারের সহিত তাঁর নামকে গ্রথিত করা হবে—স্থির হয়েছে।

মেদিনীপুরে বয়-স্কাউট-সম্মিলন

মেদিনীপুর স্কাউট অ্যাসোশিএশনের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. এবার জেলার স্কাউট দলগুলিকে কয়েকদিনের জন্য মেদিনীপুরে এনেছিলেন। স্থানীয় কলেজ-ময়দানের পাশে এজন্য সারি সারি তাঁবু পড়েছিল এবং ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনারের আহ্বানে প্রভিন্‌শিয়াল স্কাউট অ্যাসোশিএশনের সম্পাদক মিঃ বি. বসু, বার-অ্যাট-ল' ও দুজন স্কাউট শ্রীযুক্ত সরোজ ঘোষ ও শৈলজ মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে এসে এ জেলার স্কাউটদের 'স্কাউটিং' সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। ২রা ফেব্রুয়ারি সকালে ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার সমস্ত স্কাউটদের সম্বোধন ক'রে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, স্কাউটদের ধর্ম্ম—সেবা; এর চেয়ে বড় কথা নেই। এই সেবার আদর্শকে জীবনে বরণ ক'রে নিয়ে স্কাউটরা ভবিষ্যতে তাদের পৌর-কর্ত্তব্য পালন করবে—এই কথাই তিনি সকলকে বুঝিয়ে দেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হ'লে মিঃ বসু স্কাউটদের উপদেশ দিয়ে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—স্কাউট সব এক জাতি; স্কাউটের আইন—ভালবাসার আইন। স্কাউট শুধু তার প্রতিবেশীদের ভালবেসেই ক্ষান্ত হবে না, জীব-জন্তুর প্রতিও তারা মায়া-মমতা দেখাবে। তিনি স্কাউটদের আইনের কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে এই আশা জানিয়েছিলেন যে, মেদিনীপুরের 'স্কাউটিং' সার্থক হোক।

উদ্বোধনের পর থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত প্রতিদিন শ্রীযুক্ত ঘোষ ও মুখোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে স্কাউটদের শিক্ষা, ব্যায়াম ও খেলাধুলার ব্যবস্থা হয়েছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারি বৈকালে সমবেতভাবে খেলাধুলার প্রদর্শনী হয় এবং ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার স্কাউটদের ব্যাজ বিতরণ করেন। সন্ধ্যায় Camp fireএর সময় স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত থেকে স্কাউটদের উৎসাহিত করেছিলেন।

৬ই ফেব্রুয়ারি সকালে স্কাউটরা নিজ নিজ স্কুলে ফিরে যায়।

ফাল্গুন মাসের কৃষি-কথা

বিলাতী সব্জি প্রায় শেষ হইতে চলিল, মাঝে মাঝে জলসেচন ছাড়া বিলাতী সব্জির বাগানে এখন আর বিশেষ কোনও কাজ নাই। আলুর গাছগুলি এই মাসেই শুকাইয়া যাইবে; গাছগুলি শুকাইয়া গেলে কোদাল দিয়া মাটি কোপাইয়া আলু উঠাইতে হইবে; মৃতি সাবধানের সহিত মাটি কোপাইতে হইবে, যেন আলুগুলি কাটিয়া না যায়। পিঁয়াজ ও রসুন ফাল্গুন-চৈত্র মাসেই উঠাইতে হইবে; অন্যান্য রবিশস্য যথা—ছোলা, মটর, মুসুর, মুগ, খেসারি, গম, যব, সরিষা, তিসি, ধনে প্রভৃতি এই মাসেই পাকিবে এবং উহারা পাকিলেই উঠানো আবশ্যক; দেখিতে হইবে, যেন ঐ সকল শস্য বেশি পাকিয়া না যায়, কারণ তাহা হইলে উহাদের দানাগুলি অনেক পরিমাণে মাটিতে ঝরিয়া পড়িবে। পটল এই মাসে উঠাইবার উপযুক্ত হয়।

আকের চারা এ মাসেও লাগাইতে পারা যায়; তবে মাটিতে রস না থাকিলে জলসেচনের আবশ্যক হইবে। আক হইতে গুড় প্রস্তুত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

চৈতে ঝিঙ্গা, চৈতে শশা, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, করলা, ফুটি, তরমুজ, কাঁকুড়, ঢেঁড়শ, ভুট্টা, প্রভৃতির বীজ এই মাসে বপন করা যাইতে পারে। কুলিবেগুনের চারা এই সময় রোপণ করা চলে। যাঁহারা চাঁপানটে শাক খাইতে ভাল বাসেন, তাঁহারা যদি এই মাসে উহার বীজ বপন করেন ও উহাতে নিয়মিতভাবে জলসেচন করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই শাক পাইবেন।

আদা, হলুদ এই মাসে জমি হইতে উঠানো হয়; উহাদের মুখীগুলি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্ষেতে রোপণ করিবার জন্য ভাল করিয়া বাছিয়া রাখিতে হইবে। পানের চাষের জন্য এই মাসে পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

নীচু জমিতে পাট ও ধানের বীজ এই মাস হইতেই বপন করিতে হইবে; এখন হইতে রীতিমত ভাবে উঁচু জমির পাট ও ধানের জন্য জমি প্রস্তুত করা আবশ্যক—যাহাতে চৈত্র-বৈশাখ মাসে বৃষ্টি পড়িলেই উহাদের বীজ বপন করিতে পারা যায়।

বাঁশের জন্য পল্লীগ্রামগুলির স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু উহা আমাদের সকলেরই প্রয়োজনে লাগে। বাড়ির কাছাকাছি বাঁশের ঝোপ না থাকাই বাঞ্ছনীয়; বাঁশের ঝাড়ের ঝরা শুকনা পাতাগুলি এই মাসে পোড়াইয়া দিলে মানুষের ও ফসলের অনিষ্টকারী অনেক প্রকারের পোকা-মাকড় মরিয়া যায়, আশপাশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। ইহা ছাড়া পাতা পোড়াইয়া দিলে যে ছাই হয়, উহা দ্বারা বাঁশঝাড়ের মাটি সারবান হয়। ঝাড়ের পুরাতন গোড়া ও শিকড়গুলি উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় নষ্ট হইয়া যায়; পুকুরের পাঁক-মাটি প্রয়োগ করিলে বাঁশগুলি খুব মোটা ও বড় হয়।

সকলেরই বাড়ির সংলগ্ন অন্তত একটুখানি জমিতে একটি ছোট ফুলের বাগান থাকা উচিত; ইহাতে মনের আনন্দ ও বাড়ির সৌন্দর্য্য বাড়ে; বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েরা এই ফুল-বাগানের কাজ অনায়াসে করিতে পারে; ইহাতে তাহাদের শারীরিক ব্যায়াম তো হইবেই; সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অর্জ্জনের সুবিধা হইবে। এই মাস হইতেই বেল, যুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলগাছের গোড়া কোপাইয়া নিয়মিতভাবে জলসেচন করিলে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাওয়া যাইবে; মধ্যে মধ্যে তরল সার অর্থাৎ পচা গোবরজলের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে গাছগুলির যথেষ্ট উপকার হইবে। ডালিয়া, পপি, ডায়েন্থান, ষ্ট্রইট পি, এস্টার, কার্‌নেশন, প্যান্সি প্রভৃতি বিলাতি মরশুমি ফুল এখন যথেষ্ট পরিমাণে ফুটিতেছে; এখন উহাদের গোড়ায় জলসেচন ছাড়া আর কোনও কাজ নাই; গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের মরশুমি ফুলের জন্য এখন হইতে জমি প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

—'বাংলার কথা'

সম্পাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম

মেদিনীপুর জেলা-পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির পক্ষে শ্রীঅবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পল্লী-শ্রী

১ম বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪৫ [১০ম সংখ্যা

আমার সাহিত্য-জীবন

শ্রীসজনীকান্ত দাস

নিজের সম্বন্ধে বহিঃপৃথিবীর দরবারে কোনও কথা নিবেদন করিতে একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স অথবা সীমাবদ্ধ প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রত্যেক গ্রন্থকারেরই সহজ সঙ্কোচ আছে; আত্মীয়-গোষ্ঠীর সীমার মধ্যে অথবা সহধর্ম্মী সম্প্রদায়ে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে যাহা বলা যায়, উত্তরকালে স্মৃতিকথা অথবা ডায়ারির আকারে সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা অল্পবিস্তর প্রয়োজন সাধন করে বটে, কিন্তু লেখকের জীবৎকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরণের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অহমিকাদোষদুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়; তা ছাড়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বর্ত্তমানের জটিল পারিপার্শ্বিকতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সত্যকার সাহিত্য-প্রসঙ্গ বাছাই ও সাধারণ্যে পরিবেশন করা কোনও গ্রন্থকারের পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ উচ্চতম শ্রেণীর প্রতিভার পক্ষে বাঁচিয়া থাকিয়াই 'জীবনস্মৃতি' রচনা অথবা "আমার ধর্ম্ম" নির্দ্দেশ করা সম্ভব, কারণ তাঁহাদের ক্ষেত্রে সাহিত্য ও জীবন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা এমনই ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে যে, কবির ব্যক্তিগত জীবনকে সাহিত্যজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। গ্রন্থকাররূপে আমার জীবনের কোনও মূল্য আছে কি না, তাহা বিচারের যোগ্য পাত্র অন্তত আমি নহি।

বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতেই আমার জন্ম, অর্থাৎ বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার পরিপূর্ণ প্লাবনের মধ্যে, স্বদেশী আন্দোলনের সন্ধিক্ষণে আমার শিক্ষা সুরু হইয়াছিল। আসল এবং নকল জাতীয়তার একটা চরম উচ্ছ্বাসের পরম প্রকাশ আমরা বাল্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এই দুইটি ব্যাপার উত্তরকালে আমার সাহিত্য-জীবনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এক—আমি আধুনিক হইয়াও পুরাতন ভাবধারার উপর নির্ভরশীল; পূর্ব্ববর্ত্তী tradition অর্থাৎ ঐতিহ্য ও সংস্কারকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার মত যাযাবরত্ব আমার সহজাত নয়, আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অগণিত পুষ্প-সম্ভার যে বিশাল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত, নবম শতাব্দীর অস্পষ্ট অন্ধকারে তাহার মূল, চণ্ডীদাস হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ ছয় শতাব্দী ধরিয়া তাহার কাণ্ড এবং পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' পর্য্যন্ত নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া রবীন্দ্রনাথে তাহার পুষ্পপরিণতি ঘটিয়াছে, ফলের সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছে; কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা এখনও নিঃসন্দিগ্ধ নহি। আধুনিকতার দ্বন্দ্বে এই বিরাট মহীরুহকে অস্বীকার করিয়া অনির্দ্দিষ্ট নূতনকে জয়যুক্ত করিবার সাহস আমার নাই।

দুই—ভাবপ্রবণ রোমান্টিক আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হওয়াতে আমাদের যুগের সাহিত্যপ্রচেষ্টা এখনও মূলত কাব্যধর্ম্মী, নিছক prose বা গদ্য এখনও আমাদের নিগূঢ় সমর্থন লাভ করিয়া পুষ্ট হইয়া উঠে নাই। গদ্যের উপরেও আমরা কবিতার ধর্ম্ম আরোপ করিয়া মানস-বিলাসের পক্ষপাতী। এমন কি আমাদের সাময়িক সাহিত্য এবং বিজ্ঞাপনী সাহিত্যও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিপ্রধান গদ্যের গৌরব লাভ করে নাই। আমার সাহিত্য-জীবনে রূঢ় সমালোচনার অংশ অপেক্ষাকৃত প্রধান হইলেও উচ্ছ্বাস-প্রবণতা এবং আবেগসর্ব্বস্বতায় তাহা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া মাঝে মাঝে পতিত হইয়াছে, আমার দীর্ঘ শিক্ষণীয়কালের বিজ্ঞানের পাঠও আমাকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

১৩৪০ সালে লিখিত একটি কবিতায় আমার শৈশব ও কৈশোরের কাব্যানুভূতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে,

নদীমাতৃক বাংলা দেশে প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যেই ইহার উন্মেষ, মহানন্দা-তীরবর্ত্তী মালদহে এবং অজয়-তীরবর্ত্তী স্বগ্রাম রাইপুরে আমার কাব্যদেবতার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের ইতিহাস নিতান্ত সাধারণ হইলেও উল্লেখযোগ্য—

কুলুকুলু মহানন্দা, দুই তীরে শান্ত জনপদ ;
এপারে দাঁড়াযে এক ক্ষুদ্র শিশু গণে জল-ঢেউ—
এক, দুই, তিন, চারি ; কাঠের গোলার আশেপাশে
সঙ্গীরা প্রসন্ন মনে খেলিতেছে লুকোচুরি খেলা।
আকাশ আঁধার করি' ওঠে মেঘ, নামে জলধারা,
জলশর বিদ্ধ হয়ে পরপার ঝাপ্‌সা দেখায়।
স্নানার্থী এসেছে যারা তারা কলকোলাহল তুলি'
'আছাড়ি' সাঁতারি' খেলে বরষার নবীন উল্লাসে।
নদীপাড়ে শিশু-মনে সহসা সে অপূর্ব্ব প্রকাশ—
টাপুরটুপুর বৃষ্টি কোন্ সে নদীতে এল বান ;
গান তার ভেসে এল, শিহরিল বিহ্বল বালক।
সে গানের রেশধ্বনি এল শীর্ণ অজয়ের তীরে ;
বালি-কাঁকরের পথ, লালমাটি ছোঁট গ্রামখানি,
পূর্ব্বপুরুষের ভিটা ; গিরি নদী গৈরিক বন্যায়
সহসা ফুলিয়া ওঠে, কৈশোরে ছাপিয়া যায় কূল !
এলেমেলো কত গান, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথের,
অদূরে নান্নুর গ্রামে রচে পদ বড়ু চণ্ডীদাস—
মেদুর মেঘের ছায়া আবার ঘনায়ে এল নভে !
গুচ্ছে গুচ্ছে থরে থরে নদীচরে ফোটে কাশফুল।
শীর্ণ হ'ল জলধারা বালুরাশি নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

আমার এই অন্তঃপ্রকৃতি স্থূল এবং কলেজ জীবনে যে বিবাহের উপহারে, শিক্ষকের বিদায়-অভিনন্দনে, বন্যাত্রাণ-সমিতির নগর-কীর্ত্তন গানে, উৎকট স্বদেশী ও প্রেমের কবিতায়, স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিনে গল্প-প্রবন্ধ ও কবিতার আকারে এবং বন্ধুমহলের প্রীতিসম্পাদনার্থ একাধিক প্রহসন বা গীতিনাট্য প্রকাশের পথ খুঁজিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যরসিকদের কাছে তাহা সংবাদই নয়, কারণ এযুগে এসব যাহারা করে নাই বা করে না, তাহারাই অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়। কলেজে আমি ছিলাম বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্র, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন ইলেক্‌ট্রিকাল এঞ্জিনীয়ারিং ক্লাসেও হাজিরা দিয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং নিজের এই দুর্ব্বলতাকে আমি খুব প্রীতির চক্ষে দেখিতাম না, যথাসম্ভব চাপা দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম।

আমার বাল্য কৈশোর ও যৌবনের আর একটি বিশেষ প্রবণতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আমি আবাল্য সময় পাইলেই পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই পড়িতাম, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পূর্ব্বেই বাংলা উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা এবং সাময়িক-পত্রিকা যে কত পড়িয়াছিলাম, তাহার হিসাব দেওয়া কঠিন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মাইকেল, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দামোদর কেহই আমার অনধীত ছিলেন না ; একাধিক সহস্র রজনী, ইহার উহার গুপ্তকথা, বটতলার চটকদার প্রেমের ও রহস্যের উপন্যাস, রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস এবং অসংখ্য তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া মনে মনে এক অদ্ভুত জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেখানে অনন্ত কৌতুহল এবং অনন্ত বৈচিত্র্য—আমার উচ্চতর বিজ্ঞানবুদ্ধিও সেখানে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত। নির্ব্বিচারে এই সকল কুপাঠ্য অপাঠ্য পড়িবার ফলে ভাষা ও শব্দ সম্পদে আমি বাল্যকাল হইতেই সম্পন্ন হইতে পারিয়াছিলাম।

এই গেল আমার সাহিত্য-জীবনের আয়োজন এবং উপকরণ, এই নিষিদ্ধরাজ্যে অভিযানের ইতিহাস এইবার বলিতেছি—

এম. এস-সি. পড়িবার সময় রবীন্দ্রনাথের কাব্য আমাকে বিশেষভাবে পাইয়া বসে ; 'সোনার তরী' হইতে 'বলাকা' পর্য্যন্ত তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি আমি অবিরত পড়িতাম, এবং বন্ধুমহলে অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতাম। আমার মত রবীন্দ্রনাথকে কেহ পড়ে নাই বা বুঝে না, ইহাই আমার সেকালের গর্ব্ব ছিল, এবং রবীন্দ্রনাথই ছিলেন আমাদের সকল আড্ডার সকল কলহের উপলক্ষ। এই সকল কলহকে আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন প্রচণ্ড সমর্থকরূপে বাংলা সাহিত্যের পাঠকশ্রেণী হইতে লেখকশ্রেণীতে আমি উত্তীর্ণ হইলাম। আমার বিশ্বাস, আমাদের আগের যুগে অর্থাৎ 'ভারতী'-'সবুজ পত্রে'র যুগে অনেকেই এইভাবে বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ-

লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রোত্তর দুই একজন কবিকে লইয়া কলিকাতার দুই একটি সাহিত্য-মহলে এবং একাধিক পত্রিকায় তখন প্রীতিমত আন্দোলন চলিতেছিল, তাঁহারা প্রচার করিতেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ' হইয়াছে, নূতনদের বিজয়যাত্রা কে রোধিবে ?' প্রতিবাদে এই সকল কবির কবিতাকে তুচ্ছ করিবার জন্য প্যারডি লিখিতে লাগিলাম। এই অভিযান প্রসঙ্গে কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিল, সাহিত্য-সাধনাকে জীবনের ব্রত করিয়া লইবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহিত করিলেন ; বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রশস্ততর এবং সমৃদ্ধতর আসর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি সরস্বতীর সর্ব্বাঙ্গ এবং দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। আমার জীবনের গতি এক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

সেই হইতে 'শনিবারের চিঠি,' 'প্রবাসী,' 'যুগবাণী,' 'বঙ্গশ্রী' ও 'অলকা'র আশ্রয়ে প্রধানত সমালোচক এবং সম্পাদকরূপে আমি বঙ্গবীণাপাণির সেবা করিয়া চলিয়াছি। যে অপ্রিয় দ্বন্দ্বের দ্বারা এই সাহিত্য-জীবন সুরু করিয়াছিলাম, তাহার এখনও সম্পূর্ণ নিরসন হয় নাই, বহু অকারণ বিরোধ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, কঙ্কর-কণ্টকে চরণ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, কিন্তু এই সুদুর্গম পথ এখন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই। গ্রন্থকার হিসাবেও আমার অধিকাংশ কীর্ত্তি এই সকল কলহ-দ্বন্দ্বকে ঘিরিয়াই, নিছক রসরচনার, অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির নির্ম্মল অবকাশ আমি এখন পর্য্যন্ত কদাচিৎ লাভ করিয়াছি। আমার প্রথম গ্রন্থ 'অজয়' আমার তরুণ কবিমনেরই নিরুদ্দেশ যাত্রার ইতিহাস, পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইতিহাস। একমাত্র 'পথ চলতে ঘাসের ফুল'কেই উদ্দেশ্যহীন কাব্যের কোঠায় ফেলিতে পারি। 'অনুষ্ঠ', 'মধু ও হুল', 'বঙ্গরণভূমে' ও 'মনোদর্পণ' সাহিত্য-সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রচলিত ন্যাকামি ও ইতরতার বিরুদ্ধে অভিযান, সুতরাং সর্ব্বজনগ্রাহ্য ও সকলের প্রিয় নহে।

এই অত্যন্ত সচেতন অবস্থার জন্য যে সময়ে সময়ে মানসিক পীড়া অনুভব করি না, তাহা নয়। যে দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সাহিত্য-জীবন সুরু হইয়াছিল, মাঝে মাঝে তাহার অস্বাভাবিকতা আমাকে বিষণ্ণ করিয়া তুলে, "দিনান্তে" কবিতায় তাহার পরিচয় আছে—

যে আলো দেখেছি গগনের কালো বুকে
ভুল ক'রে গেছি আলেয়া তাহারে ভাবি,
যে আলো চকিতে ঝলসে মশাল-মুখে
সেই ক'রে গেছে সূর্য্য-প্রণাম দাবি।
হাটের ভিড়েতে হয় না তোমার পূজা
মৃদ্রাযন্ত্র নহেক যন্ত্র তব—
তুমি বীণাপাণি নহ তুমি দশভুজা,
নূতনের যুগে যত সাজ অভিনব !
যন্ত্রের বীণা ভাবিয়াছিলাম ভুলে,
মনে হয়েছিল শোনা যায় কিছু সুর,
আজিকে সহসা দেখি যে হিসাব খুলে
তোমা হতে দেবী, চ'লে গেছি বহুদূর।

এই মনোবৃত্তি হইতেই 'রাজহংস' ও 'আলো-আঁধারি'র জন্ম। এই দুইটি কাব্যকে আমার সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় অভিব্যক্তি বলিতে পারি। পৃথিবীর সমস্ত অভাব অভিযোগ দারিদ্র্য নির্য্যাতন নিষ্পেষণ পঙ্কিলতা সত্ত্বেও ঊর্দ্ধমুখী মানুষের প্রাণ ইহাদের অতিক্রম করিয়া দিশাহীন নভোযাত্রা করিয়াছে—'রাজহংস' সেই গতির কাব্য।

ধরণীর রাজহংস জীবনের অনন্ত প্রতীক
উড়িছে অনন্তকাল মহাকাল-আকাশ-সাগরে ;
নিম্নে কাল-কালিন্দীর তমশীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ,
ডাকিতেছে যুগে যুগে ঝাঁপ দিতে সে তিমির-নীরে,
ধরিতে পারে না তারে ঊর্দ্ধে তার বিরাট প্রয়াণ,
উচ্চে নীচে চলে দুই গতির প্রবাহ,
চলিবে অনন্তকাল, মিশিবে না কভু একেবারে।
মৃত্যুর বীভৎস বিবর্ণতার মধ্যে জীবনের সবুজ অনায়াসে মাথা তুলিতেছে—
যে জীবন যুগে যুগে মৃত্যুরে করিল উপহাস,
মৃত্যুরে করিল নমস্কার—
করিল না ভয়,
শ্মশানের ভস্মস্তূপে সে জীবন খুঁজিছে আলোক,
মাটি ফুঁড়ি উঠিবে আকাশে—
মৃত্যুর বন্দনা গানে,
সে জীবনে বার-বার জানাই প্রণতি।

আমি দেখিয়াছি, সকল অসঙ্গতি, সকল ব্যর্থতা সত্ত্বেও মানুষের সেই জীবনই জয়ী হইতেছে। মৃত্যুর কবন্ধ-মূক-অন্ধকারে এই স্পন্দিত মানুষের ইতিহাসই আমাকে বিস্মিত করে। সমস্ত ক্ষুদ্র-ক্ষতির মাঝখানে দাঁড়াইয়া আকাশলোকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি মানুষকে বলিতে শুনিতেছি—

মরিতে করি না ভয়, যুগে যুগে মরিয়াছি আমি—
আমার গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধা কত মিশিল ধূলায়।
কত উর, বাবিলন, ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, কার্থেজ,
যুগে যুগে কত জাতি জন্ম নিল, মরিল নিঃশেষে—
ফারাও, কাইসার কত, শার্লমেন, চেঙ্গীজ, তৈমুর—
পাষাণ মর্ম্মরমূর্ত্তি কারো আছে, কারো পড়ে ভেঙে,
স্মৃতি সে পাষাণভার বিস্মৃতির প্রত্যন্ত সীমায়।

* * *

বহ্নিরে করেছি বন্দী, অশনি শোনায় মোরে গান,
সে গানের অন্তরালে লক্ষ লক্ষ মৃত মানবের
উঠিতেছে অবিরাম মৃত্যুঞ্জয়ী জয়োল্লাস ধ্বনি!

'আলো-আঁধারি'র তত্ত্ব আরও সহজ। আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বই মানুষের জীবন, আমাদের চিত্ত নিত্যকাল ছায়া আলো বাসনা ও বিবেকের দ্বন্দ্বে সংশয়-দোলায় দুলিতেছে, কখনও আলোর কখনও আঁধারের প্রাধান্য।

কে জেনেছে সবখানি আকাশে?
অনন্ত জীবনে মোর খণ্ড খণ্ড-তার পরিচয়,
অসম্পূর্ণ প্রাণমৃত্যু, কান্নাহাসি, সম্ভব-বিলয়।
রহস্যের যবনিকা আজো উঠিল না মোর,
যাহা বুঝি বুঝি শুধু আভাসে।

আমি বর্ত্তমানে যেখানে আসিয়া পৌছিয়াছি, সেখানে এখনও সংশয়ের তিমির বিরাজ করিতেছে, তবে সংশয়ের যে অবসান ঘটিতেছে, তাহার আভাস প্রত্যহ পাইতেছি। যে উগ্র আঘাত-প্রতিঘাতকে একদিন সাহিত্য-সাধনার একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, আজ মনে হইতেছে সেসকলই নিরর্থক, কালের প্রচণ্ড বাত্যাঘাতে যাহা ঝরিয়া পড়িবার, নিঃশেষে তাহা ঝরিয়া পড়িবে, তাহার জন্য মানুষের খবরদারির প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু সেই খবরদারিকেই একান্ত করিয়া দেখিলে ঠকিবার সম্ভাবনা আছে।

* পথের জনতায়
হারিয়ে ফেলে কখনো আপনারে
আপন মনে চলিয়া এনু সারাটা পথ ধরি'—
কলহ-কোলাহলে
কখনো মনে জমেছে বিষ, কখনো ধূলিজালে
হয়েছে কালো আমার দশদিশি।
বিপথপথে অনেক ঘুরে ঘুরে
অনেক বাট, অনেক ঘাট দিয়ে
পেরিয়ে কত শহর লোকালয়
হাজার লক্ষ তেপান্তরের মাঠ—
কোথাও নাই রূপকথাতে শোনা
হংসারূঢ়া আমার সরস্বতী।

* * *

ক্লান্তদেহে ফিরিনু আমি দীর্ঘপথ ধরি,
শান্ত মনে বসিনু এসে ঘরের বাতায়নে,
ঘুমায়ে পড়িলাম।
জাগিয়া আজ খুঁজিয়া পেনু হারানো আপনারে;
আমারই মন জুড়ে
বসিয়া আছে আমার সরস্বতী।*

বেতারের পল্লীমঙ্গল-আসর ও তার ভবিষ্যৎ

মিঃ এ. কে. সেন, অ্যাসিস্টাণ্ট স্টেশন ডাইরেক্টর, অল-ইণ্ডিয়া রেডিও, কলিকাতা

সাধারণত পড়াশোনাতেই মানুষ শিক্ষালাভ করে। আমাদের দেশে পড়ার শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অল্প, কিন্তু শোনার শিক্ষায় আমাদের দেশের লোক বহুকাল ধ'রে শিক্ষা পেয়ে আসছে। প'ড়ে শিক্ষালাভ করার উপায়টি কিছু আধুনিক। শুনে শেখাই মানুষের বহু-দিনকার অভ্যাস। যখন বই জন্মায় নি, ছাপাখানা

* কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে মুদ্রিত।

জন্মায় নি, পুঁথি জন্মায় নি—তখন মানুষের শিক্ষার একমাত্র উপায় ছিল শোনা। পৃথিবীর প্রাচীনতম শাস্ত্র যে বেদ, তাও মানুষ শিখে এসেছে শুনে শুনে—তাই বেদের অপর নাম শ্রুতি। আজও পণ্ডিত জ্ঞানীকে আমরা শ্রুতিধর বলি। এই সেদিন পর্য্যন্ত আমীদের দেশে কথকঠাকুররা ধর্ম্মমূলক আখ্যান ব্যাখ্যা ক'রে শত শত শ্রোতাকে আনন্দ দিতেন। তাতে যে শিক্ষা কতদূর হ'ত, তার প্রমাণ আমাদের কারও অজ্ঞাত নয়। শুনে শেখার বলেই আজও আমাদের দেশের নিরক্ষরদের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কত শত গ্রন্থ ও গান মুখস্থ হয়ে আছে।

আধুনিক জগতে বেতার এসেছে এই শ্রুতিশিক্ষার বাহন হয়ে। লোক-শিক্ষার দিক দিয়ে বেতার যে কতদূর উপযোগী, তার প্রমাণ পাশ্চাত্য দেশে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আমাদের দেশে বেতার আজ প্রায় বারো বছর হ'ল প্রচলিত হয়েছে—কিন্তু লোক-শিক্ষার দিক দিয়ে বিশেষ সাহায্য করবার অবসর তার জীবনে আসে নি। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, বেতারের এ ত্রুটিটুকু যাতে দূর হয়, তার জন্যে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করছি। সেই চেষ্টার প্রথম ফল হ'ল—আমাদের বেতার-প্রতিষ্ঠানে পল্লী-মঙ্গল-অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য—দেশের নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার। কিন্তু পল্লী-আসরের আজও শৈশব উত্তীর্ণ হয় নি, তাই তার কাছে আমরা কিই বা আশা করতে পারি! তবে এ কথাও সত্যি যে সম্মুখে রয়েছে তার বিরাট সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আজ তারই সম্বন্ধে দু একটি কথা বলছি।

মেদিনীপুরকে কেন্দ্র ক'রেই বাংলা দেশে পল্লী-অনুষ্ঠান-আন্দোলন সুরু হয়। আজ তিন বছর হতে চলল, সরকার বাহাদুর মেদিনীপুরে ১৫টি সেট দান করেন—ওখানকার পল্লীবাসীদের পল্লী-আসর-অনুষ্ঠান নিত্য শোনবার সুবিধার জন্যে। সম্প্রতি সরকারী কাজে আমাকে মেদিনীপুর যেতে হয়েছিল। ওখানকার সব পল্লীতে যেতে পারি নি, সাতটি মাত্র পল্লীতে কি ভাবে সেটগুলি চলছে, তা দেখে আসবার অবসর পেয়েছিলাম। সাতটি গাঁয়ের শ্রোতার সংখ্যা দেখে বাস্তবিক আনন্দলাভ করেছি। পাঠকদের অবগতির জন্যে নীচে তার বিবরণী প্রকাশ করছি—

গাঁয়ের নাম		শ্রোতার সংখ্যা (গড়পড়তা)
১। মাজুরহাটি	...	৬০০
২। ঢলুহরা	...	৩৯৫
৩। স্যাম্পাটি	...	৩৩৮
৪। কমলাপুর	...	২৮০
৫। মোগাল	...	২০৭
৬। শালবনি	...	১৫০
৭। তলকুই	...	৩০

এর মধ্যে তলকুইয়ের শ্রোতার সংখ্যা সর্ব্বনিম্ন। তার কারণ, এ পল্লীর সেটটিতে শোনবার বড় অসুবিধা। অন্য পল্লীর সেটগুলিতে সে অসুবিধা একেবারেই নেই, প্রত্যেক অনুষ্ঠান চমৎকারভাবে ধরা যায়।

গাঁয়ের হাটের কাছে সেট বসানো রয়েছে। আশেপাশের নানা গ্রাম থেকে হাটের দিনে যারা বেচাকেনা করতে আসে, কাজ সেরে তারা সবাই সেটটিকে ঘিরে বসে। শোনবার আগ্রহ যে তাদের কতদূর বিপুল, তা সত্যি দেখবার। বেতার সেটটি যেন তাদের কাছে দেবদূতের মত অমৃত পরিবেশনের ভার নিয়ে এসেছে। বেতারকে কেউ যদি সত্যি ক'রে ভালবেসে থাকে তো ওই সব পল্লীবাসীরা। দিনান্তে পরিশ্রমের পর কি আনন্দই তারা পায় পল্লী-আসর শুনতে; তাদের সর্ব্বাঙ্গে সে আনন্দ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নিত্য অন্নবস্ত্রের অভাবের মধ্যে, দারিদ্র্যদুঃখের মধ্যে শুধু ওই সময়টুকুই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে।

বেশ দেখলাম, প্রত্যেক শ্রোতাই বেতার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত। জানেও তারা রীতিমত; স্পেনের যুদ্ধ, পোপের মৃত্যু-খবর পর্য্যন্তও তারা রাখে। আর একটি সবচেয়ে বড় সুলক্ষণ যে, তারা প্রত্যেক বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানবার জন্যে সমুৎসুক, তাই প্রতি কথায় তারা শিশুর মত অজস্র প্রশ্ন ক'রে যায়। তাদের এই জ্ঞান-পিপাসা যে বেতারেরই অধ্যবসায়ে জেগে উঠেছে—এ কথা ভাবলেও আমার আনন্দ আসে। যারা মূক

নিরক্ষর ছিল, আজ বেতার তাদের মুখে ভাষা দেবার দায়িত্ব হাতে ক'রে নিয়েছে। তার সে কাজ কেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, তা লক্ষ্য করবার।

প্রথমে একটি ঘটনা উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। সেদিন মেদিনীপুরের একজন অতি নিরীহ চাষা-লোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "শব্দ তো শুনছ, বল দেখি, কোথা থেকে আসছে?" তৎক্ষণাৎ উত্তর পেলাম, "কলকাতা থেকে।" আমার পাশে ছিলেন প্রথানকার ডিষ্ট্রিক্ট পাব্লিসিটি অফিসার; তিনি আবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কলকাতার শব্দ এখানে আসছে কি ক'রে? তার কই?" তেমনই অপ্রত্যাশিত-ভাবেই উত্তর এল, "তার থাকবে কেন? এ হাওয়ায় আসে, এ যে বেতার।" এর সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য নাই প্রকাশ করলাম। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল বেতার পল্লীবাসীদের জীবনের ওপরও কতখানি প্রভাব বিস্তার করছে—তার কথা। একটি উদাহরণ দিলে বোধ হয় অবান্তর হবে না। এক গাঁয়ের এক বৃদ্ধ চাষী বললে, "বেতার যে কি আশ্চর্য্য কাণ্ড করছে, তা ভাবলেও জ্ঞান থাকে না। আমার পড়শী "—" টাকে দেবার ওপর ছিল বেজায় চটা। কিন্তু বাবু, যেদিন সে আপনাদের বেতারে টাকে দেওয়ার ভালমন্দ সম্বন্ধে শুনলে, সে কি করলে জানেন, টাকেদারকে ডাকিয়ে সে তো টাকে নিলেই, তার গুষ্টিবর্গ যে যেখানে ছিল সবাইকে টাকে নেওয়ালে।"

এমনই ক'রে পল্লী-আসর তথা বেতার দেশবাসীর মনে শিক্ষার আলো জাগিয়ে তুলছে। যারা নিরন্ধ্র অন্ধকারে একান্ত দৈন্যে দুঃখের দিনগুলিকে কোন প্রকারে অতিবাহন ক'রে আসছিল, আজ তারা উচ্চশিক্ষার প্রখর আলোক না পাক—কি ক'রে দৈন্যের মধ্যেও সুসঙ্গতভাবে বাঁচা যায়, তার সন্ধান পাচ্ছে; সুখ না পেলেও, স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে। পল্লী-আসরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ তারা পল্লীতে সংস্কার-সমিতি, সেবা-সমিতি স্থাপন করেছে। দেশের শ্রী ফিরেছে—মনেরও শ্রী ফিরেছে।

আনন্দের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা আসে—সে শিক্ষা মানুষের জীবনে বড় গভীর রেখাপাত করে। তাই বুঝি পল্লী-আসরের শিক্ষা এত শীঘ্র মানুষের শক্তি-স্ফুরণে সাহায্য করেছে। আমি তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—বেতারের অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে, বিশেষ পল্লী-আসরসম্বন্ধে তাদের মতামত। তাতে তারা যা উত্তর দিয়েছিল, তার কিছু কিছু বলি। প্রথম তারা বললে, পল্লী-আসর সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শনিবারে বসানো খুবই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে, তবে সময় সম্বন্ধে তারা বলে, ৫টা থেকে ৬টা না হয়ে ৭টা থেকে ৮টা হ'লেই তাদের সুবিধা হয়। কারণ, দিনের কাজ তারা সবাই সাতটার আগে শেষ করতে পারে না। অবশ্য সময়টা যাতে বদলাতে পারা যায়, তার খুবই চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি মে মাস থেকে আমরা ৬-১০ মিঃ থেকে ৭টা পর্য্যন্ত পল্লী-আসর বসাবার বন্দোবস্ত করেছি। ভবিষ্যতে আরও পরে বসাবার আশা রাখি।

রামায়ণ আর গাজীর গানের যে দল ফরিদপুর থেকে এসে সেদিন বেতারে গান ক'রে গেছে, তাদের সুখ্যাতিতে প্রায় সব গ্রামই পঞ্চমুখ। শহরবাসীদের রুচিকর না হ'লেও, পল্লীবাসীদের যে ঐ সব অনুষ্ঠান ভাল লাগবে, তা নিশ্চয়। কারণ এই সব পল্লীগীতি তাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এ যে তাদেরই বাঁধা গান—এই গানে আছে তাদের জীবনের আদর্শ, তাদের নিজেদের ঘরের সুখদুঃখের কাহিনী। আমরা এই সব অনুষ্ঠানের পুনর্ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করব।

পল্লী-আসরের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আরও কোন সরল পথ অবলম্বন করতে হবে। এ ভাষা এমন হবে, যার মধ্যে অস্বাভাবিক অসঙ্গত কিছু থাকবে না—সহজ স্বচ্ছ ভাষায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলবে। যেমন পল্লী-উন্নয়ন, সমবায়-ঋণদান-সমিতি, সেভিংস ব্যাঙ্ক, ঋণ-সালিশী-বোর্ড, জল-নিষ্কাশন-প্রণালী ইত্যাদি—এগুলিকে সহজভাবে, সহজ ভাষায়, মধ্যে কিছু বা গান, কিছু হাসির কথা দিয়ে সাজিয়ে সবার কাছে এমন ভাবে ধরতে হবে যে, তাদের যেন গিলিয়ে ওষুধ খাওয়ানোর মত ক'রে শুনতে না হয়, বরং শুনলেই আরও শোনবার সাধ জাগে। এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি—আমরা শহরবাসীরা সাধারণত পল্লীবাসীদের একটু হীন চোখে দেখি। আমরা যেন তাদের ওপর গুরুগিরি ফলাতেই এসেছি, তাই আমাদের বক্তৃতায় কেমন একটা 'তোমরা

জান না, আমরা-জানি' ভাব জেগে ওঠে। এতে পল্লী-বাসীরা যে বিরক্ত হয়, আমরা তা ভাবি না। এমন-ভাবে ব্যবহার করলে পল্লীবাসীরা আমাদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারে না। যদি সত্যিই আমরা তাদের শিক্ষা দিতে চাই—তা হ'লে অমন ক'রে বেদীতে ব'সে নীরস বক্তৃতা দিলে ফল হবে না। তাদের সম-আসনে ব'সে তাদের আত্মীয় হয়ে তাদের ভুল শুধরে দিতে হবে। কর্ত্তব্য হিসেবে নিষ্প্রাণভাবে কাজ করলে চলবে না, তাকে প্রাণের রসে ভরিয়ে মাধুর্য্যময় ক'রে তুলতে হবে। প্রাণের সোগাযোগ না থাকলে পল্লীবাসী ভাবছে, আমরা তাদের ছোট ক'রে দেখছি—তখন আমাদের শত যত্নে বলা মৌখিক কথাগুলোর তারা বিকৃত অর্থ করবে, পালন করা তো দূরের কথা। তারা ও আমরা সমান সমান—এ ভাব নিয়ে তাদের কাছে কথা না বললে আমাদের সব কথা বলা অসার্থক হয়ে যাবে।

শুক্রবারের অভিনয় শুনতে তারা খুবই ব্যগ্র। প্রায় প্রত্যেক গাঁয়ে ঐ দিনেই সব চাইতে বেশি ভিড় হয়। কিন্তু এ কথাও তারা বললে যে শুক্রবারের অভিনয়গুলি বড় বেশি উচ্চাঙ্গের। সত্যি, সে কথা আমাদের ভাববার সময় এসেছে। বেতার আজ শুধু কলকাতার শহরবাসীদের জন্যে নয়, অতি দূরস্থ পল্লীবাসীর মনস্তুষ্টি করতেও সে হ্যায়ত বাধ্য। তাই আমাদের এমন সমস্ত বই অভিনয় করা উচিত, যা একসঙ্গে শহর ও পল্লীবাসীকে আনন্দ দান করতে সক্ষম। বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় পল্লীবাসীদের বেশি আনন্দ দেয় না। না দেওয়া আশ্চর্য্য নয়, যেখানে অন্ন-বস্ত্রের জন্যে, নিত্য অভাব-অভিযোগের জন্যে কত লোক নিরন্তর হাহাকার করছে, সেখানে আর দুঃখের অভিনয় শোনে কে? বাস্তবিক, হাসি তাদের দরকার, সপ্তাহে একটা দিনও যদি তারা হাসতে পায় আমাদের অভিনয় শুনে, আমরা কেন তাদের সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত রাখব? এবার থেকে আমরা চেষ্টা করব যাতে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও হাস্যরসাত্মক বই বেশি বেশি অভিনয় করানো যায়। পৌরাণিক নাটকে লোক-শিক্ষা, ঐতিহাসিক নাটকে অতীত দিনের গৌরবময় দিনগুলির স্মৃতি জাগানো, এবং হাস্যরসাত্মক নাটকে নির্ম্মল আনন্দ দান করা সম্ভব হবে।

গানের বিভাগে তারা ধ্রুপদ, গজল ও কীর্ত্তনের বড় বেশি পক্ষপাতী। যাত্রার গানও তাদের খুব ভাল লাগে। অবশ্য ধ্রুপদ ও গজলের বন্দোবস্ত করতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। কিন্তু কীর্ত্তন ও যাত্রার গান কলকাতা শহরে প্রায় দুর্লভ। যাও বা পাওয়া যায়, তাকে খাঁটি বলা যায় না। আমরা অবশ্য বাংলার সব জায়গা থেকেই কীর্ত্তন বা যাত্রার দল আনাতে পারি। এখন মুস্কিল এই যে, তাঁদের খোঁজ ক'রে বের করে কে? ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে সহজ হয়, যদি কীর্ত্তন বা যাত্রার দলেরা—তা তাঁরা যেখানকারই হোন—আমাদের কাছে পত্রব্যবহার করেন। আমরা তাঁদের আসা-যাওয়ার সুব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি। অনুষ্ঠানের তো বটেই।

বাজার-দর সম্বন্ধে এবার থেকে আমাদের এটুকু মনে রাখা দরকার যে, সাধারণত প্রায় প্রত্যেক গাঁয়ে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, শুধু সেই দ্রব্যগুলির দরই আমরা বলব। যে দ্রব্য গাঁয়ে জন্মায় না বা গাঁয়ের লোকের প্রতিদিনের ব্যবহারে লাগে না, তার দরও তাদের জানাতে গেলে মিথ্যা তাদের বিরক্তিই উৎপাদন করা হবে।

দেখলাম, আবৃত্তি শোনবার জন্য ওদিককার লোক বড়ই আগ্রহান্বিত। ভবিষ্যতে যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে সুলিখিত কবিতার আবৃত্তি করবার ব্যবস্থা আমরা করব।

আমাদের লক্ষ্য থাকবে শুধু সেইটুকু, যাতে গাঁয়ের লোকের অসম্পূর্ণ শিক্ষা আরও সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়। পল্লীবাসীদের জীবনে ধর্বতার যেন নিত্যদিনের অন্নবস্ত্রের মত অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। এই আমাদের কামনা। মেদিনীপুরের লোক বলছিল—যেদিন বেতারে কিছু শোনবার থাকে না, সেদিন বেলা যেন আর কাটতে চায় না। কিন্তু শুধু মেদিনীপুরই আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা চাই, সমগ্র বঙ্গদেশে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে বেতার ছড়িয়ে পড়ুক। তাদের জ্ঞান বেড়ে উঠুক, তাদের স্বাস্থ্য ফিরে পাক, তাদের আনন্দ আসুক। পল্লীবাসীর দৈনিক জীবনের অঙ্গস্বরূপ হয়ে উঠুক এই বেতার। সেদিন বহুদূরে নয়, তারও আভাস আমরা পাচ্ছি পল্লীর শ্রোতাদের অপরিসীম বেতার-প্রীতি দেখে।

একটা কথা চলেছে—মেদিনীপুর থেকে কয়েকটি সেট তুলে এনে কলকাতার কাছাকাছি কোন গাঁয়ে প্রতিষ্ঠা

করবার। এই সংবাদে গ্রামবাসীরা দেখলাম, বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ। এ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব, যাতে সেটি তুলে আনার কল্পনা কল্পনাতেই থেকে যায়। একটি কথা মনে রাখা উচিত— বাংলা দেশে বেতার প্রতিষ্ঠানকে চিরস্থায়ী করতে হ'লে পল্লীতে পল্লীতে তাকে পরিচিত ও প্রিয় ক'রে তুলতে হবে। বাংলার লোক সবাই শহরে থাকে না, বেশির ভাগই থাকে দূর পাড়াগাঁয়ে। নিখিল-বঙ্গব্যাপী বেতার-প্রচলন সম্ভব করতে পল্লীর লোকেরাই হবে আমাদের প্রধান অবলম্বন। পল্লীমঙ্গল-আসর সেই ভাবী বেতারময় বঙ্গের প্রথম আরম্ভ। জনসেবাই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু যাঁদের সেবায় আমরা ব্যাপৃত, তাঁদের সহানুভূতি যদি কোন আঘাত পায়, তা হ'লে সব আশা হতাশায় পরিণত হবে, সব চেষ্টা নিষ্ফল ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সমবায় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-সমিতি

ডাঃ অনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
ডিষ্ট্রিক্ট হেল্থ অফিসার, মেদিনীপুর

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনায় বাংলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি ব্যাধিগুলি অবাধে ধ্বংসলীলা চালাইতেছে। বাংলার পল্লী আজ শ্রীহীন, তাহার কৃষককুল মরণোন্মুখ। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে পল্লীবাসীর অজ্ঞতা, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, জল-নিকাশের অব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলে সুচিকিৎসার অভাবকেই পল্লীর বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী করিতে হয়। পল্লীগ্রামের জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসালয়ের একান্ত অভাব, তাহার উপর যোগ্য চিকিৎসকও পল্লীগ্রামে সহজে পাওয়া যায় না। সরকারী বা জেলাবোর্ডের তহবিলে এত টাকা নাই, যাহাতে প্রত্যেক ইউনিয়নে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া বৎসরের পর বৎসর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। পল্লীর এই সমস্যার সমাধানের জন্য সমবায় স্বাস্থ্যসংগঠন ও চিকিৎসার পরিকল্পনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উপস্থিত করা হইল। একতা, সহযোগিতা ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এই পরিকল্পনার মূল ভিত্তি।

এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে গ্রামে প্রচারকার্য্য চালাইয়া অন্ততঃ একশত জন সভ্য সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা যায়। দুইশত জন সভ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে সমবায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সমিতির কার্য্য সহজে চলিতে পারে। চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রাথমিক খরচের জন্য ৮০০৲ প্রয়োজন। এই টাকা সভ্যগণের প্রবেশ-ফী, কর্জ্জ ও চাঁদা-আদায়ের দ্বারা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সভ্যগণ নিম্নলিখিত হারে চাঁদা দিবেন—

(১) প্রতি সদস্যের প্রবেশ-ফী —চারি আনা
(২) বাৎসরিক চাঁদা —চারি টাকা
(৩) স্বাস্থ্য-সমিতির জন্য মাসিক চাঁদা —এক আনা

এক গ্রামে এত সভ্য না পাওয়া গেলে নিকটবর্ত্তী দুই তিনটি গ্রাম সংযুক্ত করিয়া একটি কেন্দ্র করা যায়। ডিস্পেন্সারির জন্য কেহ গৃহ দান করিলে গৃহ-নির্ম্মাণ বাবদ খরচ বাঁচিয়া যাইবে এবং চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রাথমিক খরচ কিছু কম হইবে।

সমবায় চিকিৎসালয় নিম্নলিখিত নিয়মে পরিচালিত হইবে :—

(ক) সাধারণ সভ্যগণ এক আনা হারে প্রতি শিশি ঔষধ পাইবেন।

(খ) সকালে দুই ঘণ্টা এবং বৈকালে এক ঘণ্টা বিনামূল্যে রোগী দেখিবার ব্যবস্থা থাকিবে। যাঁহারা সমিতির সভ্য হইবেন না, তাঁহারা এই সময় বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র পাইবেন, কিন্তু প্রতি শিশি ঔষধের জন্য তাঁহাদিগকে দুই বা তিন আনা দিতে হইবে।

(গ) সমিতির সভ্যগণের গৃহে গিয়া রোগী দেখিতে

হইলে চিকিৎসককে প্রতি বার ডাকের জন্য চার আনা ফী দিতে হইবে। কার্য্যের গুরুত্ব, হিসাবে ফীর তারতম্য হইতে পারে। যথা—রাত্রিকালে—।৵০ ; প্রসব করাইতে হইলে—১৲ ; অস্ত্রোপচারের জন্য—১৲। এই সকল অর্থ সমিতির তহবিলে জমা হইবে। কিন্তু যাঁহারা সমিতির সভ্য নহেন, তাঁহাদের গৃহে রোগী দেখিবার আবশ্যক হইলে চিকিৎসক নিজস্ব ফী আদায় করিবেন এবং ঐ টাকা সমিতির তহবিলে জমা দেওয়া হইবে না।

(ঘ) স্বাস্থ্য-বিষয়ক উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য-সমিতির তহবিল হইতে অর্থব্যয় করা হইবে। এইজন্য বৎসরের প্রারম্ভে সম্বৎসরের কার্য্যসূচী সমিতির কার্য্যকরী সভায় স্থির করিয়া তদনুসারে অর্থের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নিম্নে সমবায় চিকিৎসালয়ের আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব দেওয়া হইল—

আয়

২০০ জন সভ্যের প্রবেশ-ফী	...	৫০৲
বাৎসরিক চাঁদা ...	...	৮০০৲
স্বাস্থ্য-সমিতির চাঁদা ...	...	১৫০৲
সরকারী ও জেলাবোর্ডের সাহায্য (ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য)	...	১০০৲
চিকিৎসকের ফী-বাবদ	...	১০০৲
চিকিৎসালয়ে সমাগত রোগীর হাত হইতে প্রাপ্ত	...	১০০৲
মোট		১৩০০৲

ব্যয়

চিকিৎসকের বেতন (মাসিক ৬০৲ হিসাবে)	...	৩৬০৲
কম্পাউণ্ডারের বেতন (মাসিক ১০৲ হিসাবে)	...	১২০৲
ভৃত্যের বেতন (মাসিক ৩৲ হিসাবে)	...	৩৬৲
অন্যান্য খরচ	...	২৪৲
ঔষধপত্র	...	২৬০৲
আসবাবপত্র	...	৫০৲
পল্লী-স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য	...	২৫০৲
মোট		১১০০৲

[শেয়ার বাবদ ও অন্যান্য যে সকল চাঁদা পাওয়া যাইবে, তাহা রিজার্ভ তহবিলে জমা থাকিবে]

স্থানীয় সহৃদয় ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে অনুরোধ করিলে চিকিৎসালয় ও চিকিৎসকের বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত গৃহাদি সংগ্রহ করা যায়। যাঁহারা এককালীন ১০০৲ টাকা দিয়া আজীবন সদস্য হইবেন, তাঁহাদের টাকা ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করা যায়।

সমিতির কার্য্যকরী সভা থাকিবে। সাধারণ সভায় সমস্ত সভ্য মিলিত হইয়া এই কার্য্যকরী সভা গঠন করিবেন এবং একজন সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং হিসাব-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত করিবেন।

পল্লীবাসী এই ধরণের সমিতি স্থাপনের জন্য যে চাঁদা দিবে, উপকারের তুলনায় তহা সামান্যই। আমরা বীরভূম সমবায় চিকিৎসা-বিভাগের বিবরণী হইতে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব—

"বাঁধগোড়া সমিতির একজন সভ্যের পরিবারের এক বৎসরের চিকিৎসার ব্যয় হইয়াছে ২২৸০। গ্রামে সমিতি না থাকিলে বাজারদরে উক্ত চিকিৎসার ব্যয় হইত ১২৮৷৷০। অতএব দেখা যায়, এই একটি পরিবারের এক বৎসরের চিকিৎসায় ১০৫৸০ বাঁচিয়াছে। এইরূপভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, সমিতির সাহায্যে সমগ্র গ্রামের চিকিৎসার ব্যয় এক বৎসরে ১৬৬৩৸০ বাঁচিয়াছে।"

পতনোন্মুখ বাংলার পল্লীকে রক্ষা করিতে হইলে সমবায় চিকিৎসার উপকারিতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার সফলতা সম্পূর্ণভাবে গ্রামবাসীর মিলিত চেষ্টা ও উদ্যমের উপর নির্ভর করে। বাংলার সর্ব্বত্র সমবায় স্বাস্থ্য-সমিতির চিকিৎসক ও চিকিৎসালয় ছড়াইয়া পড়ুক।

ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিবরণ

কেশবচন্দ্র সেন

প্রাচীনকালে ঝাড়গ্রাম মহকুমা এক বিরাট বনভূমি ছিল এবং এই বনমধ্যে স্থানে স্থানে সাঁওতাল, কুর্মী, লধা প্রভৃতি আদিম জাতির বাস ছিল। কালক্রমে উড়িষ্যা ও বিহার হইতে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতি ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বৈদ্য, তাম্বুলি, মাহিষ্য, মোদক, বৈষ্ণব ইত্যাদি শ্রেণীর লোক এই মহকুমায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় এই মহকুমায় গ্রাম ও জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনও জঙ্গলের মধ্যে বহু আদিম জাতির বাস দেখা যায়। পূর্ব্বে এই জঙ্গলে শাল, পিয়াশাল, অর্জ্জুন, আবলুষ, শিরিষ, মহুল প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইত। বসতি বিস্তারের সঙ্গে জঙ্গল ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

এই মহকুমার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ উচ্চ ও জঙ্গলাকীর্ণ; মধ্যভাগ নিম্ন ও সমতল। এই মধ্যভাগেই লোকালয় ও শস্যক্ষেত্র বেশি। এখানকার অধিবাসীগণ প্রধানত কৃষিজীবী এবং অধিকাংশই নিরক্ষর। মুগ, বিরি, ছোলা, অড়হর, তৈলবীজ প্রভৃতি রবিশস্য, ধান্য, পাট, শণ, ইক্ষু ও সাময়িক শাকসব্জির চাষ-আবাদ হইয়া থাকে, কিন্তু কৃষকগণের অজ্ঞতাবশত গতানুগতিক প্রথাতেই চাষ-আবাদ চলিতেছে। শতকরা ১০০জন কৃষকের গৃহে দুগ্ধ ঘৃত দুষ্প্রাপ্য; যে দশ জনের বাড়িতে এগুলি উৎপন্ন হয়, তাহারাও সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। মৎস্য মাংস দুর্লভ। শুষ্ক মৎস্য পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক শুষ্ক মৎস্য ভোজন করে।

মহকুমার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। তথাপি পল্লী অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রকোপ দেখা যায়। এ অঞ্চলে কুষ্ঠব্যাধির প্রকোপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ডিষ্ট্রিক বোর্ড কুষ্ঠ-চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়া দেশের কিছু উপকার করিয়াছেন।

শিল্পের মধ্যে পেটবিন্ধি গ্রামের ক্ষুর, কাঁচি, গাঁতি, প্রভৃতি লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য, চিঁচড়া গ্রামের কাঁসা পিত্তলের বাসন ও গহনা এবং পিড়াশিমূল, মহাপাল, আলমপুর ও টোপগাড়িয়া গ্রামসমূহের তসর ও কেটের বস্ত্র উল্লেখযোগ্য। মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের জন্য স্থানে স্থানে কুম্ভকার আছে, কিন্তু তাহাদের কার্য্যে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায় না। মৃৎপাত্রগুলি অত্যন্ত ভারী হয় এবং আদৌ টেঁকসই হয় না। স্থানীয় সূত্রধরগণ মোটামুটি কৃষিকার্য্যের সরঞ্জাম ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। নয়াগ্রাম থানার জঙ্গলে এবং গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ধ-ডাঙ্গরি ও মারিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে তসর-গুটিপোকার চাষ হয়।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, গুড়, মুগ, বিরি প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। জঙ্গলের মালিকগণ প্রতি বৎসর স্ব স্ব জঙ্গল হইতে টিম্বার, জ্বালানিকাষ্ঠ, মহুল, কুচিলা, হরিতকী, বহেড়া প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান হন।

সমাজের অধিংকাংশ লোক অশিক্ষিত কৃষক। এঁদের মধ্যে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যতা অত্যন্ত প্রবল। প্রত্যেক জাতির এক এক জন প্রধান ব্যক্তি আছেন। ইনি পুরোহিত-ব্রাহ্মণের পরামর্শ অনুসারে জাতির বিচার করেন। এঁকে কোন কোন স্থানে "পরামাণিক" বলিয়া ডাকা হয়। কে স্পৃশ্য, কে অস্পৃশ্য, কাহার জাতিচ্যুতি ঘটাইতে হইবে, কাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে। এ সমস্তই "পরামাণিক" বিচার করেন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন। কেহ দায়ভাগ, কেহ বা মিতাক্ষরা কার্য্য করেন। তাম্বুলি, মাহিষ্য, মোদক প্রভৃতি যে সকল জাতি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক মাস অশৌচ পালন করেন। বৈশ্যগণ ১৫ দিন এবং উড়িষ্যা ও বিহারের ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ প্রায় সকলেই ১০ দিন হইতে ১৩ দিন পর্য্যন্ত মৃতাশৌচ পালন করেন। কোন কোন জাতির দিবাভাগে বিবাহের লগ্ন নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ, রাজু, সদ্গোপ, দণ্ডছত্র, মাঝি প্রভৃতি জাতির কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে কন্যাপণের প্রথা বিদ্যমান।

কুসংস্কার সকল দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। তবে এখানকার "ডাহিনে"র কুসংস্কার কিছু আশ্চর্য্য রকমের। কোন কোন অশিক্ষিত রুগ্ন "ডাহিনে"র প্রতি এত আস্থাবান যে, প্রবল জ্বরে রোগী প্রলাপ বকিতে থাকিলে তাহাকে "ডাহিন"-গ্রস্ত বলিয়া সন্দেহ করা হয় এবং "ডাহিন" বিতাড়নের জন্য রোগীকে উত্তম মধ্যম প্রহার করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রহার করিতে করিতে একজন ক্লান্ত হইয়া পড়িলে দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করে।

এই মহকুমার স্থানীয় ছাত্রগণ বাড়িতে যে ভাষায় কথোপকথন করে, তাহাকে খাঁটি বাংলা অথবা খাঁটি উৎকল বলা চলে না। বাংলা, উৎকল ও বিহারী এই তিন ভাষার মিশ্রণে এই ভাষার উৎপত্তি এবং ইহা এ অঞ্চলে "মাঝিয়া ভাষা" নামে অভিহিত। "মাঝিয়া" শব্দের অর্থ মধ্যস্থানীয়। শৈশব হইতে ছাত্রগণ গৃহে মাঝিয়া ভাষায় অভ্যস্ত হয়; বড় হইয়া বঙ্গভাষায় রচিত পুস্তক পড়িতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক যখন ছয় সাত বৎসরের ছাত্রগণের সহিত বাংলা ভাষায় কথা বলেন বা কোন বিষয় বুঝাইয়া দেন তখন ছাত্রগণ হয় তাঁহার অনেক কথার অর্থ মাঝিয়া ভাষার সাহায্যে অনুরূপে গ্রহণ করে নতুবা অনেক কথার অর্থবোধ করিতে পারে না। বিহারের সিংভূম জেলা, উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলা ও ময়ূরভঞ্জ এই কয়টি স্থানের প্রভাবের সহিত মেদিনীপুর জেলার প্রভাবের-সংমিশ্রণে ঝাড়গ্রাম মহকুমার ভাষা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমি কয়েকটি প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের মাঝিয়া রূপান্তর দেখাইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। ভবিষ্যতে মহকুমার অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক)

বাংলা	মাঝিয়া
চিরুনি	ফানিয়া
মাথা আঁচড়ানো	মুড় খাঁকা
ঝাঁটা	ছাচুন
গোড়ালি	গঁইঠা বা গুঁইঠা
হাঁচা	ছিঁকা
রৌদ্র	খড়া
কাপড়	মুগা
কাপড়চোপড়	মুগাপাটা
আঁগুন	নিয়া
মুড়কি	উথড়া
ফেন	পেজ
পালক	পাখু
বারংবার	বেলকুবেল
জ্বালাতন	দিগ্‌দারী
স্ত্রীলোক	মাহাড়া
স্বামী	ঘৈতা
স্ত্রী	মাইপো
ফোঁটা ফোঁটা	ঠপা ঠপা
আর্দ্র	লসম বা নস্‌মা
ভিজা	অদা
জোৎস্না রাত্রি	জন রাতি

(খ)

বাংলা বাক্য

আমি বারংবার বলিতেছি
ছাগল ডাকিতেছে
এগুলো কি ?
মাথা ব্যথা করছে
বাবা ডাকছেন
উল্টে গেছে
আমি ঢিল ছুঁড়িতেছি
আমার ঠাকুরদাদা মারা গেছেন
সে উঁকি মারে

মাঝিয়া প্রতিবাক্য

মুই বেলকুবেল বলট
ছেলি ববায়টে
এগা কিগা ?
মুড় ব্যথায়টে
বাপা ডাকেন্‌ঠেন বা বাপা ডাকুছন
নউটি যাইছে বা ঘোলটি যাইছে
মুই হুঁটাল ফিক্‌ড়ট
মোর গুসা মরি যাইছেন
সে টিঁহি কেটে

দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা

ষাঁড়পুর ইউনিয়ন-বোর্ড দাতব্য-চিকিৎসালয়

গত ১৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখে, সদর (উত্তর) মহকুমায় ডেবরা থানার এলাকায় ষাঁড়পুর ইউনিয়ন-বোর্ড দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. এই চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। মেদিনীপুর জেলা-বোর্ড এই চিকিৎসালয়ের সাহায্যে ৪০০৲ দান করেছেন এবং ষাঁড়পুর ইউনিয়ন-বোর্ড চিকিৎসালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের ৩৭(খ) ধারামতে ২৫২৲ অতিরিক্ত কর ধার্য্য করে অর্থসংগ্রহ করেছেন। ইউনিয়ন-বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী উদ্বোধন-দিনে যে বিবরণী পাঠ করেছিলেন, তা থেকে জানা যায় যে, বোর্ডের সভ্য জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ নিজব্যয়ে জমি কিনে চিকিৎসালয়ের জন্য স্থায়ী ইমারত এবং ডাক্তারের বসবাসের গৃহ তৈরি ক'রে দেবেন। ততদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসালয়টি লোয়াদা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র তলোয়ারের পাকা বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোয়াদা আজ শ্রীহীন। স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি এর লুপ্তশ্রী ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছেন। এই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার মূলেও রয়েছে তাঁদের কর্ম্মপ্রেরণা। তাঁদের জনসেবার আদর্শ সর্ব্বত্র অনুসৃত হোক।

সবঙ্গ ইউনিয়ন-বোর্ড দাতব্য-চিকিৎসালয়

সদর (দক্ষিণ) মহকুমায় সবঙ্গ ইউনিয়ন-বোর্ডের চেষ্টায় সবঙ্গ গ্রামে একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে। গত ৭ই মার্চ তারিখে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. এই চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেছেন। জেলাবোর্ড থেকে চিকিৎসালয়টির সাহায্যে ৪০০৲ পাওয়া গেছে, ইউনিয়ন-বোর্ডও গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের ৩৭(খ) ধারামতে কর ধার্য্য ক'রে চিকিৎসালয় পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহ করেছেন। বোর্ডের সভাপতি মুন্সী সেখ আলাউদ্দীন আহম্মদ চিকিৎসালয়ের জন্য গৃহ দান ক'রে সমস্ত ইউনিয়নবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত সবঙ্গ থানার দরিদ্র পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ক'রে এই চিকিৎসালয়টি দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক।

গুড়দলা ইউনিয়ন-বোর্ড দাতব্য-চিকিৎসালয়

সদর (দক্ষিণ) মহকুমায়, নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে "গুড়দলা ইউনিয়ন-বোর্ড দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে। গত ১২ই মার্চ তারিখে, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নী মাননীয়া মিসেস সেন বিপুল জনতার সম্মুখে এই চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন এবং এর সাহায্যে পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি কামনা করেন। মেদিনীপুর জেলাবোর্ড এই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০০৲ অর্থসাহায্য দিয়েছেন।

নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত গুড়দলা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন গুড়দলা পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী

এই পল্লী-উন্নয়ন সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে, পল্লীবাসীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় এবং সরকার বাহাদুর, ডিষ্ট্রিক বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে পল্লীবাসীর দুঃখ দূর করা।

এই দুঃখের একমাত্র কারণ যে অর্থাভাব, তা এখন কেহই অস্বীকার করিবেন না। অর্থাভাব দূর করিবার দুইটি উপায় সাধারণত অবলম্বিত হইয়া থাকে,—একটি ব্যয় কমাইয়া অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অর্থাভাব

মোচন করা। এ সম্বন্ধে আলোচনার স্থল এ নয়। আর একটি উপায় জনসাধারণের অভাববোধ বাড়ানো এবং আয় বৃদ্ধি করিয়া অভাব মোচন করা। এই উপায়ই আমাদের অবলম্বনীয়।

অর্থাভাব মোচন অথবা আয় বৃদ্ধির জন্য প্রথম এবং প্রধান কাজ স্বাস্থ্যের উন্নতি ও রোগ নিবারণ দ্বারা শরীর ও মন সবল কর্ম্মকুশল করা।

আলোচ্য বর্ষে আমাদের ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে রাস্তা বাঁধা, জঙ্গল কাটা, জল-নালা পরিষ্কার, পুল-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী পরিষ্কার, নলকূপ স্থাপন ও গ্রন্থাগার স্থাপন প্রভৃতি কতকগুলি জনহিতকর কার্য্য হইয়াছে। এই সকল কার্য্যের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। রাস্তা বাঁধাই :—

মৌজা রাধানগর ও রেণুয়া—	দৈর্ঘ্য	৭৬৪৯	হাত ;	প্রস্থ ৫	হাত
" শশিন্দা—	"	২২৩৫৫	"	"	"
" পাইখলা—	"	৮৬১	"	"	"
" বেহালা—	"	২১৫	"	"	"
" রামসরিয়া—	"	৭৯৫	"	"	"
" তারিয়াপুঞ্জি—	"	১৩০৫	"	"	"
" বৈরামপুর—	"	৪০০	"	"	"

জঙ্গল কাটাই (রাস্তার জন্য)

মৌজা পাঠানটোলা—	"	২০০	"	"	"
" বেহালা—	"	৫০	"	"	"
" পাইখলা—	"	১৩০	"	"	"
" গহিরা—	"	১০৬৬৭	"	"	"
" রাধানগর ও রেণুয়া	"	২৮৬৭	"	"	"
" গুড়দলা—	"	৬৪০	"	"	"
" আম্বিভাঙ্গর—	"	৪২৪	"	"	"
" শশিন্দা—	"	৩১০৮	"	"	"
" বৈরামপুর—	"	১০০	"	"	"

ড্রেন পরিষ্কার :—

মৌজা রাধানগর ও রেণুয়া—	দৈর্ঘ্য	১৫০০	হাত ;	প্রস্থ ৬	হাত
" শশিন্দা—	"	১৪৫৭	"	"	"

পুল-নির্ম্মাণ :—৩টি

মৌজা রাধানগর—	১টি	দৈঃ	১২	হাত	প্র	৬	হাত
" রেণুয়া—	২টি	"	৪	"	"	৪	"

২। পুষ্করিণী পরিষ্কার :—

মৌজা বৈরামপুর	৪টি	মৌজা	শশিন্দা	"	৪টি
" রাধানগর ও রেণুয়া	১৬ "	"	গুড়দলা		৩টি
" রামসরিয়া	২ "	"	বড়ামোহনপুর		২টি
" গহিরা	৪ "	"	পাইখলা		২টি

৩। পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির প্রচেষ্টায় এবং এই ইউনিয়নের কতিপয় যুবকের অক্লান্ত পরিশ্রমে গত অক্টোবর মাসে এই ইউনিয়নের রাধানগর গ্রামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ২৩০। এই গ্রন্থাগারে ইউনিয়নের সর্ব্ব-সাধারণ যাহাতে আসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মহামান্য জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ, বি: আর. সেন, আই. সি. এস. মহোদয়ের পরিকল্পনায় এই জেলার প্রত্যেক গ্রামবাসী যাহাতে বিনাব্যয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, সেজন্য এই জেলায় একটি "বয়স্ক শিক্ষা চলন্ত লাইব্রেরি"র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা উক্ত লাইব্রেরি হইতে একটি ভ্রাম্যমান পুস্তকের বাক্স পেয়েছি।

এই সমিতির কতিপয় উদ্যোগী যুবক ঐ গ্রন্থাগারের পুস্তক লইয়া প্রত্যেক গ্রামে সন্ধ্যাবেলা সমবেত গ্রামবাসীগণকে পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইয়া যাহাতে প্রত্যেক গ্রামবাসীর সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়, তজ্জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এই সমিতি হইতে এই সকল যুবকের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দর্শাইতে পারিবেন, তাঁহাকে বৎসরের শেষে যদি আমাদের সমিতির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হয়, তবে অর্থ দ্বারা অথবা অন্য যে কোন উপায়ে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪। ইউনিয়ন পল্লী-সমিতির প্রচেষ্টায় ও ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে নিম্নলিখিত চারিটি গ্রামে চারিটি নলকূপ খনন করা হইয়াছে। রঘুনাথপুর গ্রামে ১টি, গহিরা গ্রামে ১টি, তারিয়াপুঞ্জি গ্রামে ১টি এবং গাঙ্গুড়িয়া গ্রামে ১টি।

৫। এই ইউনিয়নে শিক্ষাবিস্তারকল্পে নিম্নলিখিত গ্রামগুলিতে এক একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।—

(১) রঘুনাথপুর	নিঃ	প্রাঃ	বিদ্যালয়
(২) মহম্মদপুর	"	"	"
(৩) গহিরা	"	"	"

শ্রীফণীভূষণ দাস
সম্পাদক, গুড়দলা
পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি

ছেলেদের স্পোর্টস

মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ইণ্টারস্কুল স্পোর্টস অ্যাসোশিএশনের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহের সঙ্গে হয়ে গেল। প্রত্যেক মহকুমা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রের দল এসেছিল এবং ৬ই ফেব্রুয়ারি তাদের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা (heats) হয়েছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হয়। সেদিন মেদিনীপুর ডায়মণ্ড ময়দানে বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। চারিদিকে অগণিত ছাত্রের দল, মধ্যে মধ্যে "গ্রেনেডিয়ার রেজিমেণ্টে"র ব্যাণ্ড বেজে উঠে সুরের লহরী ছড়িয়ে দিচ্ছে—সেদিনকার সে দৃশ্য ভোলবার নয়। অ্যাসোশিএশনের প্রতিষ্ঠাতা—মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. এদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁহার পত্নী শ্রদ্ধেয়া মিসেস সেন স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ ক'রে প্রতিযোগীদের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করেছিলেন। প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে দেওয়া গেল—

সিনিয়র ছাত্রদের জন্য

(ক) ১০০ গজ দৌড়—১। আবু তাহের জান (মেদিনীপুর কলিজিয়েট)
২। সুনীল গুপ্ত (হিতকারিণী হাই স্কুল)
৩। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (চিলকিগড় হাই স্কুল)
সময়—১১ সেকেণ্ড

(খ) ৪৪০ গজ দৌড়—১। আবু তাহের জান (মেদিনীপুর কলিজিয়েট)
২। সুনীল গুপ্ত (হিতকারিণী হাই স্কুল)
৩। ভূধর মণ্ডল (ঝাড়গ্রাম হাই স্কুল)
সময়—১ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ড

(গ) ১১০ গজ হার্ড্‌ল রেস—১। ভবেশ মাল (বসন্তিয়া হাই স্কুল)
২। বঙ্কিম মুর্মু (ঝাড়গ্রাম হাই স্কুল)
৩। রাধারমণ ধর (গড়বেতা হাই স্কুল)

(ঘ) হাই জাম্প—১। সুধীর বসু (মেদিনীপুর কলিজিয়েট) (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি)
২। ভোলানাথ পাল (হোমগড় হাই স্কুল) (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি)

(ঙ) লঙ্ক জাম্প—১। বঙ্কিম মুর্মু (ঝাড়গ্রাম হাই স্কুল) (১৮ ফুট ৮½ ইঞ্চি)
২। ওসমান আলি (ভগবানপুর হাই স্কুল) (১৮ ফুট ৫½ ইঞ্চি)

(চ) ১ মাইল সাইকেল রেস—১। রঞ্জিত সিংহ (মেদিনীপুর কলিজিয়েট)
২। বীরেন সৎপতি (চিলকিগড় হাই স্কুল)
৩। নাসিরুদ্দিন (মেদিনীপুর কলিজিয়েট)
সময়—৩ মিনিট ৮½ সেকেণ্ড

(ছ) ৬ মাইল ভ্রমণ—১। নসরত আলি খাঁ (মেদিনীপুর টাউন স্কুল)
২। সিতাংশু গুপ্ত (মেদিনীপুর কলিজিয়েট)
৩। গোষ্ঠবিহারী ধাড়া (সোনাখালি হাই স্কুল)

(জ) পোল ভল্ট—১। আবদুল মান্নান (মেদিনীপুর কলিজিয়েট) (৮ ফুট ৯ ইঞ্চি)
২। বঙ্কিম মুর্মু (ঝাড়গ্রাম হাই স্কুল) (৮ ফুট ৭ ইঞ্চি)
৩। শ্যামাপদ জানা (কাঁথি মডেল স্কুল) (৮ ফুট ৫ ইঞ্চি)

(ঝ) রিলে রেস—মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের দল

ইণ্টারমিডিয়েট ছাত্রদের জন্য

(ক) ৮৫ গজ দৌড়—১। কানাইলাল ঘোষ (হিতকারিণী)
২। অরবিন্দ বসু (টাউন স্কুল)
৩। বাদল ঘোষ (গড়বেতা)
সময়—৯½ সেকেণ্ড

(খ) ২৭৫ গজ দৌড়—১। কানাইলাল ঘোষ (হিতকারিণী)
২। অরবিন্দ বসু (টাউন স্কুল)
৩। সতীশ ম্যাজি (মহিষাদল)
সময়—৩৩ সেকেণ্ড

(গ) হাই জাম্প—১। পরমানন্দ মুর্মু (ভীমপুর) (৫ ফুট ৩ ইঞ্চি)
২। কানাইলাল ঘোষ (হিতকারিণী) (৫ ফুট ২ ইঞ্চি)
৩। সুনীল পাত্র (ঐ) (৪ ফুট ১১ ইঞ্চি)

(ঘ) লঙ্ক জাম্প—১। পরমানন্দ মুর্মু (ভীমপুর) (১৬ ফুট ১০ ইঞ্চি)
২। কুঞ্জবিহারী বেরা (চিলকিগড়) (১৬ ফুট ৫ ইঞ্চি)
৩। অনিল মহাপাত্র (কলিজিয়েট) (১৬ ফুট)

(ঙ) অন্ধ ক'ষে দৌড়—১। অরুণ দত্ত (তমলুক হ্যামিল্টন)
২। রামকৃষ্ণ পরামাণিক (ঐ)
৩। নগেন্দ্র সিংহ (ঝাড়গ্রাম)

(চ) বাধা পেয়ে দৌড়—১। কানাইলাল ঘোষ (হিতকারিণী)
(Obstacle Race) ২। আবদুল সত্তর (কলিজিয়েট)
৩। সতীশ মাজি (মহিষাদল)

(ছ) থ্রী লেগেড রেস—১। সুনীল পাত্রের দল (হিতকারিণী)
২। হরেকৃষ্ণ সামন্তের দল

(জ) রিলে রেস—কাঁথি হাই স্কুলের দল

জুনিয়ার ছাত্রদের জন্য

(ক) ৬০ গজ দৌড়—১। জগবন্ধু হেম্‌ম (ভীমপুর)
২। অনিল দত্ত (তমলুক হ্যামিল্টন)

(খ) ১২০ গজ দৌড়—১। নীরেন্দ্র সিংহ (শালবনি হাই স্কুল)
২। জগবন্ধু হেম্‌ম (ভীমপুর)
৩। অনিল দত্ত (তমলুক হ্যামিল্টন)

(গ) আলু তুলে দৌড়—১। নীরেন্দ্র সিংহ (শালবনি হাই স্কুল
২। অনিল দত্ত (তমলুক হ্যামিল্টন)
৩। মেঘনাথ গারু (পার্ব্বতীপুর পতিতপাবনী হাই স্কুল)

(ঘ) থ্রী লেগেড রেস—১। অনিল দত্তের দল (কলিজিয়েট)
২। শচীন্দ্র রায়ের দল (ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাই স্কুল)

(ঙ) চোখ বেঁধে দৌড়—১। ভৈরব রায় (তমলুক হ্যামিল্টন)
২। তুষার রায় (ঝাড়গ্রাম)
৩। কল্লোল সিং (কাঁথি হাই স্কুল)

সিনিয়র ও ইণ্টারমিডিয়েট ছাত্রদের প্রতিযোগিতায় মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুল ও খড়গপুর হিতকারিণী হাই স্কুলের ছাত্রগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় কলিজিয়েট স্কুল—"বি. আর. সেন চ্যাম্পিয়ানশিপ কাপ" ও হিতকারিণী স্কুল—"প্যারীলাল দত্ত কাপ" পেয়েছেন।

এবারের আয়োজনে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। সেটি দর্শকের সুন্দর ব্যবহার। তাঁরা কখনও মাঠে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন নি, পুরস্কার বিতরণের সময়েও ভিড় ক'রে গোলমাল করেন নি। এইটাই যেন ভবিষ্যতের আদর্শ হয়। খেলার মাঠে আনন্দ পেতে আসা যেন দূষিত আবহাওয়ায় কলুষিত হয়ে না ওঠে।

প্রদর্শনী

মাঘ ও ফাল্গুন মাসে মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রদর্শনীগুলি পল্লীজীবনে বৈচিত্র্য আনে, আনন্দহীন পল্লীবাসীর প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করে। পল্লীবাসী এগুলি দেখে দেশের সম্পদের পরিচয় পায়, কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য শিখতে পারে। প্রদর্শনী যে কয়দিন অনুষ্ঠিত

হয়, সে কয়দিন পল্লীবাসী প্রদর্শনীক্ষেত্র ছাড়ে না। 'পল্লী-শ্রী'র বর্ত্তমান সংখ্যায়, ১৫ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত-প্রদর্শনীর-বিবরণ প্রকাশিত হ'ল।

গড়বেতা কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

সদর (উত্তর) মহকুমার এলাকায় গড়বেতা গ্রামে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়—১৪ই মাঘ। গড়বেতা হাই-স্কুলের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ও ঘরগুলিতে এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগ দেখানো হয়েছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন—মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কে. সি. বসাক, আই. সি. এস.।

প্রদর্শনীতে যে সব জিনিস দেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

স্বাস্থ্য-বিভাগের চিত্র ও model; কৃষি-বিভাগের দ্রব্যাদি; বিষ্ণুপুরের রেশম-বয়ন; শালবনির ভ্রাম্যমান-বয়ন-বিদ্যালয়ের দ্রব্যাদি; আনন্দপুরের বস্ত্রাদি; আমলাগুড়া, কাঁকড়াশোল, গড়বেতা ও গোয়ালতোড়ের তাঁতের জিনিস; ফুলবেড়িয়ার জার্মান সিলভারের বাসন; বিষ্ণুপুরের হাতীর দাঁতের কাজ ও বাদ্যযন্ত্র এবং কেয়াবনীর কম্বল।

স্বাস্থ্য-বিভাগের স্টলটি সব রকমে শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রত্যেক খুঁটিনাটি চিত্র ও modelএর সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসারের নেতৃত্বে ১৬ মাঘ তারিখে, শিশুমঙ্গল-উৎসবের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ের বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন। কৃষিতত্ত্ববিদ্ ডাঃ যামিনীরঞ্জন মজুমদার ও বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগদীশ গোস্বামীর ম্যাজিকলণ্ঠন যোগে বক্তৃতা জনসাধারণকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

সাধারণকে কৃষি স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষ তাদের আমোদেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। স্থানীয় যাত্রার দল দু রাত্রি পল্লীবাসীকে আনন্দ দিয়েছে; তা ছাড়া টকি-বায়োস্কোপেরও ব্যবস্থা ছিল।

প্রদর্শনীর সঙ্গে স্কুলের ছেলেদের স্পোর্টসও সকলে উপভোগ করেছেন।

১৭ই মাঘ, পুরস্কার-বিতরণ-উৎসবের পর প্রদর্শনী শেষ হয়।

(খ) গোপীবল্লভপুর প্রদর্শনী

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় গোপীবল্লভপুর বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কিছুকাল পরে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গোপীবল্লভপুরকে কেন্দ্র ক'রে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ পশ্চিম-বঙ্গ ও উড়িষ্যায় শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। একদিন এই গোপীবল্লভপুর বৈষ্ণবকবি রাধানন্দ ও গোপীজনবল্লভের কাব্য-কূজনে এবং তুলসী ও রামাইনন্দনের পবিত্র কীর্ত্তনে মুখরিত ছিল; গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য—বলদেব ও আস্তিক্য দর্শনকার বিশ্বম্ভরানন্দের পাণ্ডিত্যে উদ্ভাসিত ছিল। সুবর্ণ-রেখা-বিধৌত, তাল-তমাল-খর্জ্জুর-বনশোভিত, মহাত্মার পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত গোপীবল্লভপুর এখনও ভক্তিরাজ্যে "গুপ্ত বৃন্দাবন" নামে পরিচিত আছে।

গত ২২এ মাঘ, এই গোপীবল্লভপুরে কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট রায় সাহেব দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন। প্রদর্শনীতে কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দেখানো হয়। জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য-বিভাগ বহুবিধ 'চার্ট' ও 'মডেলের' সাহায্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণকে উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে আবৃত্তি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ক রচনা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠানটি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের নয়াগ্রাম এস্টেটের ম্যানেজার সৈয়দ মহীউদ্দীন আহম্মদ এবং মহান্ত গোবিন্দগোপালানন্দদেব গোস্বামী, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ যড়ঙ্গী প্রভৃতির চেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

(গ) বালিচক কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

সদর (উত্তর) মহকুমায় বালিচক গ্রামে কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়—৭ই ফাল্গুন। মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট—মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বালিচক ভজহরি ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রাঙ্গণে ও স্কুলগৃহে প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থা হয়েছিল।

প্রদর্শনীতে গভর্মেণ্টের কৃষি ও শিল্প বিভাগ এবং জেলা-বোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগ যোগ দিয়েছিলেন। এ ছাড়া রেশম বয়ন, তাঁতের কাজ, মাদুর বোনা, দাঁতনের ছাতা, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি দ্রব্য, মহিলাগণের সূচীশিল্প, ছেলেদের হাতের কাজ, গৃহপালিত উৎকৃষ্ট ষাঁড় ও মুর্গী ইত্যাদি অনেক জিনিস দেখানো হয়েছিল। শ্রীযুক্ত কিশোরীরঞ্জন নন্দী ও শ্রীধরচন্দ্র নন্দীর ফুলগাছের 'স্টল'টি প্রদর্শনীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছিল। বঙ্গীয় সোশ্যাল সার্ভিস লীগ, অন্ধতা-নিবারণী-সমিতি ও সমবায়-প্রতিষ্ঠান ম্যাজিক-লণ্ঠনযোগে বক্তৃতা করেছিলেন। প্রদর্শনীক্ষেত্রে যাত্রাগান, কৌতুকাভিনয়, ব্যায়াম-প্রদর্শন ও পুতুলনাচের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

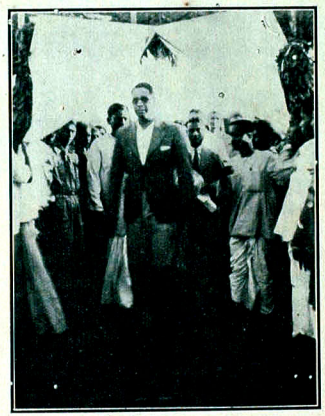

মিঃ বি. আর. সেন বালিচক-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে যাইতেছেন

পিলার সার্কল অফিসার শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী কর ও পান্নালাল শাসমল এই অনুষ্ঠানকে সফল ক'রে তুলতে বিশেষ পরিশ্রম করেছেন।

(ঘ) টুঙ্গুর কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

সদর (দক্ষিণ) মহকুমায় টুঙ্গুর গ্রামে এবার কৃষি-

শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৫ই ফাল্গুন, মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট—মিঃ আর. এস. ত্রিবেদী, আই. সি. এস. এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিভাগের স্টলটিতে সাধারণকে অনেক নূতন তথ্য শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ ছাড়া তাঁতের কাজ, মাদুর বোনা, রেশম বয়ন, ছাতা ছুরি কাঁচি নির্ম্মাণ, আলতা ও মিছরি তৈরি কর্ম্ম ইত্যাদি অনেকগুলি কুটীরশিল্প দেখানো হয়েছিল। প্রদর্শনীতে যাত্রাগান কৌতুকাভিনয় ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। বঙ্গীয় সোশ্যাল সার্ভিস লীগ এবং সমবায়-প্রতিষ্ঠান ম্যাঞ্চিক লণ্ঠনযোগে বক্তৃতা করেছিলেন।

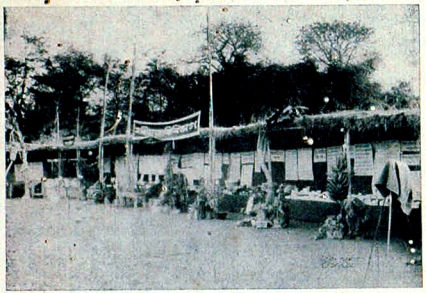

বালিচক প্রদর্শনীর একাংশ

কাগজশিল্পে বাঁশের স্থান

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে কাগজের প্রয়োজন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষেও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। লেখা এবং ছাপার জন্য ভারতবর্ষে যত কাগজের প্রয়োজন হয় উহার অধিকাংশই আমদানী হয় বিদেশ হইতে। ভারতবর্ষে ব্যবহৃত সমস্ত কাগজ ভারতবর্ষেই প্রস্তুত করা সম্ভব কি না এবং উহার উপাদানগুলি ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে কি না এটি ভারতবাসীর পক্ষে একটি প্রধান সমস্যা।

কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতা মিউজিয়মে বোটানিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার শিল্পবিভাগের উদ্যোগে কাগজশিল্পের এক প্রদর্শনী হইয়াছিল। ভারতবর্ষে হাতে এবং কলে যত বিভিন্ন প্রকারের কাগজ প্রস্তুত হয় তাহার নমুনা এবং যে সকল উপাদান হইতে ঐগুলি প্রস্তুত হয়, সে সকল উপাদান প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত যে সকল প্রক্রিয়ার দ্বারা কাঁচা মাল কাগজে রূপান্তরিত হয়, প্রদর্শনীতে তাহাও দেখানো হইয়াছিল। উহা হইতে আলোচ্য সমস্যা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার কাগজ প্রস্তুতের উদ্ভিজ্জ উপাদানের

মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়া, সবই ঘাস, খড়, কাঠ, কাঠের মণ্ড, বাঁশ, পুরানো দড়ি, পাটের তন্তু, শনের তন্তু, পাতা, গাছের বাকলের তন্তু, ছেঁড়া কাগজ, মোটা ঘাস এবং অকেজো পাটের থলে—এইগুলি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া তুলা, তুলাজাত কাপড়, রেশম এগুলিও কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। তুলা, তুলাজাত কাপড় এবং রেশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুতের জন্য আবশ্যক হয়; পশম ব্লটিং কাগজ তৈয়ার করিতে লাগে।

কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী ঘাস ভারতবর্ষে খুব কমই জন্মে। ভারতীয় ঘাসের মধ্যে যে সকল ঘাস হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার মধ্যে দুই শ্রেণীর ঘাস প্রধান—ভাবর (উহার আর এক নাম সবই) এবং মুঞ্জ। হিমালয় পর্ব্বতের ক্রমাবনত পার্শ্বদেশে, নেপালে, বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং মধ্যভারতে এই ঘাস জন্মে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ এবং মাদ্রাজেও এই ঘাস দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ খড়ে যত তন্তু আছে সবই ঘাসে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি তন্তু আছে। সুতরাং খড় অপেক্ষা সবই ঘাসের তন্তুতে বেশি কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ভারতবর্ষে ছাপার জন্য যে সকল কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহা সবই ঘাস হইতে প্রস্তুত। লিখিবার কাগজের অধিকাংশও সবই ঘাস হইতে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের কাগজের কলগুলিতে বিদেশ হইতে আমদানী কাগজের মণ্ডের সহিত এই ঘাস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। কাগজের উপাদানের মধ্যে বিদেশী এস্‌প্যারেটো ঘাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সবই ঘাসের স্থান এস্‌প্যারেটোর নীচেই।

মুঞ্জ ঘাস ৮ হাত দীর্ঘ হয়। উত্তর ভারতের বহু স্থানে, বিশেষত পাঞ্জাবে, বহু বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইহা জন্মে। দৃঢ়তা, স্থিতিস্থাপকতা এবং জলীয় বাষ্প প্রতিরোধক্ষমতার জন্য দড়ি, নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাদুর, চুবড়ি এবং কাগজ প্রস্তুতের জন্য উহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের কাগজের কলগুলিতে মুঞ্জ এবং অনুরূপ শ্রেণীর ঘাসও বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই ঘাস অধিক পরিমাণে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ করা যায় না। ইহার ব্যবহারের প্রধান বাধা হইল উহাই।

আজকাল কাগজ প্রস্তুতের জন্য কাঠের মণ্ড বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কাঠ যদি খুব নরম না হয়, উহাতে যদি কোন রং কিম্বা বেশি গাঁট থাকে তবে উহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে ঐ সকল দোষ হইতে মুক্ত কাঠ পাওয়া কঠিন।

হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে সমুদ্রতল হইতে ৭,০০০ হইতে ১১,০০০ ফিট উর্দ্ধে কচাল এবং ওয়াসা (Himalayan Spruce) নামে ছোট ছোট এক রকম গাছ জন্মে। ঐ গাছের কাঠ কাগজ প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী। হিমালয় পর্ব্বতে ৬,০০০ হইতে ১২,৫০০ ফিট উর্দ্ধে চিল (অথবা চিড়) নামে এক শ্রেণীর পঞ্চপত্র দেবদারুগাছ জন্মে। কাগজ প্রস্তুতের জন্য ঐ গাছের কাঠও উপযোগী। সিন্ধুনদ হইতে ভোটান পর্য্যন্ত হিমালয় পর্ব্বতের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ক্রমাবনত পার্শ্বদেশে ১,৫০০ হইতে ৭,০০০ ফিট উর্দ্ধে, কাশ্মীরে, সিমলায়, কুমায়ুনে, গাড়ওয়ালে, নাইনিতালে এবং রাণীখিতে সল্লা (অথবা ধূপ) নামে আর এক শ্রেণীর ত্রিপত্র দেবদারুগাছ দেখা যায়। ঐ গাছের কাঠ হইতেও কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

আজকাল কাগজ প্রস্তুতের জন্য বাঁশও বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ডেরাডুনে বন-বিভাগের গবেষণাগারে এ সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা হইয়াছে। উহাতে প্রমাণ হইয়াছে, ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন কয়েক শ্রেণীর বাঁশও কাগজ-মণ্ড প্রস্তুতের উপযোগী। ঐ সকল শ্রেণীর বাঁশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উহা হইতে মোটামুটি ভাল কাগজই প্রস্তুত হইতে পারে। বঙ্গদেশ ও আসামের বহুবিস্তৃত বনগুলি হইতে আহরণ করিয়া কাগজের কলওয়ালারা ঐ সকল বাঁশ ব্যবহার করিতেছে।

ভারতবর্ষে উদ্ভিজ্জ তন্তু হইতে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ স্বল্প নহে এবং তন্তুবিশিষ্ট গাছের সংখ্যাও উপেক্ষণীয় নহে। যে জাতীয় তন্তু দড়ি প্রস্তুতের উপযোগী, কাগজ প্রস্তুতের জন্যও সেই জাতীয় তন্তুর অধিকাংশই উপযোগী। উহার মধ্যে পাটের তন্তু সর্ব্বপ্রধান। বঙ্গদেশে পাট প্রচুর জন্মিলেও অন্য প্রয়োজনে উহা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং কাগজের

কলওয়ালারা অন্য প্রয়োজনের অনুপযোগী পরিত্যক্ত পাট ব্যতীত উৎকৃষ্ট পাট ক্রয় করিতে পারে না।

পাট ব্যতীত শণ, রীয়া প্রভৃতির তন্তু হইতেও কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। খসখসের চারা গাছের মূলের তন্তু এবং হাতী ঘাসের (Typha Elephantica) তন্তুও কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

নেপালে নেপাল কাগজের গাছ নামে এক শ্রেণীর গাছ জন্মে। উহার বাকল হইতে নেপালীরা কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ কাগজ নেপালী কাগজ নামে পরিচিত।

নেপাল হইতে সিকিম পর্য্যন্ত হিমালয় পর্ব্বতে, ভোটানে এবং মণিপুরে কাঘুটি নামে এক রকম গাছ দেখা যায়। উহা হইতেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নেপালী কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রথম কাগজ প্রস্তুত হয় বলিয়া জনপ্রবাদ। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে যে কাগজ প্রস্তুত হইত, তাহার প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়। কাগজশিল্প কাশ্মীরে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। কাশ্মীর হইতে নাকি ক্রমশঃ উহা অন্যান্য প্রদেশে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

—'ভাণ্ডার'

সম্পাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম
মেদিনীপুর জেলা-পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৪।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পল্লী-শ্রী

১ম বর্ষ] চৈত্র, ১৩৪৫ [১১শ সংখ্যা

শিশুই মানবের জনক

মহামান্যা লেডি রীড

প্রথমেই ব'লে রাখি যে, শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব'লে আমার কোন দাবি নেই। এ বিষয়ে আমার যা বলবার, তা হচ্ছে এই, নিজের সন্তানদের মানুষ করার সুবিধে হবে ব'লে এ নিয়ে আমাকে কিছু চর্চ্চা করতে হয়েছিল। যা কিছু আমি শিখতে পেরেছিলুম, তার জন্যে আমার দু জায়গায় ঋণ স্বীকার করবার আছে। প্রথম হচ্ছে—মাতাপিতার জাতীয়-শিক্ষা-সম্মেলন—Parents National Educational Union; সভ্যা হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে যে উপকার আমি পেয়েছি, তা অমূল্য। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—ঐ সমিতির এবং মাতাপিতা-সমিতির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী পরলোকগতা মিস শার্লোতের লেখা অমূল্য বইগুলি।

মহামান্যা লেডি রীড

অন্যান্য মেয়েদের কিছু সাহায্য যদি আমি করতে পারি, এই উদ্দেশ্যেই বেতারে আমার এই বক্তৃতা দেওয়া। আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, বোঝবার ক্ষমতাটা শিশুদের মধ্যে খুবই প্রবল—অর্থাৎ আসলে তারা অবুঝ নয়। তা ছাড়া সুবিচারের ক্ষমতাও তাদের বেশ প্রবল। আমার মত হচ্ছে—যে ছেলে সত্যিকার সুখী, সেই সত্যিকার ভাল ছেলে। যে সব ছেলেকে বদ ছেলে বলা হয়, তারা ঐ রকম বদ হবার কারণ এই জন্য, তাদের সম্বন্ধে সুবিচার করা হয় নি—তাদের ভাল ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করা হয় নি।

আপনারা হয়তো জানতে চাইবেন, কোন্ বয়সের ছেলেদের সম্বন্ধে আমি বলছি। এ বিষয়ে আমি বলি যে, অতি শিশু সম্বন্ধেও আমার ঐ একই কথা। দুধের ছেলেও যখন কান্নাকাটি বা বায়না ক'রে তার মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, বুঝতে হবে, তখন থেকেই তার ভেতর একটা বদ অভ্যেস গ'ড়ে উঠছে,—যে বদ অভ্যেসটা ছাড়ানো পরে খুবই শক্ত হয়ে উঠবে। ইস্কুলে যায় এমন ছেলে যখন ক্রমাগত উৎপাত ক'রে শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সহপাঠীদের কাছ থেকে তাদের ভয়-মিশ্রিত সম্ভ্রম আদায় করে—তখন বুঝতে হবে যে,

সে সাধারণের লক্ষ্যের বস্তু হয়ে ওঠার বিপজ্জনক প্রলোভনের বশীভূত হয়ে পড়ছে—এবং সেই জিনিসটা পরে তাকে নিয়ে অনেক অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে পারে। তাড়ন পীড়ন না ক'রে বদ অভ্যেস ভাঙা যায় না বটে, কিন্তু বিনা তাড়নেও বদ অভ্যেসের উল্টো একটা সৎ অভ্যেস বেশ সহজেই ধরানো চলে। অভ্যেস জিনিসটা আমাদের কতখানি উপকার যে করতে পারে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকলে কত সুবিধে হয়! অভ্যেসের ফলে সব জিনিসই সহজ হয়ে আসে। তবে ঐ অভ্যেসই খারাপ দিকে গেলে মানুষের ভীষণ শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই এটা আমাদের নিজেদের দেখা উচিত, অভ্যেস যেন আমাদের অনুগত ভৃত্য হয়েই দাঁড়ায়, অত্যাচারী প্রভু হয়ে না ওঠে। অভ্যেস জিনিসটার ওপর আমি খুব বেশি জোর দিচ্ছি বটে, কিন্তু এখানে আমি আপনাদের একটা বিষয়ে সাবধান ক'রে দিতে চাই। সেটা এই যে, যদিও অভ্যেস ভাল জিনিস, তা হ'লেও অভ্যেস যেন তার কঠোর বন্ধনে সব দিক দিয়ে আমাদের একেবারে বেঁধে না ফেলে। আমাদের জীবন যদি একেবারে কতকগুলি অভ্যেসেরই সমষ্টি মাত্র হয়ে দাঁড়ায়, তা হ'লে আমাদের প্রেরণা-শক্তি জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবার ভয় আছে। এ বিষয়ে মিস ম্যাসন (Miss Masson) একটি বড় ভাল কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত প্রেরণার উন্মেষের অভ্যেসের চেয়ে বেশি উপকারী কোন অভ্যেস আর মানুষের নেই।

কাজেই ছেলেমেয়েদের দেহ ও মনের বৃদ্ধি ও প্রসারের জন্যে প্রচুর পারিপার্শ্বিক অবকাশ এবং স্বাধীনতার সুযোগ থাকা দরকার। এতে তাদের ক্ষিপ্রকারিতা এবং আধিপত্যের ক্ষমতার বিকাশ সাধনেরও সুবিধে হবে। এক কথায় শিশুর দেহ, মন ও চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ থাকা চাই। শিশুরা সর্ব্বদাই সব দিক দিয়ে বড় হবার চেষ্টা নিজেরাই করবে—এ রকম ক্ষেত্রে অনেক ছেলেকে প্রতি পদে খুব বেশি সাহায্যের যোগান এগিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের চেষ্টা বিকশিত হবার পথে যথেষ্ট বাধা দেওয়া হয়। প্রকৃতি দেবী স্বয়ং চান যে, তারা নিজেরা বাড়ুক—এখানে আমাদের দায়িত্ব শুধু এইটুকু দেখা যে, তাদের সে বৃদ্ধির চেষ্টা যেন সুপথে চালিত হয়। মা-বাপই শিশুর স্বাভাবিক অভিভাবক—তাই এ সব কথা আমি তাঁদেরই বলছি। আলাদা আলাদা প্রত্যেকটি পরিবারের সমষ্টিই হচ্ছে জাতি—সুতরাং জাতির প্রতি প্রত্যেক মাতাপিতারই একটি দায়িত্ব আছে। নিজেদের পরিবারের মধ্যে সুনীতিশিক্ষার প্রবর্ত্তন করা তাঁদের কর্ত্তব্য। নিজেদের বাড়িতে যে নীতিশিক্ষা ছেলেরা পাবে, ভবিষ্যতে জাতীয় কল্যাণের মহত্তর ক্ষেত্রে সেই শিক্ষাই একদিন কাজে লাগবে।

যে ছেলে মাতাপিতাকে মেনে চলতে শেখে নি, সে বড় হয়ে দেশের আইন-কানুনও সহজে মানতে পারবে না।

যে ছেলে বাপ-মায়ের সেবা ক'রে তাঁদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন ক'রে আনন্দ পেতে শেখে নি, বড় হয়ে প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করা তার পক্ষে সহজ হবে না।

"বয়স্ক মানুষটিকে তুমি যেমন দেখতে চাও, শিশুকে ঠিক সেই ভাবে গড়বার মতন শিক্ষা দাও"—এই নীতিটি সকলের মনে রাখা উচিত। মাতাপিতা-সমিতির শিক্ষালয়ে যে নীতিটি মেনে চলা হয়, তা এই—আমি হচ্ছি এই; আমার এই করা উচিত; আমি এই করতে পারি; আমি এই করব; আমি এই হব। ছেলেদের মানুষ করার পথে প্রথম যে কথাটি আমাদের ভেবে দেখতে হবে, তা এই, প্রত্যেক শিশুই হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট এক একটি সম্পূর্ণ মানুষ। তাদের নিজেদের যে অধিকার এবং সুযোগের দাবি আছে, সে দাবিকে আমাদের সম্মান করতে হবে।

আমার এই করা উচিতঃ—এ সম্বন্ধে মাতা-পিতারা নিজেদের জীবন থেকে ছেলেদের কর্ত্তব্যবোধ শিক্ষা দিতে পারেন। নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আইনগুলি ভঙ্গ করতে পরাঙ্মুখ মাতাপিতার দ্বারা পরিচালিত সন্তানরা সহজেই মাতাপিতার দৃষ্টান্তে বাধ্য হ'য়ে থাকাটাকে গৌরবের জিনিস মনে ক'রেই বাধ্য হতে চেষ্টা করবে।

আমি এই পারিঃ—স্বভাবতই ছেলেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস প্রবল। ভাল কাজ করার ব্যাপারে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সেই চেতনা যাতে বৃদ্ধি পায়, তার উপযুক্ত স্বাধীনতা তাদের দেওয়া আমাদের উচিত। কারণ আত্মবিশ্বাস না থাকলে মানুষের দ্বারা বিশেষ কিছু হতে পারে না।

আমি এই করবঃ—পরিশেষে উচিত কাজ করার উপযুক্ত ইচ্ছার কথা আসে। ইচ্ছা জিনিসটা যদি ঠিক পথে এসে দাঁড়ায়, তা হ'লে সব জিনিসই সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। সুদৃঢ় বিচার শক্তি, সংযত ইচ্ছা, সহনশীলতা, দূরদর্শিতা, কর্ম্মশক্তি এবং কর্ম্মসাধনের নৈপুণ্য এই কয়টি জিনিসের সাহায্যেই ছেলেরা গ'ড়ে ওঠে।

মাতাপিতা হিসেবে আমাদের এইটা মনে রাখা উচিত যে, আমাদের নিজেদের জীবনে এমন কিছুই থাকা উচিত নয়, যা আপত্তিকর এবং ছেলেদের উন্নতির পথে বাধা-স্বরূপ। কারণ এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই, যে সব ছেলে বিজ্ঞ এবং সাধারণজ্ঞানসম্পন্ন মাতাপিতার হাতে মানুষ হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে তারা মাতাপিতার জীবনের আনন্দস্বরূপ হয়ে ওঠে। অপর পক্ষের উল্টো ব্যাপারটাও ঠিক, অনুরূপই সত্য। যে সব মাতাপিতা ছেলেদের বুঝে দেখে তাদের ঠিক পথে চালিত করবার উপযুক্ত কষ্টটুকু স্বীকার করেন নি, দুঃখ তাঁদের পরে পেতেই হবে, যখন তাঁদের ছেলেরা তাঁদেরই উপ্ত বিষবৃক্ষের ফল আহরণ করবে।

তাই জাতীয় কল্যাণের দিকে চেয়ে আমাদের নিজেদের জন্যে—আমাদের সন্তানদের কল্যাণে আমরা যেন এমন ভাবে কাজ করি, যাতে এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের জীবনের সুনীতিগুলি অর্জ্জন করতে পারে।

মেদিনীপুর জেলায় পল্লী-উন্নয়ন

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম

বাংলায় গ্রামের সংখ্যা ৮৮০০০, কিন্তু শহর মাত্র ১২৫টি। সারা বাংলায় পাঁচ কোটি লোকের বাস, তার ভিতর শহরে থাকেন শতকরা ৬ জন—বাকি শতকরা ৯৪ জন গ্রামেই বাস করেন। শহরে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনেক রকম ব্যবস্থা আছে; কিন্তু গ্রামে অসুবিধার অন্ত নেই। অথচ এই পল্লীবাসী রৌদ্র-বৃষ্টি তুচ্ছ ক'রে যে ফসল উৎপন্ন করছে, তাতেই শহরের লোক জীবনধারণ ক'রে রয়েছে।

গত ত্রিশ চল্লিশ বছরে শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় গ্রাম ছেড়ে শহরে বাস করায় আজ বাংলার পল্লী জ্ঞান-সম্পদ-হীন হয়ে পড়েছে। রোগে, শোকে, অশান্তিতে পল্লীবাসীর জীবন-ছবিষহ। পানীয় জলের অভাব, চলাচলের পথ নেই—যাও আছে বর্ষায় সেখানে চলা যায় না। বেশি বৃষ্টি হ'লে জল-নিকাশের ব্যবস্থা নেই। জঙ্গলে জঙ্গলে সারা পল্লী আচ্ছন্ন। নিরুপায় পল্লীবাসী লোক্যাল বোর্ডে, জেলা বোর্ডে প্রতিকার প্রার্থনা করে, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী ক্ষতের প্রতিকার করা বোর্ডের সাধ্য নয়, সুতরাং সেখানে বিশেষ কোন ফল না পেয়ে গভর্মেণ্টের উপর দোষ চাপিয়ে তারা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। শেষে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দলে দলে মরতে সুরু করে—গ্রামকে গ্রাম শ্মশান হয়ে যায়। আজ যে সমস্যা সবচেয়ে বড় হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে, সেটি এই যে, কেমন ক'রে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন, অজ্ঞানান্ধ জনসাধারণের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ফিরিয়ে আনা যায়, কেমন ক'রে পল্লীর নষ্ট স্বাস্থ্য, লুপ্ত শ্রীর পুনরুদ্ধার করা যায়।

বর্দ্ধমান বিভাগে মেদিনীপুর জেলার আয়তন সবচেয়ে বড়। সারা বাংলায় ময়মনসিং ছাড়া এত বড় জেলা নেই। সুদূর অতীতে এ জেলার তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে অর্ণবপোত চীন, জাভা ও অন্যান্য দেশে এ দেশের সম্পদ ছড়িয়ে দিয়েছে। এ জেলার রেশম ও তসরের খ্যাতি ভারতের বাইরেও পৌঁছেছিল এবং এই সকল কাপড় সংগ্রহ করবার জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জেলার বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলি কুঠি তৈরি করেছিলেন। এখন এই শিল্প মৃতপ্রায়। এখন বিরল পল্লীতে পূর্ব্বগৌরবের চিহ্ন অতীতের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। এ জেলায় প্রসিদ্ধ

গ্রাম—ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, ময়নাগড়, প্লাজুরী, লোয়াদা—এখন অতীত-গৌরবের শ্মশানভূমি।

সৌভাগ্যের বিষয়, এ জেলার শাসনভার এখন যাঁর হাতে রয়েছে, তিনি একে বাঁচিয়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। বর্ত্তমান জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট—মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. জেলার-কার্য্যভার নেন ১৯৩৭ সালের মে মাসে। তারপর পাঁচ মাস অক্লান্তভাবে জেলার সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে গ্রামের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই ভাবে গ্রাম পরিদর্শন করবার পর তিনি পল্লী-উন্নয়নের এক পরিকল্পনা তৈরি ক'রে জেলার বিশিষ্ট অধিবাসীদের একটি সভায় আহ্বান করেন। ১৯৩৭ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে এই সভা হয় এবং সেখানে পল্লী-উন্নয়নের পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়। এর পরেই আসে পূজার অবকাশ।

পূজার ছুটির পর নূতন উদ্যমে কাজ সুরু করা হয়। প্রথমেই জেলার ছয়টি মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি স্থাপিত হয় এবং এই সকল মহকুমা-সমিতির অধীনে নির্ব্বাচিত গ্রামে পল্লী-মঙ্গল-সমিতি গ'ড়ে তোলা হয়। মহকুমা ও গ্রাম্য সমিতিকে পরামর্শ দিয়ে পল্লী-উন্নয়নের কাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য জেলা-সমিতি গঠিত হয়।

পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য—পল্লীবাসীর অন্তরে নিজেদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা। পল্লীবাসী যাতে নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারে, যাতে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করতে পারে—সেই চেতনা তাদের অন্তরে জাগিয়ে দেওয়াই এই পরিকল্পনার মূলনীতি। মানুষ নিজের ভাগ্য, নিজের আর্থিক অবস্থা, নিজের স্বাস্থ্য নিজেই গ'ড়ে তুলতে পারে, সে কেন অপরের মুখ চেয়ে থাকবে? গ্রামে গ্রামে সমিতি গড়বার আগে এই কথাটি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এই পরিকল্পনায় পল্লীর সবগুলি সমস্যার একত্র সমাধানের কথা আছে। পল্লীর সমস্যাগুলি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে ধরা চলে না। স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে কৃষির উন্নতি জড়িত, কৃষির উন্নতির সঙ্গে পথ-ঘাটের উন্নতির সম্বন্ধ রয়েছে, পথ-ঘাটের ও কৃষির উন্নতিতে অর্থাগম; অর্থাগম হ'লে স্বচ্ছন্দভাবে জীবন কাটাতে পারা যায়, ছেলেপুলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা যায়। আবার, স্বাস্থ্য ভাল থাকতে হ'লে গ্রামের অনাবশ্যক ঝোপ-ঝাড় কাটিয়ে আলো-বাতাসের পথ মুক্ত ক'রে দিতে হয়; আবর্জ্জনা দূর ক'রে, ছোট ছোট খানা-ডোবা ভরাট ক'রে মশা জন্মাবার পথ বন্ধ করতে হয়; বর্ষার জল যাতে জমতে না পারে, তার জন্য ড্রেন কাটতে হয়; খোলা হাওয়ায় খেলাধূলা ক'রে প্রাণে স্ফূর্ত্তি ও শরীরকে সবল রাখতে হয়। এ সমস্ত কাজ পল্লীবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে নিজের হাতেই করতে পারেন। আনন্দের বিষয়, এখন মেদিনীপুর জেলায় একশোর উপর পল্লী-মঙ্গল-সমিতি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের পল্লী-উন্নয়ন-পরিকল্পনাকে অনুসরণ ক'রে পল্লীর সেবায় মন দিয়েছে। এদের প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মতালিকা আছে, খাপছাড়াভাবে কোন কাজই করা হয় না।

পল্লী-সমিতিগুলির চেষ্টায় বহু গ্রামপথের সংস্কার হয়েছে, অনেকগুলি নূতন পথও তৈরি হয়েছে। পথ তৈরি করার সময় পথের ধারে ড্রেন কেটে জল যাবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, আবশ্যকমত কাল্‌ভার্টও করা হয়েছে। কয়েকটি সমিতি পথের ধারে বাঁশের আগড় দিয়ে পথের উপর দিয়ে গাড়ি যাবার ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছে। পল্লীগ্রামের লোক সাধারণত ঘরে জানালা রাখে না। যে সব জানালা পল্লীগৃহে দেখা যায়, সেগুলিকে গবাক্ষ বললেও অন্যায় বলা হয় না। সেগুলি এত ছোট যে, তাতে ঘরের ভিতর আলো-হাওয়া স্বচ্ছন্দে যাওয়া-আসা করতে পারে না। পল্লী-মঙ্গল-সমিতির চেষ্টায় অনেক গৃহে জানালা ফোটানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রত্যেক সমিতিই গ্রামের ঝোপ-জঙ্গল কেটে দিয়েছে, পুকুর-ডোবা পরিষ্কার করেছে, ছোট ছোট ডোবা ভরাট ক'রে দিয়েছে। কয়েক জায়গায় টিউব-ওয়েলও বসানো হয়েছে। ঘাটাল মহকুমায় শ্যামগঞ্জ পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির কাজ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্যামগঞ্জ গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা বড় পুকুর বহুদিন ধ'রে ম'জে কচুরিপানায় ভ'রে ছিল। সমিতির সভ্যগণ নিজের হাতে পুকুরের জল বার ক'রে দিয়ে আবার তাকে কেটেছেন। এতে যে মাটি উঠেছিল তাতে গ্রামের ছোট বড় পচিশটি খানা-ডোবা ভরাট হয়ে গেছে। এঁরা গ্রামের জঙ্গল কেটে, খাবার জলের

ব্যবস্থা ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, নিজের হাতে দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ঘর তৈরি করেছেন। এখন গ্লামটির চেহারা একেবারে পাল্টে গেছে। পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি ও ইউনিয়ন বোর্ডের মিলিত চেষ্টায় এবং মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের অর্থসাহায্যে গত এক বছরে চোর্দ্দটি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি গ্রামে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে।

জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের চেষ্টায় কাঁথি ও তমলুক মহকুমার জলনিকাশের সম্বন্ধে আলোচনা হয়ে একটি পরিকল্পনা স্থির হয়েছে। জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় এই দুই মহকুমার নিম্নভূমিতে বৃষ্টির জল জ'মে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি করত। যে পরিকল্পনা এখন গৃহীত হয়েছে, তাতে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারবে। পরিকল্পনা অনুসারে কাজও আরম্ভ করা হয়েছে। কাঁথি মহকুমায় অনেকগুলি খালের সংস্কার পল্লী-মঙ্গল-সমিতির চেষ্টায় ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। তমলুক মহকুমায় হাসুয়াখালি খালের সংস্কার উল্লেখযোগ্য। এই খালটি লম্বায় প্রায় ৮ মাইল এবং গত ৪৫ বছরের ভিতর এর কোনরূপ সংস্কার হয় নি। তার ফলে খালটি ম'জে যাওয়ায় ঐ অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্যের অসুবিধা, যাতায়াতের কষ্ট ও স্বাস্থ্যের হানি হচ্ছিল। গ্রামের লোক সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে খালটি সংস্কার আরম্ভ করেন এবং গত বছর বর্ষার আগেই সাড়ে চার মাইল কাটা শেষ করেন। এগারোখানি গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসী আট দিন ক'রে কায়িক পরিশ্রম ক'রে এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

মেদিনীপুর জেলার লোক একমাত্র ধান-চাষের উপরেই নির্ভর করে। তাতেও যে ফলন তারা পায়, তাকে কোন ক্রমেই পর্য্যাপ্ত বলতে পারা যায় না। নূতন বীজ বিলি ক'রে ধানের ফলন বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আক, চিনাবাদাম, তামাক, আলু ও নানা রকম সব্জির চাষ-আবাদের প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। এ জেলায় এগারোটি Demonstration Farm খোলা হয়েছে। প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য ৩৭ বিঘা জমি নিয়ে নূতন ধরণের চাষ-আবাদ হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে। সার রাখার প্রণালী দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক জায়গায় এভাবে সার রাখা হচ্ছে। জমির উর্ব্বরতা বাড়াবার জন্য ধৈঞ্চা সবুজসার দেওয়া হয়েছে। একদিন মেদিনীপুর জেলায় যথেষ্ট পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হ'ত, এখন লোকে তুলার চাষ ছেড়ে দিয়েছে, অথচ এ জেলার মাটি তুলার চাষের উপযোগী। কৃষি-বিভাগের উদ্যোগে ৫০ বিঘা জমিতে No. 289 F লম্বা-আঁশ কার্পাসের চাষ করা হয়েছে। কিছুদিন আগে Bengal Mill Owners' Association-এর প্রতিনিধিগণ এই তুলা ও তুলার গাছ দেখে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তুলার আঁশ হয়েছে ১⅛ ইঞ্চি। এই তুলা কাপড়ের কলে ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে।

গোজাতির উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা ক'রে পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে ৬০টি উৎকৃষ্ট ষাঁড় আনিয়ে ৬টি থানায় বিতরণ করা হয়েছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট পল্লীসংস্কারের জন্য যে অর্থসাহায্য দিয়েছেন, তা থেকে ২৪৭০০৲ এই কাজের জন্য তিন বছরে ব্যয় করা হবে। শুষ্ক-খাদ্যের জন্য সর্ব্বত্র নেপিয়ার ঘাসের চাষ প্রবর্ত্তন করা হয়েছে।

পল্লীবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিতরণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। অনেকগুলি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাবিতরণের জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্যে চলন্ত লাইব্রেরির প্রবর্ত্তন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এজন্য যে পরিকল্পনা করেছেন, তার মূল কথা এই যে, জেলায় কয়েকটি কেন্দ্র ঠিক ক'রে নিয়ে সেখানে ভাল ভাল নির্ব্বাচিত বই বাক্সবন্দী ক'রে পাঠানো হবে। বইগুলি এক একটি কেন্দ্রে এক মাস থাকবে এবং মাস শেষ হ'লে পর এক কেন্দ্রের বই অন্য কেন্দ্রে পাঠানো হবে, যাতে প্রত্যেক কেন্দ্রই ধারাবাহিকভাবে নূতন বই পেতে পারে। এই পরিকল্পনা অনুসারে এ জেলার প্রত্যেক মহকুমার ২০টি কেন্দ্র নির্ব্বাচিত হয়েছে। এবং প্রত্যেক কেন্দ্রের অধীনে তিন-চারিটি উপকেন্দ্র স্থির করা হয়েছে। প্রত্যেক কেন্দ্রেই একটি ক'রে পড়বার ঘর আছে। পর্য্যায়ক্রমে কাজ করবার জন্য একদল কর্ম্মীও ঠিক করা হয়েছে, যাঁরা নিয়ম ক'রে সন্ধ্যায় এক বা দু ঘণ্টা ধ'রে গ্রামবাসীকে বই প'ড়ে শোনান এবং পাঠ্যবস্তু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেন। এই ভাবে পল্লীগ্রামের নিরক্ষর ও

অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য, কৃষি ও পৌরকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা বিতরণ ক'রে তাদের বুদ্ধিমান নাগরিকরূপে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করা হ'চ্ছে। পল্লী-মঙ্গল-সমিতিগুলিও বুঝেছেন, যে, শিক্ষার পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট স্থান রাখতেই হবে। গত এক বছরে ২০টি গ্রাম্য পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে।

পল্লীবাসীকে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে গভর্মেণ্ট জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ১৫টি বেতার-যন্ত্র রেখেছেন। সে যন্ত্রগুলিকে মেদিনীপুর থেকে ১৬।১৭ মাইলের ভিতর রাখা হয়েছে। বেতারের গান-বাজনা যাদের আকৃষ্ট করে, যাতে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ পেতে পারে, সেজন্য প্রত্যেক বেতার-কেন্দ্রে দৈনিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া, এ জেলায় ১৯টি স্থলে বেতার-যন্ত্র রাখা হয়েছে।

পল্লী-মঙ্গল-সমিতির চেষ্টায় গ্রামে খেলাধূলার বিশেষ আয়োজন দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলি গ্রামে খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে ফুটবল, সাঁতার, দৈহিক ব্যায়াম ইত্যাদির অভ্যাস চলেছে। দু একটি বেড়াবার পার্কও তৈরি হয়েছে।

এক বছরে যা কিছু কাজ হয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। সময় অল্প হ'লে প্রত্যেক সমিতির কাজের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। আজ এ কথা বলা অন্যায় হবে না যে, মুমূর্ষু পল্লীকে জাগিয়ে তুলতে মেদিনীপুর জেলায় নূতন কর্ম্মপ্রেরণা দেখা দিয়েছে এবং এ কর্ম্মপ্রেরণার ফলে পল্লীবাসীর আত্মনির্ভরশীলতা জেগে উঠছে। পল্লী-সংস্কার একদিনের ব্যাপার নয়; আজ যে জঙ্গল কাটা হবে, দুদিন পরে বর্ষার জল পেয়ে আবার তা বেড়ে উঠবে; আজ যে পুকুর পরিষ্কার করা হবে, কিছুদিন পরে আবার সেটা পাঁকে ভ'রে যেতে পারে; আজ যে রাস্তা তৈরি হবে, যত্ন না নিলে মাস কয়েক পরে তাও অব্যবহার্য্য হতে পারে। তাই এই কাজে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের একান্ত প্রয়োজন। পল্লী-মঙ্গল-সমিতি স্বেচ্ছায় যে ব্রত নিয়েছেন, তা যদি নিয়ম ক'রে পালন করা হয়, তা হ'লে পল্লীতে পল্লীতে আবার সুজলা সুফলা জগদ্ধাত্রী-রূপ ফুটে উঠবে। *

গত ২৫এ মার্চ তারিখে কলিকাতা বেতার-প্রতিষ্ঠানে এই বক্তৃতা দেওয়া হয়।

সাহিত্য ও অন্ন-সমস্যা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস

বড় বিষম সময় প'ড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা আজ অদৃষ্টের ফেরে নির্জ্জলা, নিষ্ফলা, পাটগুন্মপ্রবলা হয়ে পড়েছে। প্রায় চৌদ্দ আনা বাঙ্গালী আজ ক্ষুধায় শীর্ণ, রোগে জীর্ণ ও দৈন্যে দীর্ণ। বঙ্গলক্ষ্মী যেন এই অলস, নিশ্চেষ্ট, শ্রমবিমুখ বাঙ্গালী জাতির ভয়াবহ ভবিষ্যৎ মানসনেত্রে নিরীক্ষণ ক'রে শঙ্কায় স'রে পড়েছেন। এদিকে চারদিক থেকে নানা বিচিত্র জটিল সমস্যা বাঙ্গালীর দ্বারে এসে পৌঁছেছে। রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য সবই এক একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকারূপে সমাধানের অপেক্ষায় সমুৎসুক। বাঙ্গালী তার বর্ত্তমান শিক্ষা ও জ্ঞানের সহায়তায় এসব সমস্যার মীমাংসা করতে পারছে না। আবার সবচেয়ে কঠিন ও দুরূহ হয়ে উঠেছে তার অন্ন-সমস্যা। সুখে স্বচ্ছন্দে দুমুঠো খেয়ে প'রে এই পৃথিবীতে থাকবার সাধ আমাদের সকলের আছে এবং তার জন্য ইচ্ছা ও চেষ্টা আমরা যে যার মত ক'রে থাকি। কিন্তু ফলে শতকরা আশীজন বাঙ্গালীর সে চেষ্টা ও যত্ন নিষ্ফল হচ্ছে—রাত্রিদিন চেষ্টা ক'রেও তারা স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের অশন বা বসন কিছুরই সংস্থান করতে পারছে না। সারা বাংলা জুড়ে যেন বুভুক্ষু বাঙ্গালীর বিশুষ্ক কণ্ঠে উঠেছে এক বিকট মর্ম্মভেদী চীৎকার—"ম্যয় ভূখা হুঁ"।

কেন এমন হ'ল? কোন্ পাপে আমরা লক্ষ্মীছাড়া হলাম। আমাদের যে একদিন সবই ছিল;—চোখভরা চাহনি, গালভরা হাসি, প্রাণভরা খুশি, মজলিসভরা লোক—

কি ছিল না? পেটের ভাত, কটির কাপড়, গাভীর দুধ, পুকুরের মাছ, ধানের মরাই;—কিসের অভাব ছিল? মুক্ত আকাশ, শ্যামল পল্লীবীথি, শ্রমলব্ধ অন্ন, সার্ব্বজনীন প্রীতি—কোন্‌টা ছিল না? কোথায় গেল সে সব? কেমন ক'রে গেল—কেন গেল?

দোষ কারুর নয়—দোষ আমাদেরই। যে অক্ষম, যে দুর্ব্বল, নিজের স্বভাবধর্ম্মকে যে জানিলে না, চিনলে না বা বুঝলে না, স্বখাত-সলিলে সে এমনই ক'রেই ডুবে মরে। ভুল হচ্ছে আদর্শের সংঘাত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের যে একটা বৈষম্য আছে, তা স্বীকার না ক'রে প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের আদর্শে গ'ড়ে তুলতে গিয়ে যত অনর্থ আমরা 'খাল কেটে কুমীর আনা'র ন্যায়ে ডেকে এনেছি। ভাগ্যদোষে সেই ভুলের মোহ আজও আমাদের গ্রাস ক'রে রেখেছে। তাই দেশ আছে, দেশের আদর্শ নেই, পল্লী আছে, পল্লী-শ্রী নেই, জাতি আছে জাতির সে প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি নেই, সমাজ আছে, সমাজের মধ্যে সেই সমপ্রাণতা নেই। সত্য বলতে গেলে, সুখ গিয়েছে, সুখের চিহ্ন গিয়েছে, বঁধু গিয়েছে, বৃন্দাবনও বুঝি যায় যায়!

অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হ'লে আজ সবচেয়ে আগে জীবনটাকে সহজ, সরল ও সবল ক'রে তুলতে হবে। জীবনের ধারা ও গতি বদলাতে হবে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সে পরিবর্ত্তন কতদূর সম্ভব আজ তাই একটু আলোচনা করব।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রধানত দুটো সম্পূর্ণ পৃথক অধ্যায় দেখতে পাই। একটা নবাবী যুগ, অপরটা সাহেবী যুগ। নবাবী যুগের সাহিত্যে ছড়া, পাঁচালি, পদাবলী ও সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ ছাড়া কিছু নেই বললেও চলে। মোটের উপর এ সাহিত্য কবিতা, গান ও গল্পের সাহিত্য। এযুগে যে বাঙ্গালীর পেটের চিন্তা তেমন থাকে নি, তার প্রমাণ বাঙ্গালীর হাতেই একটি নব্যন্যায় ও একটি নব্যস্মৃতি সৃষ্টিলাভ করেছে। ফলে নবাবী আমলে বাঙ্গালী অন্ন-সমস্যা না হ'লেও সমাজ-সমস্যার নিরাকরণে মস্তিষ্ক চালনা করতে পেছপাও হয় নি। সাহেবী আমলে অন্নচিন্তার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমিক হ্রাস ঘটে। এযুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে স্বীকার করলেও, সংস্কৃত ভাষা একদিন যেমন জ্ঞান ও চিন্তার বাহন ছিল, সেরূপ স্থান অধিকার করতে বাঙ্গালা ভাষা বা সাহিত্য এখনও পারে নি। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য এখনও গান-গল্প, কবিতা-উপন্যাস, রসসৃষ্টি, সমালোচনা, দু চারিটা ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ও অনুবাদমূলক রচনার মধ্যেই আবদ্ধ। আমাদের মাতৃভাষা যে এখনও স্বপ্রবিষ্ট হতে পারে নি, তার প্রধান কারণ ইহা এখনও ইংরেজীর অনুচর বা পার্শ্বচর হয়ে আছে। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং"—ইহা অভ্রান্ত সত্য। সুতরাং যতদিন না আমাদের মাতৃভাষা আত্মবশ হচ্ছে, ততদিন বাঙ্গালীর প্রতিভারও পূর্ণবিকাশ ঘটে ওঠা সুকঠিন।

আধুনিক যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন 'স্বপ্ন-পাখীর পালকে'র উপর অথবা 'পরীর রঙিন পাখা'য় ভর ক'রে 'ভাবে-ঘেরা পুলকের রাজ্যে'ই হোক কিম্বা 'ভাবসাগরের অসীম কিনারায়' পাড়ি মারতে চান। ফলে অশিক্ষিত জনসাধারণ তাঁদের নাগাল না পেয়ে হতাশভাবে তাঁদের সঙ্গে নাড়ীর যোগ বিছিন্ন করতে বাধ্য হয়। সাহিত্যে এই যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান, এটা কি জাতি, কি সাহিত্য—দুয়ের পক্ষেই অকল্যাণকর। আমরা ভুলে যাই—ব্যক্তি ও সমাজ এক-সঙ্গে মহাসত্য। জীবনকে খণ্ড ক'রে দেখাটাই মস্ত ভুল। ব্যক্তিত্ব যেমন ব্যক্তির নিজস্ব সংবিৎ, সমাজও তেমনই জাতির আত্মস্থ সংবিৎ। সত্য কাউকে ত্যাগ ক'রে ফুটে ওঠে না। পঞ্চপ্রদীপেই মায়ের মঙ্গল-আরতি হয়ে থাকে। সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি বা জাতিকে বাদ দিয়ে সমাজ আপনাকে বড় করতে চাইলে পরিণাম ভয়াবহ হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য জগতের এই ভয়াবহ পরিণামের নিদর্শন অহোরাত্র আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। দুঃখ এই, আমাদের জাতি ও সমাজের মধ্যেও এমনই একটা অকল্যাণ-কর ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সমাজের ধনী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বা শ্রমজীবীদের মধ্যে সে পূর্ব্বতন প্রীতি তো দেখাই যায় না, এর উপর আবার সাধারণভাবে সমাজের এক নূতন শিক্ষাগত শ্রেণীবিভাগ হয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান বাড়ছে বই কমছে না। বাঙ্গালী সাহিত্যিককে এই ঘৃণিত ব্যবধান বিলোপ ক'রে জাতিকে আত্মস্থ করতে হবে। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য গান বা

কবিতার ভিতর দিয়ে একদিন এই কাজ করেছিল। সে যুগের সাহিত্য সৌখিন সাহিত্য ছিল না—দেশের জাতি সমাজ বা জনসাধারণের হৃদয় থেকে আপনার রস ও শক্তি সঞ্চয় ক'রে সে সাহিত্য ধীরে ধীরে প্রাণবান হয়েছিল। বাঙ্গালার অশিক্ষিত কামার-কুমার জেলে-নাপিত, কৃষক-মোদক প্রভৃতি সকলের মুখে আজও তাই 'আয় মা সাধন-সমরে', 'ডুব দে রে মন কালী বলে', 'হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি', 'ধনি আমি কেবল নিদানে'—প্রভৃতি ভাবালঙ্কারপূর্ণ গান ধ্বনিয়া ওঠে। সে সাহিত্যে বাঙ্গালীত্বের ছাপ ফুটে উঠেছিল ব'লেই আজও 'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল' গান ধরলেই দামু গোয়ালার চোখ সজল হয়ে ওঠে। ফলে আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে জ্ঞান ও ভাবকে আমরা যতদিন না দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করতে পারছি, ততদিন আমাদের মনের বা দেহের কালি মুছে যাচ্ছে না। আজকার দিনে প্রত্যেক জ্ঞানমন্দিরের সেবায়েৎকে জ্ঞানের অনুশীলনের সঙ্গে তার বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। সকলে পণ্ডিত হয়ে তবে আমাদের লব্ধজ্ঞান বা ভাবের অধিকারী হবে, এটা ভেবে ব'সে থাকলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান কোন কালেই বিলুপ্ত হবে না।

সাহিত্য কি শুধু খেয়াল মায়া বা অলীক স্বপ্ন? এই যে—

"বড় দুঃখ বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ-অন্ধকার
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট"

—এই অভাব মোচন কি সাহিত্যের কর্ত্তব্য নয়? দেশধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার। সাহিত্যের সহায়তায় যদি আমরা সে ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হই, তা হ'লে আমাদের লেখনীধারণ নিরর্থক। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"যে লেখনী দরিদ্রের হৃদয়বিদারক ক্রন্দন প্রকাশ না করে, সে লেখনীর ধ্বংস হউক।" এই অন্নহীন বস্ত্রহীন শান্তিহীন মরণোন্মুখ জাতির জীবনে সাহিত্য যদি স্বাস্থ্য, শক্তি ও স্বস্তির উৎস বহাতে না পারে—গানে গল্পে, কথায় চিত্রে, প্রবন্ধে নিবন্ধে অনুবাদে ও আলোচনায়, ভাব ও ভাষার বিচিত্র বিন্যাসে সাহিত্য যদি সমাজ বা জাতিকে বাঁচবার ও মানুষ হবার প্রণালী শিক্ষা না দেয়, তবে সে সাহিত্যের সার্থকতা কোথায়? দীন-দরিদ্রের আকুল ক্রন্দন ভগীরথের শঙ্খ-নিনাদের মত আজ দেশের নূতন সাহিত্য-ধারাকে আহ্বান করছে। এ যুগের সাহিত্যিককে দেশ বা সমাজের সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার মারফৎ নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। একমাত্র ধর্ম্মকে ভিত্তি ক'রে যে সেই সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ধর্ম্মকে ভিত্তি ক'রেই সে যুগের বাঙ্গালী ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সকল কর্ত্তব্যের সমাধান করতেন। এমন কি, সে যুগের রাজনীতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রভাব এড়াতে পারে নি। তবে স্মরণ রাখা উচিত—এই ধর্ম্ম কোন বিশিষ্ট আচার বা সম্প্রদায়গত হবে না। নবীন সাহিত্যিকের ধর্ম্ম হবে সেবার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন। কি পারিবারিক, কি সামাজিক জীবনে এই সেবাধর্ম্ম বা মনুষ্যত্ব লাভের প্রয়াস যাতে স্বতঃ ও সর্ব্বাঙ্গীণভাবে স্ফুরিত হয়ে ওঠে, সাহিত্যিকমাত্রকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। সাহিত্য মানুষ গ'ড়ে তুলতে পারলে দেশে অন্নবস্ত্রের অভাব থাকবে না। আমাদের দারিদ্র্য-সমস্যার মূলে আমাদের চরিত্রগত অনেক সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা বিদ্যমান। এই সব অন্তরায় একে একে জ্ঞান ও কর্ম্মের সহায়তায় নাশ করা চাই। তারপর সেবার পথে দেশের দারিদ্র্য-মোচনের কাজে আগুয়ান হতে হবে। কি উপায়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব হতে পারে, তার দুচারটে এখানে উল্লেখ করলুম। বিশেষজ্ঞগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লে শ্রম সফল বোধ করব।

দেশে দেশে আজকাল সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই, কিন্তু তা বড়ই সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। শহরের সৌখিন সাহিত্যসেবা ছেড়ে এই সব প্রতিষ্ঠানের সদস্যকে সাহিত্য প্রচারের দ্বারা পল্লীর পর্ণকুটীরবাসীর দুঃখ দরিদ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। আবশ্যক হ'লে পল্লীতে পল্লীতে সাহিত্য-সমিতি স্থাপন করতে হবে। A nation dwells in a cottage স্মরণ ক'রে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রের পরিসর বাড়াতে হবে। পল্লীর মধ্যে স্বাস্থ্য-সমিতি, স্বৈবতনিক পাঠশালা, নৈশবিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাঙ্গলা দেশকে বুঝতে

হ'লে শহরের বড় রাস্তা আফিস আদালত ছেড়ে শ্যামল প্রান্তরের ছায়া-সুনিবিড় পল্লীতে যেতে হবে—যে কৃষক লাঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে রামপ্রসাদী সুরে গান ধরেছে তার গানের সঙ্গে সাহিত্যিককে আপন অন্তরের সুর মিলাতে হবে। তাদের শিক্ষা-সংস্থানে লেখনী ধারণ করতে হবে। সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ফলে প্রকৃত পরিচয় জন্মে। এই পরিচয় লাভের জন্য যাঁরা আগ্রহশীল হবেন, তাঁদের পল্লীবাসীগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অভাব-অভিযোগের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে হবে। পল্লীর প্রাচীন পুথি, কুলজীগ্রন্থ, প্রাচীন গীত, ছড়া, বচন, ব্রতকথা, ধর্ম্মঠাকুরের পালা, জনপ্রবাদ সঙ্কলন করতে হবে। সেখানকার আমোদপ্রমোদ, ধর্ম্মকর্ম্ম, মেলা-উৎসব প্রভৃতি বোঝবার চেষ্টা করতে হবে—কথকতা, যাত্রা, কবিগান, শিবায়ন, রামরসায়ন, চণ্ডী, হরিনামসংকীর্ত্তন প্রভৃতি লোকশিক্ষার জাতীয় প্রণালীর সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। তারপর প্রবন্ধে নিবন্ধে, গানে গল্পে, চিত্রে কথায়, কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার প্রচার ও ধনবিজ্ঞানের সহায়তায় তাদের ধনোৎপাদনস্পৃহা ও আত্মনির্ভরতাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে সমবায়ের মন্ত্র—

"Man like the generous vine supported lives
The strength he gains is from the embrace
he gives."

দেশের প্রায় চৌদ্দ আনা সাহিত্যিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত। এঁদের ভাবুকতা আছে, অথচ অন্নসংস্থানে পর-নির্ভর। পল্লীর সেবায়, অন্নসমস্যা সমাধানে সাহিত্যিক-গণকেই সকলের আগে ভাবুকতার সঙ্গে ধর্ম্মপ্রাণতার আদর্শ দেখাতে হবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য, বাণিজ্যাদির বিবরণ, কৃষি-শিল্প-বিভাগের খতিয়ান, কলকারখানার সংবাদ পল্লীসমাজে পরিবেশন করা প্রয়োজন। সে ভার নিতে হবে সাহিত্যিক-গণকেই।

আমাদের অবনতির মূলে রয়েছে আমাদের বিলাস, অসংযম ও ভোগস্পৃহা। ভোগসর্ব্বস্ব প্রতীচ্যের আদর্শে প্রাচ্যকে গ'ড়ে তোলবার প্রয়াসে আমাদের সরল জীবন আজ বিচিত্র বিলাসের মধ্যে জটিল হয়ে পড়েছে। উদাহরণ না দিলেও চলে। ওকবল বলতে চাই যে, সকল প্রকার বহিরাক্রমণ থেকে সযত্নের সহিত আত্মরক্ষাই মানুষের ধর্ম্ম; সুতরাং যে বিলাস ও জড়তা আমাদের দিন দিন জীবনকে খর্ব্ব ক'রে তুঁলছে, তাদের জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিহার করতেই হবে। সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র—কার্য্যও বিচিত্র, অসংখ্য। চাই উৎসাহ, উদ্যম ও অধ্যবসায়। আগেই বলেছি, দীনদরিদ্রের আকুল ক্রন্দন ভগীরথের শঙ্খনিনাদের মত আজ সাহিত্যিকগণকে আহ্বান করছে। জাতীয় জীবন লাভের নবপ্রভাতে বিশ্বদেবতা আজ বুভুক্ষু বেশে পূজার আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। সাহিত্যিককে আজ তাঁর পূজায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানই বহন ক'রে থাকেন। কেন না তিনিই বলেছেন—

"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা

চৈত্র মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত এ জেলায় যে কয়টি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার বিবরণ 'পল্লী-শ্রী'তে প্রকাশিত হ'ল।

(ক) খালিনা দাতব্য চিকিৎসালয়

৫ই চৈত্র, নরায়ণগড় থানার এলাকায় খালিনা গ্রামে এই চিকিৎসালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট—মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস.—এই চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং তদীয় পত্নী চিকিৎসালয়টির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শান্তি-নিকেতনের পরিকল্পনা-অনুকরণে এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি স্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা খালিনা-পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির সম্পাদকের পঠিত বিবরণীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি—

"এই পরিকল্পনা অনুসারে—২০০ জন সদস্য প্রত্যেকে প্রবেশ ফিস্ চারি আনা করিয়া এবং বাৎসরিক চাঁদা ৪৲ টাকা করিয়া দিবেন। তাহা ছাড়া ১৲ টাকা করিয়া শেয়ার-বাবদ এবং মাসে এক আনা করিয়া স্বাস্থ্য-বাবদ তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। এই সমস্ত যদি নিয়মিত

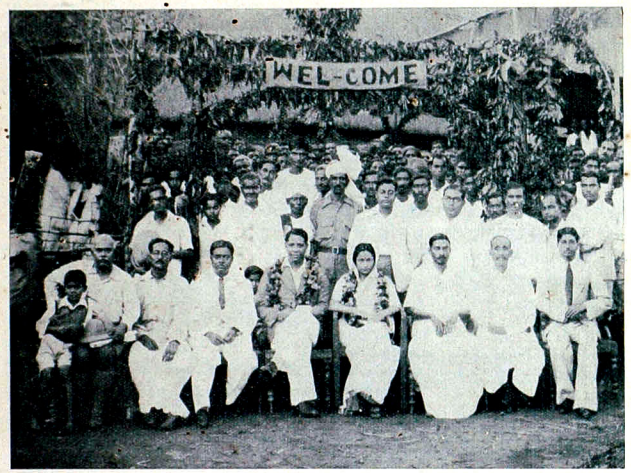

খালিনা দাতব্য-চিকিৎসালয়ের উদ্বোধনে সস্ত্রীক জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট

আদায় হয়, তাহা হইলে বাৎসরিক ১০০০৲ টাকা আয় হইবে। ইহা ছাড়া জেলাবোর্ড হইতে বাৎসরিক চারিশত টাকা সাহায্য আমরা আশা করি।

"যাঁহারা মেম্বর হইবেন তাঁহারা ডাক্তারখানাতে ঔষধ লইতে আসিলে ৴০ এক আনা করিয়া দিবেন এবং যাঁহারা মেম্বর নহেন তাঁহারা ৵০ তিন আনা করিয়া দিবেন। ইহা হইতেও সমিতির কিছু আয় হইবে।

"সমিতির ডাক্তার সদস্যগণের বাড়ী গেলে চারি আনা করিয়া ফিস্ আদায় করিবেন এবং তাহা সমিতির ফণ্ডে জমা দিবেন। যাঁহারা সদস্য নন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ডাক্তার নিজের ফিস্ আদায় করিতে পারিবেন।

"বর্ত্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০০। ৪০০৲ চাঁদা ও প্রবেশ. ফিস্ ২৫৲ আদায় হইয়াছে। এই ৪২৫৲ হইতে ২৫০৲ টাকার ঔষধ কেনা হইয়াছে। একজন পাশ করা ডাক্তার মাসিক ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং একজন পরিচারক মাসিক ৩৲ বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

"সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। চিকিৎসালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইলে যখন সকলেই উপলব্ধি করিবে যে এই সমিতির সদস্য হওয়া লাভজনক, তখন সদস্য-সংখ্যা আপনা হইতেই বাড়িবে এই আশাই আমরা করিতেছি।

"শুধু চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ বিতরণ করাই একমাত্র

উদ্দেশ্য এই সমিতির নয়। রোগ নিবারণ করাও এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য-বাবদ যে চাঁদা আদায় হইবে তাহা হইতে 'ম্যালেরিওল' ক্রয় করিয়া ডোবাতে ছড়ানো হইবে।"

(খ) বোনাই পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয়

সবঙ্গ থানার অন্তর্গত বোনাই গ্রামের স্বর্গগত সারদাপ্রসন্ন দাস মৃত্যুর পূর্ব্বে যে উইল করেন, তাতে বোনাই গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জেলা-বোর্ডের হাতে ৬০০০ টাকা দেবার ব্যবস্থা থাকে। উইলে এ কথারও উল্লেখ থাকে যে, ডাক্তারখানার জন্য গৃহাদি ও ডাক্তারের বাসস্থান ইত্যাদিও তাঁর পরিত্যক্ত টাকায় তৈরি হবে। এতদিন অনেক রকম বাধা-বিপত্তি থাকায় উইলের মর্ম্ম অনুযায়ী চিকিৎসালয়টি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। সম্প্রতি ৺সারদাপ্রসন্নের উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস এ বিষয়ে উৎসাহী হন এবং উইলে উল্লিখিত ৬০০০৲ ও নিজের ১০০০৲ দিয়ে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছেন।

গত ৬ই চৈত্র মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. বোনাই গ্রামে গিয়ে চিকিৎসালয়টির দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। আমরা চিকিৎসালয়টির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

(গ) পিংবনি গোয়ালতোড় ইউনিয়ন-বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়

চন্দ্রকোণা রোডের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গণোয়ারী-লাল মাহাতো তাঁর স্বর্গীয়া মাতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে গড়বেতা থানার অধীন গোয়ালতোড় গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য গৃহনির্ম্মাণ করবার সঙ্কল্প করেন। পিংবনি ও গোয়ালতোড় ইউনিয়ন-বোর্ড একত্রে এই চিকিৎসালয়টির ব্যয়ভার বহন করতে স্বীকৃত হ'লে মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডও চিকিৎসালয়ের সাহায্যে ৪০০৲ দিতে প্রতিশ্রুত হন।

এ বৎসর নূতন গৃহনির্ম্মাণ সম্ভব না হওয়ায়, একটি ভাড়া-করা গৃহেই চিকিৎসালয়টি স্থাপিত হয়েছে। গত ৬ই চৈত্র, মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান রায়° সাহেব দেবেন্দ্রমোহন° ভট্টাচার্য্য চিকিৎসালয়টির দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন।

(ঘ) ডিঙ্গল দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়

ডেবরা থানায় ডিঙ্গল গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হুই সমস্ত সরঞ্জাম-সমেত একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগার সাধারণের উপকারের জন্য দান করেছেন। গত ৮ই চৈত্র জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. এই চিকিৎসাগারটির উদ্বোধন করেছেন।

(ঙ) সাতবাঁকুড়া শঙ্করকাটী ইউনিয়ন-বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়

মাতার স্মৃতিরক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত গণোয়ারীলাল মাহাতো গোয়ালতোড়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহনির্ম্মাণ ক'রে দিচ্ছেন। পিতার স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি অহল্যাবাঈ রোডের উপরে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুরম্য গৃহনির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। এই চিকিৎসালয়ের যাবতীয় সরঞ্জামও তিনি দান করেছেন। গড়বেতা থানার সাতবাঁকুড়া ও শঙ্করকাটা ইউনিয়ন-বোর্ড মিলিত হয়ে এই চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করতে স্বীকৃত হয়েছেন। ইউনিয়ন-বোর্ডের উৎসাহ দেখে জেলা-বোর্ডও ৪০০৲ অর্থসাহায্য দিয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম ক'রে দিয়েছেন।

গত ১০ই চৈত্র° মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস.—এই চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন। °তাঁর সেদিনকার অভিভাষণের প্রতিধ্বনি ক'রে আমরাও দাতার দীর্ঘ জীবন এবং চিকিৎসালয়টির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

প্রদর্শনী

১৫ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলায় যে কয়টি কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়েছিল, তার বিবরণ গত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় অবশিষ্ট প্রদর্শনীগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হ'ল।

(ক) গঙ্গাধর মেলা ও প্রদর্শনী, মুগবেড়িয়া

কাঁথি মহকুমার এলাকায় মুগবেড়িয়া গ্রামে সুরম্য গঙ্গাধর পার্কে এই মেলা ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়েছিল। গত ১৯এ ফাল্গুন, কাঁথির মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস. এন. মিত্র, আই. সি. এস. এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং তদীয় পত্নী প্রদর্শনী-গৃহের দ্বারোন্মোচন করেন। প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগে "গঙ্গাধর মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোশিয়েশনে"র যত্ন ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া গেছল। গভর্মেণ্টের শিল্পবিভাগ মৃৎ-শিল্প সম্বন্ধে হাতে-কলমে সাধারণকে উপদেশ দিয়েছিলেন, স্বাস্থ্যবিভাগের ভ্রাম্যমান সিনেমা-পার্টি স্বাস্থ্য ও কৃষিরউন্নতি সম্বন্ধে অনেকগুলি চিত্র দেখিয়েছিলেন। এ জেলার কৃষি ও স্বাস্থ্য বিভাগ চার্ট, চিত্র ইত্যাদির সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে কৃষি ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রচার করেছিলেন। মেলার উদ্বোধন-দিনে এবং তার পর আরও দু এক দিন স্কুলের ছাত্রদের সম্মিলিত ব্যায়াম-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। মেলার আয়োজন যাঁদের চেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ডাঃ শরৎচন্দ্র মিশ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

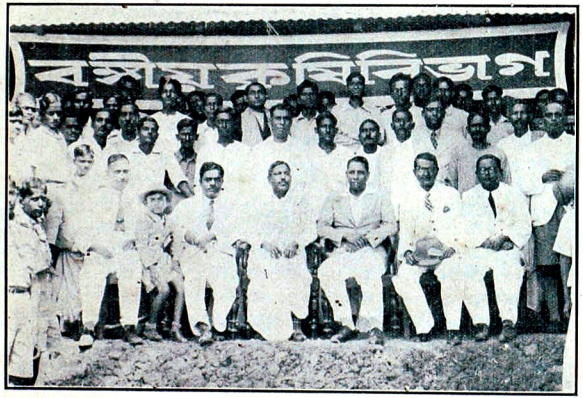

চন্দ্রকোণা কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উৎসবে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি ও কর্ম্মীগণ

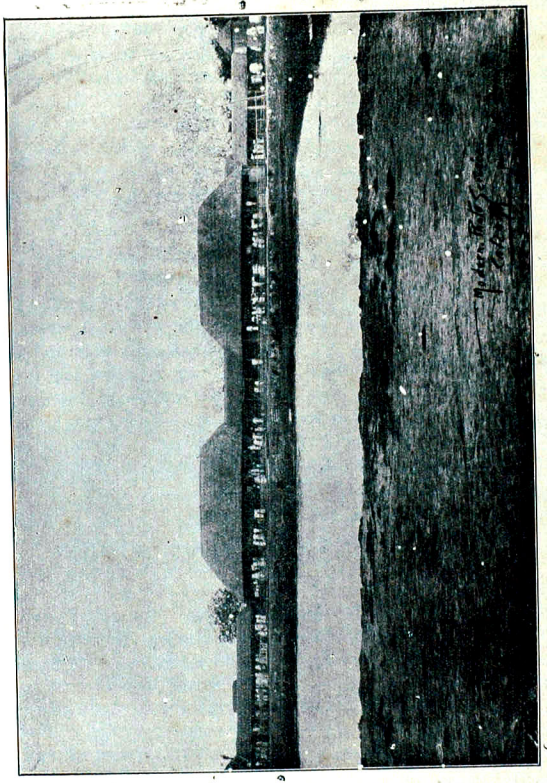

মুগবেড়িয়া: গঙ্গাধর মেলা ও প্রদর্শনী

(খ) দ্বারিবেড়্যা কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

তমলুক মহকুমায় দ্বারিবেড়্যা গ্রামে এবার প্রথম কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হ'ল। গত ১৩এ ফাল্গুন, মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান—রায় সাহেব দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিভাগের স্টলগুলিতে জনসাধারণকে অত্যাবশ্যক তথ্যগুলি-বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিক্ষাবিষয়ক স্টলে বাংলায় গ্রন্থাগার-আন্দোলন, লোকশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছিল। তা ছাড়া চারুশিল্পের নিদর্শন, মহিষাদল রাজবাড়ির প্রাচীন দ্রব্যাদি—প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ হয়েছিল। চার-দিনব্যাপী প্রদর্শনীতে প্রতিদিন ছ সাত হাজার নরনারীর সমাগম হয়েছিল।

(গ) চন্দ্রকোণা কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

ঘাটাল মহকুমায় চন্দ্রকোণা কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়—২৬এ ফাল্গুন। মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে শালবনির বয়ন-শিল্প, বিষ্ণুপুরের তসর-শিল্প, রামজীবনপুরের বস্ত্রাদি, খড়ারের বাসন, মেদিনীপুর বয়ন-বিদ্যালয়ের দ্রব্যাদি, হাওড়া সিমেন্ট ওয়ার্কসের দ্রব্যাদির সঙ্গে কৃষি স্বাস্থ্য ও পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে অনেক চার্ট, চিত্র ও মডেল দেখানো হয়েছিল। প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দিনটিতে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। প্রদর্শনীক্ষেত্রে রেডিও, বায়োস্কোপ, ম্যাজিক-লণ্ঠনযোগে বক্তৃতা, সঙ্গীত ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকায় স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল।

(ঘ) বাথুয়াড়ি কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

গত ২৮এ ফাল্গুন, কাঁথির মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস. এন. মিত্র, আই. সি. এস. এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীটি বাথুয়াড়ি গ্রামের "রাও পল্লী-উন্নয়ন-সমিতি"র চেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। প্রদর্শনীতে কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিভাগের স্টলগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রচার করেছে। ম্যাজিক-লণ্ঠন-যোগে বক্তৃতা, রেডিও প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকায় জনসাধারণ আনন্দের সঙ্গে প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

মেদিনীপুরের আদিম অধিবাসীবৃন্দের পূজাপদ্ধতি

শ্রীসতীশচন্দ্র আঢ্য

মেদিনীপুর জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ পর্ব্বতমালায় পরিপূর্ণ ও নিবিড় জঙ্গলাবৃত। এই জঙ্গলভূমি ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া শেষে দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে সমুদ্রবেলায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত জঙ্গল ছোটনাগপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চলে যে সকল যাযাবর জাতির বাস ছিল তাহারা বনজাত আহার্য্য ও শিকার-লব্ধ মাংসে উদরপূর্ত্তি করিত। তাহাদের মধ্যে অনেক জাতি গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের মধ্যে বাস করিত। বর্ত্তমানে এই সকল আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিয়া তাহাদের সহজাত আচার ব্যবহার ও রুচির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিবার প্রয়াস পাইতেছে বটে, কিন্তু আজও তাহারা তাহাদের পুরাতন সামাজিক জীবন ও আমোদপ্রমোদ-উৎসবে তাহাদের আদিম কালের জীবনযাত্রা-প্রণালী পরিচালনায় অভ্যস্ত। আজিও বাহিরের সাজসজ্জা ও অশন বসন তাহাদের মধ্যে সামান্যই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

এই সকল জাতির মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শবরজাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাবধি শবর ও লোধ (লুব্ধক) নামে এদেশে পরিচিত।

মহারাষ্ট্রীয়দের বংশধরগণও এখানে কতক পরিমাণে রহিয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুর সীমান্তপ্রদেশ বলিয়া মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণ প্রায়ই এদেশ আক্রমণ করিত ও অনেকাংশ হস্তগত করিয়া বসবাস করিত। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পাইকড়া ভুইয়া নামক একজন মাহাট্টা জমিদার ৯ শত অনুচর লইয়া নৌরশচর পরগণায় প্রবেশ করিয়া গ্রাম লুণ্ঠন করে। সে মাসে আবার ঐ পরগণা আক্রমণ করে। সেবার সে ও তার সহকারী সর্দ্দারেরা রাত্রিকালে সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে ও হাজার ছয় শত অনুচরসহ পরগণায় প্রবেশ করে ও বলরামপুরের বীরপ্রসাদ চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির সহায়তায় ইংরাজ সিপাহীদিগকে পলাইতে বাধ্য করে। তাহারা পরিত্যক্ত গ্রাম লুটিয়া গ্রামে আগুন ধরাইয়া দেয় ও গবাদি পশু ও রণহত শত্রুদিগের মুণ্ড লইয়া প্রস্থান করে। এই 'ভুইয়া' পদবী হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে মেদিনীপুরে যে সকল আদিম ভুইয়া জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা এই মাহাট্টা বর্গীগণের বংশধর।

ইহা ব্যতীত সাওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অন্যান্য জাতিগণও এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। রামায়ণের সময়েও বঙ্গদেশে আর্য্যরাজ্য স্থাপনের কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমানে এই সকল জাতির মধ্যে মেদিনীপুরে যে যে উৎসব ও পূজা পার্ব্বণ পরিলক্ষিত হয় তাহার দুই চারিটির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে উপহার দিবার প্রয়াস পাইব।

দামোদর যাত্রা

ইহা সাওতালদিগের একটি তীর্থযাত্রার নাম। হিন্দুদিগের গঙ্গা যেরূপ কলুষনাশিনী বলিয়া খ্যাতা দামোদর নদও সাওতালদিগের পক্ষে সেরূপ পুণ্যতোয়া ও পবিত্র বলিয়া গণ্যা। সাওতালদের যাহাদেরই সঙ্গতি থাকে তাহারা তাহাদের আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর পর তাহার অস্থি আনিয়া দামোদর নদে নিক্ষেপ করে ও তাহাদের বিশ্বাস ইহার দ্বারা তাহাদের আত্মার সদ্গতি হয়। এমন কি এই নদীতীরে তাহারা অশৌচান্তে মৃতের শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপন করে ও শ্রাদ্ধ অন্তে বালির পিণ্ড হস্তে লইয়া নদীতে অবগাহনের পর ঐ পিণ্ড নদীতে বিসর্জ্জন দেয়। মৃতের প্রিয় সামগ্রী, যথা—ছড়ি বাঁশী ইত্যাদি আনিয়াও তাহারা এই সময়ে এই নদীতে নিক্ষেপ করে। তাহাদের ধারণা ঐ সকল দ্রব্য মৃতের উদ্দেশ্যে বিসর্জ্জন দিলে তাহা মৃত আত্মা গ্রহণ করিবে। অশৌচান্তের পূর্ব্ব দিন তাহারা বাড়ী হইতে চাল প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য লইয়া বাড়ী হইতে এই নদীর উদ্দেশে রওনা হয়। ঐ দিন যতক্ষণ না তাহাদের শ্রাদ্ধ ও নদীতে পিণ্ডদান শেষ হয় ততক্ষণ উপবাস করে।

অষ্টম প্রহর

ইহা হিন্দুদিগের নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অষ্টপ্রহরব্যাপী ভোগ আরাধনা নহে, ইহা সাওতাল পুরুষদিগের একটি পর্ব্বের নাম। ইহাতে উহাঁদের রমণীরা যোগ দেয় না ও প্রতি তিন বৎসর অন্তর বৎসরের যে কোনও সময়ে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী সাওতাল পল্লীতে চাঁদা তুলিয়া এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিরূপিত দিবস প্রাতঃকালে সাওতাল পুরুষগণ তাহাদের পূজারী সহ গ্রামের বাহিরে নিকটবর্ত্তী কোনও জঙ্গল অঞ্চলে আগমন করে। সেখানে একটি বৃক্ষের তলায় পাঁচ স্থানে মৃত্তিকানির্ম্মিত হস্তী ও অশ্ব রাখিয়া তাহার পূজা হয় ও শ্বেত রংয়ের ছাগল বা মুরগী বলি দিতে হয়। শ্বেত ভিন্ন অন্য কোনও রংয়ের বলি দেওয়া নিষেধ। পূজা অন্তে পূজারী ঠাকুরের জন্য খিচুড়ি রাঁধে ও মাংস সহিত ঐ অন্ন সকলে প্রসাদ পায়। এই পূজার মাংস বা পূজার অন্য কোন দ্রব্য পূজাস্থান হইতে বাড়ীতে লইয়া যাইতে নাই। ইহা হিন্দুদিগের অনেকাংশে বনভোজনী বা চড়ুই-ভাতের মত।

শালই পূজা

ইহা সাওতালদের দোল ও বসন্তোৎসব। হিন্দুদিগের দোলের নিকটবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ প্রায় ফাল্গুন চৈত্র মাসে তাহাঁদের এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাওতালদের পল্লীস্থ সকলে একদিন বনে শিকার করিতে যাইয়া নবকিশলয়সহ শালবৃক্ষের ফুল ও মহুয়া সংগ্রহ করিয়া

আনে ও পল্লীতে একটি প্রাচীন বৃক্ষের তলায় তাহা স্থাপন করে। পরদিন প্রাতে পূজক আসিয়া ঐ বৃক্ষের তলায় পূজা করে। পূজা-উপকরণ মৃত্তিকানির্ম্মিত হস্তী অশ্ব, নূতন কলস, পাঁচটি লাল মুরগী ও একটি লাল রংয়ের ছাগল। পূজারীকে একটি নববস্ত্র দিতে হয়। এই সকল উপচার গ্রামের মৃত মুরুব্বিদিগের আত্মার উদ্দেশে নিবেদিত হয় ও পূজা অন্তে বলি দিয়া পূজা সাঙ্গ হয়। পূজা শেষে সমবেত সকলে নূতন কলসের জল পূজারীর গাত্রে ছিটাইতে থাকে ও নিজেদের মধ্যেও পরস্পর পরস্পরের গাত্রে জল নিক্ষেপ করে। পূজারীও কলস হইতে জল লইয়া তাহাদের গাত্রে ছিটাইতে থাকে। এইরূপ খানিকক্ষণ আমোদ-প্রমোদের পর পূজক স্থান ত্যাগ করে ও গ্রামস্থ সকলে মাংস ইত্যাদি নৈবেদ্যের প্রসাদ ও অংশ গ্রহণ করিয়া বাড়ী যায়। এই দিন সারারাত্রি ব্যাপিয়া তাহাদের উৎসব চলে ও মাদল-সঙ্গীতের উচ্চরোলে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ প্রকম্পিত হইতে থাকে।

যতদিন সাওতালদের এই উৎসব অনুষ্ঠিত না হয় ততদিন তাহারা বৎসরের নব নব ফল ভক্ষণ করিতে পায় না। ইহা ব্যতীত এই পূজা হইবার পূর্ব্বে অন্য কেহ যদি পূজারী বা সাওতালদের গাত্রে রং দিয়া দেয় তাহা হইলে সে তাহাদের এই শালই পূজাহত অস্পৃশ্য হইয়া পড়ে ও কিছুই ছুঁইতে পায় না। এই জন্য পূজারীরা হিন্দুর দোলের সময় সহরে বা হিন্দু পল্লীতে ও লোকালয়ে আসে না।

করম পূজা

ভাদ্র মাসে ইন্দ্রদ্বাদশীর পূর্ব্বদিন 'ভূইয়া' জাতির এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহারা বন হইতে একটি কেলি কদম্ব বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া আনে ও গ্রামের মাতব্বরের বাটীর প্রাঙ্গণে উহা রোপণ করে। ঐ শাখার চতুঃপার্শ্বে চতুষ্কোণ করিয়া চারিটি বংশদণ্ড প্রোথিত করা হয় ও তাহার উপর শালুক বা শাপলা পুষ্পের মালা যজ্জিত করে। এই স্থানে পল্লীর সমস্ত ভূইয়া রমণী সমবেত হয় ও সারারাত্রি ব্যাপিয়া নৃত্যগীতে অতিবাহিত করে। ইহা তাহাদের শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব। এই উৎসবের সময়ে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজেদের জন্য ও বাড়ির বালকবালিকাদের জন্য নূতন বস্ত্র ক্রয় করে ও তাহা হরিদ্রারঞ্জিত করিয়া নৃত্যের সময় পরিধান করে। নৃত্যের সময় রমণীগণ পরস্পর পরস্পরের বাহুর মধ্যে নিজ হস্ত প্রবেশ করাইয়া দেয় ও এইভাবে সকলে মাদলের তালে তালে একসঙ্গে পা ফেলিয়া সারিবদ্ধ ভাবে গান গাহিতে গাহিতে আগাইয়া যায় ও পিছাইয়া আসে। এই নৃত্যকে তাহারা 'পাতা নৃত্য' বলে। একাদশীর দিবারাত্রি ও তাহার পরদিন এই নৃত্যগীত ও মাদলবাদ্য সমভাবে চলে। একদল পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে অপর দল আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে।

ইঁদ পূজা

পঞ্জিকাতে যে ইন্দ্রদ্বাদশী বা বামণদ্বাদশীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা তাহারই গ্রাম্য নামও বামনবেশী ভগবান এই তিথিতে বলিকে পাতালে পাঠাইয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ-সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার জঙ্গল মহলে অনেক জমিদারের বাড়িতে এই উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় ও কোনও কোনও স্থানে এদিন রাজার অভিষেকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুরে যে আমলি সন প্রচলিত এই দিন হইতে তাহার আরম্ভ। ঐ দিবস রাজার বাড়িতে পুণ্যাহ হয় ও প্রজারা রাজাকে তাঁহার প্রাপ্য খাজনা ও মান্য দিয়া আসে।

মেদিনীপুরের আদিম অধিবাসীগণের ইহা একটি পর্ব্বদিবস। তাহারা দলে দলে ঐ দিন ইঁদতলায় সমবেত হয় ও সারারাত্রিব্যাপী নৃত্যগীত করে। এই উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয় তাহা এইরূপ। বনে সর্ব্বোচ্চ একটি বৃক্ষের কাণ্ডকে কর্ত্তন করিয়া একটি মাঠে আনয়ন করা হয়। সেখানে তাহার গাত্রে নূতন বস্ত্র জড়াইয়া ও তাহার মস্তকে একটি বংশনির্ম্মিত ছাতা ও লৌহ-নির্ম্মিত বজ্র ইত্যাদি দিয়া শায়িত করিয়া রাখা হয়। উহার পাদদেশে পূজক পূজা করেন। একটি ছাগকে বলি দিয়া তাহার রক্ত বৃক্ষটির মূলে দিবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বাদ্যোদম সহকারে বৃক্ষটিকে উত্তোলন করা হয়। এইভাবে উহাকে সাত দিন রাখা হয় ও তাহার নিকট কুয়দিন ধরিয়া নানারূপ আমোদপ্রমোদ ও নৃত্যগীতের ব্যবস্থা হয়।

বড়াম ঠাকুর

ইনি পূর্ব্বে ছিলেন বনদেবী, মৃত্তিকানির্ম্মিত অশ্ব হস্তী ছিল ইহার বাহন ও পূজা পাইতেন কোনও এক বৃক্ষ-তলায়। সম্প্রতি সহরের ভদ্রপল্লীতে ইনি আসন পাতিতে সমর্থা হইয়াছেন। পৌষ সংক্রান্তির পরদিন ইহার দেখা পাইবেন এই সহরের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে স্থানে স্থানে ব্যাঘ্রারূঢ়া দ্বিভুজা মূর্ত্তিতে।

কলাই চণ্ডী

এইরূপ আরও দুই একটি দেবীর নাম উল্লেখ করিব। ইহার একজন হইতেছেন 'কলাই চণ্ডী'। সহর হইতে উত্তরে প্রায় মাইল চারেক দূরে এক খালের ধারে ইনি পাথরাকারে বিরাজিতা। স্থানীয় মাঝিগণ ইহার পূজারী। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে ইহার পূজা হয়। যে গাভী মৃতবৎসা বা যাহার দুধ শুকাইয়া বা কোনও কারণে নষ্ট হইয়া যায় এই দেবীর নিকট ক্ষীরভোগ মানসিক করিলে সেই দোষ দূর হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে বাড়ির গৃহিণী ঐ গাভীর দুগ্ধ, আতবচাল, গুড় পূজার উপকরণ আদি লইয়া বাদ্যসহকারে ঐ দেবীর ভোগ দিয়া আসেন। সহরে যাহাদের গাভী আছে তাহারা প্রায় প্রত্যেকে এই দেবীর বিষয় অবগত আছেন ও গাভী আসন্নপ্রসবা হইলে বিশেষ ভয় ও ভক্তি সহকারে এই দেবীর শরণ লইয়া থাকেন।

নেকড়াশিনি

এইরূপ আর একটি দেবী আছেন তাঁহার নাম 'নেকড়াশিনি'। কলাই চণ্ডীর ন্যায় ইহারও দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ। তবে ইহার রাজত্ব মানবসমাজে। কোনও রমণী মৃতবৎসা হইলে এই দেবীর স্থানে যাইয়া মানসিক করিয়া আসিতে হয়। পূজারী এই মানসিকের পর, হয় ঐ রমণীর মস্তকের চুল একগাছা অথবা তাহার পরিধানের শাড়ীর একখণ্ড একটি ইষ্টকের সহিত বাঁধিয়া দেবী যে বৃক্ষের তলায় অবস্থিতা, মন্ত্র পড়িয়া ঐ বৃক্ষের শাখায় ঐ নেকড়া বাঁধিয়া দেন। প্রসূতিকে দেবীর কতকগুলি বিষয় মানিয়া চলিতে বলা হয়। পরে সন্তান হইয়া রক্ষা পাইলে সন্তানসহ যাইয়া দেবীর পূজা দিতে হয়। বালক বা বালিকার মস্তকের কেশ মুণ্ডন করা হয় ও বৃক্ষস্থিত তাহার মাতার মস্তকের কেশ বা শাড়ীর অংশ ঐ সন্তানের দ্বারা মোচন করা হয়।

হিঁটালচণ্ডী বা ইটৈলচণ্ডী

এইবার আর একটি দেবীর শরণ লইয়া এই নীরস প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইষ্টকখণ্ডকে মেদিনীপুরের গ্রাম্য কথায় 'হিঁটাল' বলে। এই দেবীর পূজার উপচার হিঁটাল বলিয়া ইনি 'হিঁটালচণ্ডী' বলিয়া সাধারণে খ্যাতা। সহর হইতে পশ্চিম দিকে যে পাকা রাস্তা বোম্বে রোড নামে পরিচিত ইনি সেই রাস্তার ধারে এক বৃক্ষতলায় বিরাজমানা। ইহার সম্মুখ দিয়া যে ব্যক্তি হাঁটিয়া যায় বা কোন দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যায়, যাইবার সময় ঐ বৃক্ষের তলায় দেবীর মান্যস্বরূপ একটি ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ করিতে হয়। দেবী তাহাতেই সন্তুষ্টা। আর যিনি অহঙ্কারে দেবীর সম্মান না রাখিয়া সম্মুখ দিয়া শুধু শুধু চলিয়া যান পথে তাহার বিপদ অনিবার্য্য—ইহাই প্রবাদ। সাবধান। স্মরণ রাখিবেন, এই পথ অতিক্রম করিবার সময় দেবী যেন তাঁহার প্রাপ্য উপচার হইতে বঞ্চিত না হন।

—মাধবী

সম্পাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম
মেদিনীপুর জেলা-পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৪।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পল্লী-শ্রী

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

১ম বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৪৩ [১২শ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ

এই বৈশাখের ২৫এ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনআশী বছরে পদার্পণ করবেন। কবির এই জন্মদিনটি সমস্ত বাঙালীর নিকট আনন্দময় উৎসব-দিনের মত পবিত্র। যাঁর অপরূপ রস-সৃষ্টি বাংলার নর-নারীকে নূতন জগতের সন্ধান দিয়ে, তাদের সমস্ত চিত্তকে পুলক-বিহ্বল করেছে, সেই কবিগুরুর উদ্দেশে সমস্ত জাতি এই শুভ দিনটিতে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। বাংলার সৌভাগ্য, আজও রবীন্দ্রনাথের কবিমন এতটুকু নিস্তেজ হয় নি, তাঁর কর্ম্মক্ষমতা এখনও অটুট আছে।

রবীন্দ্রনাথ সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক। সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর নিত্য কল্যাণময় সাহচর্য্য কবি পেয়েছেন। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আনন্দময়, তাকেই তাঁর সৌন্দর্য্যপিপাসু মন পরম আদরে গ্রহণ করেছে। অসুন্দরের অন্তরালেও তিনি সুন্দরের সন্ধান করেছেন। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তিনি সত্যের জ্যোতি অম্লান রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই মতবাদকে না বুঝলে তাঁর সাহিত্যকেও সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে শাশ্বত আশার সুর, শান্তির বাণী ধ্বনিত হয়েছে। নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিজেকে হারানো তাঁর ধর্ম্ম নয়। দুঃখ কখনই তাঁকে একেবারে অভিভূত করতে পারে নি। "দুঃখ-সম্পদ্" কবিতাটিতে এই ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়—

"দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে-দুর্দ্দিনে চিত্ত উঠে ভরি',
দেহে মনে চতুর্দ্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেইক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হ'তে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে।"—পূরবী

ব্যক্তিগত জীবনই হোক অথবা সমগ্র মানবজীবনই হোক, তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবির মনে কোন সংশয় নেই।—

"রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"—বলাকা

বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের কল্যাণময় পরিণাম পরিষ্কাররূপে সূচিত করেছেন।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার যে যোগধারা আছে—সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন, এবং তাঁর কাব্য, সাহিত্য ও জীবনে এই সত্যই ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির সহিত, নিখিল বিশ্বের সহিত এই যে আত্মীয়তা-বোধ, এই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও কাব্যের সাধনা। প্রকৃতির গোপনতম কক্ষেও কবি বাল্যকাল থেকেই প্রবেশাধিকার পেয়েছেন—

"তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, ক'ব তা কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে!
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে॥"—উৎসর্গ

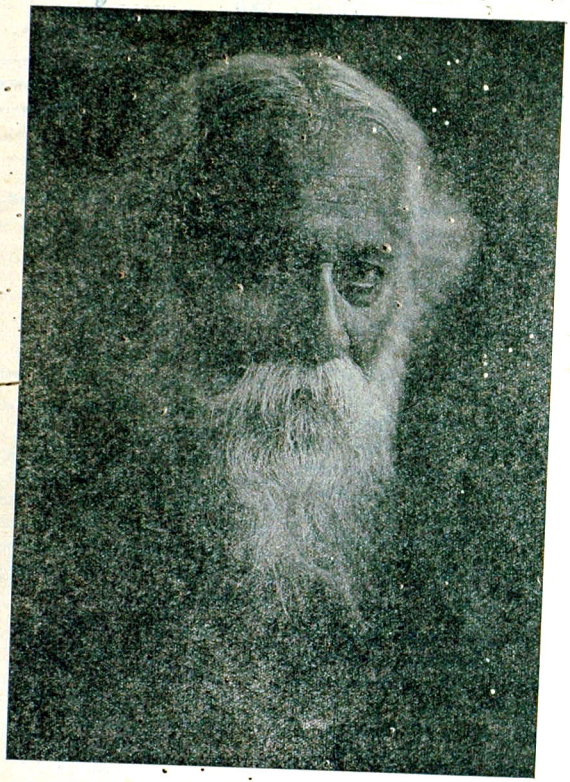

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

কিন্তু এইরূপে সৌন্দর্য্য ও সুষমার অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতির রহস্যসুধা পান ক'রেও কবি আপন হৃদয়ে তৃপ্ত হতে পারেন নি। তাই তাঁর কাব্যের ভিতর এক আকুলতার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে; সে সুর হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের সুর। রবীন্দ্রকাব্যে এই সসীম ও অসীমের লীলা বড় মধুর। কবি বলেছেন, যিনি অসীম, তিনিও আমাদের চান, তিনিও আমাদের সঙ্গে মিলনের জন্য নিত্য উৎসুক। জ্ঞানের আলোয় অসীমকে তেমন ক'রে দেখা যায় না, যেমন দেখা যায়—প্রেমের আলোয়। কবি বলেন, তাঁর দেবতার দান ফুরায় না; সকল আশা, সকল পাওয়া শেষ হ'লেও, দেবতার "অদৃশ্য দানে"র আশা ফুরাবে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবন থেকে চলার মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" হয়েছে এই গতির আহ্বানে, "প্রভাতউৎসব" গতিরই উৎসব; সমগ্র "বসুন্ধরা" কবি-চিত্তের বিহার-ভূমি। তাঁর বার্দ্ধক্য নেই, আজও তিনি গতির মাহাত্ম্য প্রচার করেন—"না চল্‌তে চাওয়া, প্রাণের কৃপণতা"।

জগৎকে ভালবেসেছেন ব'লে কবির মনে মানুষের সঙ্গ-লাভের জন্যও প্রবল আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রীতি স্বদেশ বা স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তিনি সকল দেশের সকল মানুষের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যের রূপ উপলব্ধি করেছেন। যেখানে মানুষ লাঞ্ছিত, অপমানিত সেখানেই তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনা তাঁর জীবন ও সাহিত্যের সাধনা। কবির বহু রচনায় এর পরিচয় পাওয়া যায়।—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর ?"—কল্পনা

"যে নিশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে
তারে আমি ধরেছি বাঁশীতে।
যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্ব্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।"—পরিশেষ

জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি। সংসারের অত্যন্ত পরিচিত জিনিসের মধ্যেও কবি-লোকাতীত আনন্দ পেয়েছেন এবং সেগুলিকে গানে গেঁথে অমর করেছেন। সংসারের শত আবর্জ্জনা ও বেদনার স্তূপের মধ্যেও কবি সহজভাবে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে দিন কাটিয়েছেন, কুৎসিতকে দূরে ফেলে এবং বাহির থেকে অমৃত আহরণ ক'রে।

এবার কবি-জীবনের আর একটি দিকের উল্লেখ করব। শিক্ষা, চিত্রকলা, শিল্প, লৌকিক আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা আজ বিশ্ববিদিত। তাঁর শান্তি ও শ্রী নিকেতনে যে নূতন শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন হয়েছে তার লক্ষ্য—সাহিত্য, দর্শন, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতির সঙ্গে কুটীর-শিল্প, কৃষি ইত্যাদির স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা এবং তার সাহায্যে জনসাধারণের আত্মনিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। বিশ্বভারতীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির মিলনতীর্থ রচনা করেছেন; শ্রী-নিকেতনে আদর্শ পল্লীসংগঠন-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-রচনার মধ্যে বড় আদর্শ প্রচার ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, জীবনের কাজের মধ্যে সেগুলিকে রূপ দিয়েছেন। পথের শত বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধা তাঁর কর্ম্মশক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে।

২৫এ বৈশাখকে স্মরণ ক'রে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি, রবীন্দ্রনাথ শতায়ু হয়ে তাঁর জীবন-শতদলের দলগুলি উন্মোচন করতে থাকুন। তাঁর চির-যৌবনের বাণী সমগ্র দেশের জড়তা দূর ক'রে তাকে নবীন কর্ম্মপ্রেরণা দিতে থাকুক।

পল্লীর কথা

চারুচন্দ্র সেন

পল্লীর ব্যথা ও পল্লীর কথা লইয়াই 'পল্লী-শ্রী'। পল্লী-মায়ের বুকে যে বেদনা আছে, তার বালুকর্দ্দমময় বক্ষের অন্তরালে, তার আম-কাঁঠাল, তাল-খর্জ্জুর, বাঁশ পরিশোভিত দিগন্তের মধ্যে যে অশ্রুর রূপ লুক্কায়িত আছে, তাহা অপসারিত করিয়া তাহার হতশ্রীর কারণ দেখাইয়া আবার তাকে গৌরবশালিনী করিবার জন্য 'পল্লী-শ্রী'র সচেষ্ট উদ্যম প্রশংসনীয়। আমরা পল্লী-মাকে ভুলিয়া গিয়াছি; তাহাকে অবহেলা করিয়া শহরের চাকচিক্যময় জাঁকজমকের মধ্যে আপনাদিগকে টানিয়া লইয়া নিত্য-নূতন ক্ষণিক আমোদ লাভের আশায় বিলাসিতার দাস হইয়া পড়িয়াছি। আমরা পল্লী ছাড়িয়া শহরে বাস করিতে আরম্ভ করিলাম; শিক্ষিত ও অর্থবান যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পল্লী ছাড়িয়া দিলেন, কেহ লোকলজ্জার ভয়ে কৌলিক পূজা-পার্ব্বণের ভার গোমস্তা বা পুরাতন ভৃত্যের উপর অর্পণ করিয়া পল্লীবাসী প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা শোষণ করিয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তি করিতে লাগিলেন। পল্লীর যে দীঘি ও পুষ্করিণীতে আবালবৃদ্ধ-বনিতা স্নান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিত, তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া বিনা পঙ্কোদ্ধারে মজিয়া গেল। বাবুদের যে আট-চালাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া তেলী খুড়া, নাপিত দাদা, কামার মামা, বাগ্‌দী মাসী প্রভৃতি লোকজন কাজে অকাজে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার আলাপ-আলোচনায় স্থানটি মুখর করিয়া তুলিত, তাহা চামচিকা ও বাদুড়ের বিশ্রামের স্থল হইয়া উঠিল। যে দেউল-প্রাঙ্গণে পল্লীর কুললক্ষ্মীগণ, বালিকা ও বধূগণ সন্ধ্যা-আরতি দেখিয়া আনত শিরে স্বামী ও পুত্রের কল্যাণ কামনা করিত, সেই স্থানে শিবাকুল নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। জমিদারের সহানুভূতি না পাইয়া একে একে অনেকেই গ্রামসংস্থানের জন্য পল্লী ত্যাগ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাগ্রেই অদৃশ্য হইলেন। তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইল, কুমোর কামার আদি শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের কাজ জুটিল না। কেবল কয়েক ঘর চাষী কয়েকটি হাল ও গরু লইয়া সামান্য পৈতৃক জমি আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল। পল্লী শ্রীহীন হইল।

পল্লীর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় 'পল্লী-শ্রী' নূতন বাণী শুনাইয়া আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতেছে। গণতন্ত্রের মধ্যে পল্লীবাসী সামান্য চাষীও যাহাতে তাহার স্থান খুঁজিয়া নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে পারে এবং দেশের কর্ম্মী হিসাবে মনুষ্যত্বের দাবিতে গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে, 'পল্লী-শ্রী' তাহার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

পল্লী-শ্রীর পুনরুদ্ধার করিতে আমাদিগকে অতীতের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা অতীতে কি ছিলাম, কি রত্নসম্ভারে অলঙ্কৃত হইয়া আমরা গৌরবশালী হইয়াছিলাম, তাহার ইতিবৃত্তও আমাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের পল্লীর ঠাকুর-দেবতার পূজা-পার্ব্বণ, ব্রতকথা, ছড়া, প্রবাদবাক্য, ঝুমুর গান, কবির গান, পাঁচালী, কথকতা প্রভৃতি আনন্দদায়ক কাহিনীগুলি উদ্ধার করিয়া দেশের লোকের মধ্যে উপস্থাপিত করিলে তাহার মধ্য হইতে আমরা বাঙালী, আমাদের নিজস্ব জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। অতীত কাহিনী ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মরাজির সংমিশ্রণে পল্লী-মায়ের দৈন্যকাতর বদনে আবার হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা মেদিনীপুরে প্রচলিত কয়েকটি পার্ব্বণ-সম্বন্ধে ছড়া ও কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

(১) কুলকুলতি

(সংগৃহীত ছড়া)

কার্ত্তিক মাসে কুলকুলতির গান গাওয়া হয়। গোময়-লিপ্ত প্রাঙ্গণে বালিকাগণ একটি তুলসীগাছ রাখিয়া তাহার দুই পার্শ্বে সারি দিয়া সাতটি সাতটি চৌদ্দটি মাটির প্রদীপ

সাজাইয়া দেয়, সন্ধ্যাকালে সেই প্রদীপ তৈল ও বাতি দিয়া জ্বালাইয়া তাহার দ্বারা তুলসীগাছ বরণ করা হয়। প্রতিদিন নূতন প্রদীপ দিতে হয় এবং ধান দূর্ব্বা ও ফুল দিয়া পূজা করা হয়।

কুলকুলতি ফুলবতী।
সাত ঘাটে সাত বাতি॥
অরুণ ঠাকুর বরণে।
ফুল ফুটেছে চুরণে॥
এ ফুলটি তুলে যে।
সাত ভায়ের বোন সে॥
সাবিত্রী সমান সে॥
কার্ত্তিক মাসে তুলব রাসে।
ধান দূর্ব্বায় নমঃ॥

(২) পৃথিনীপূজা

(সংগৃহীত ছড়া)

পৃথিম পূজি পদ্মপাতে।
শঙ্খ চক্র লয়ে হাতে॥
খাব চিনি মাখন ননী।
মরলে হব রাজার রাণী॥
খাট পালঙ্কে হব সুখী।
সদাই থাকব অনুরাগী॥
এক গলা গঙ্গার জলে।
মরি যেন স্বোয়ামীর কোলে॥

বৈশাখ মাসে এই পূজার অনুষ্ঠান করা হয়।

(৩) ইতুপূজা

(সংগৃহীত ছড়া)

কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি হইতে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ইতুঠাকুরাণীর পূজা হয়। একটি মাটির মালসাকে গোময় ও মাটি দিয়া ভর্ত্তি করিয়া তাহাতে গাঁদাফুল সংযুক্ত কয়েকটি কাঠি পুঁতিয়া দিতে হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বালিকাগণ নিম্নলিখিত ছড়া বলিয়া ইতুর পূজা ও বরণ করেন। মাসের শেষে ঠাকুরাণীর বিসর্জ্জন হয়।

কার্ত্তিক গেল অঘ্রাণ এল।
ইতুঠাকুরাণীর পাটা বসল॥
এস ইতু দাও বর।
ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর॥
শুষনি কলমী লহলহ করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে॥
মারুক পক্ষী শুকাক বিল।
সোনার কৌটা রূপার খিল॥
স্বোয়ামীর কোলে দুধে ভাতে।
মরি যেন এয়োস্ত্রীতে॥

বিদ্যাসাগর-বাণী-ভবন

ঝাড়গ্রামে শাখা-আশ্রমের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা

গত ১৬ই বৈশাখ কলিকাতা নারী-শিক্ষা-সমিতির উদ্যোগে বিদ্যাসাগর-বাণী-ভবন-আশ্রমের ঝাড়গ্রাম-শাখার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সহসভানেত্রী মিসেস এস. আর. দাশ, সম্পাদিকা লেডি অবলা বসু ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষ, মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী চিরপ্রভা সেন এবং মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। ঝাড়গ্রামের বিখ্যাতনামা, উদারহৃদয় জমিদার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সেন আশ্রম-গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন।

পল্লীগ্রামের আবহাওয়ায় বাণী-ভবনের শাখা-স্থাপনের

প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ ক'রে লেডি অবলা বসু নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন—

"আজ কুড়ি বৎসর ধ'রে নারী-শিক্ষা-সমিতি বাংলার মেয়েদের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে কার্য্য ক'রে যাচ্ছে। নিরুপায় পরাধীন দেশকে শিক্ষাদীক্ষায় বড় ক'রে তুলতে না পারলে দেশের সমগ্র সমস্যাই অমীমাংসিত থেকে যাবে। দেশ নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে যদি না পারে, তবে দেশ দাঁড়াবে কোন্ ভিত্তির উপর? তাই দেশের সম্মুখে সকলের প্রথম ও বড় সমস্যা দেশকে শিক্ষার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা। দেশ তো আর বাস্তবহীন কিছু নয়। প্রতি মানবকে নিয়ে প্রতি মানবের মঙ্গলবিধানের উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। প্রতিটি মানবের ভবিষ্যৎ তার গৃহ-পরিবারের আবহাওয়ায় আত্মীয়-স্বজনের, বিশেষভাবে মায়ের চরিত্র-প্রভাবের মধ্য দিয়েই গ'ড়ে ওঠে। এজন্যে যে দেশ মেয়েদের শিক্ষাকে অবহেলা করে, যে দেশ নারীশক্তিকে দেশজীবনে কার্য্যকরী হয়ে উঠতে দেয় না, সে দেশ কখনও বড় হয়ে উঠতে পারে না। অতীতের কথায় না গিয়ে এ কথা বেশ বলা যায় যে, বহুদিন ধ'রে ভারতের এই নারীশক্তি অবজ্ঞাত। নারী-শিক্ষা-সমিতি এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে দেশের দৃষ্টিকে এ বিষয়ে সজাগ ক'রে তুলতে চান। এই মঙ্গল উদ্দেশ্য নিয়ে নারী-শিক্ষা-সমিতি, 'বিদ্যাসাগর-বিধবা-আশ্রম—বাণী-ভবন', 'মহিলা-শিল্প-ভবন' গ্রামের প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় ও অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত বিধবাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা স্বাবলম্বী জীবনযাপনের যোগ্য ক'রে দিয়ে প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত ক'রে বাংলার ভবিষ্যৎ মেয়েদের গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী গ'ড়ে তোলবার উদ্দেশ্যই এই সমিতির প্রধান মুখ্য কার্য্য।

দুঃস্থ পরিবারের বধূরা, কন্যারা, বিধবারা যাতে গৃহশিল্প শিক্ষা ক'রে নিজ নিজ পরিবারের আর্থিক অনটনের তীব্রতা কিছু পরিমাণে লাঘব ক'রে শিক্ষা পেতে পারে এবং আর্থিক জীবনেও তারা উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে—এই বিশ্বাস, সাহস ও উৎসাহ দিয়ে তাদের মনটিকে আত্মনির্ভরশীল করার আদর্শেই মহিলা-শিল্প-ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মহিলাদের, বিশেষভাবে গ্রামের বয়স্কা মহিলাদের, নিরক্ষরতা দূর করার জন্যই অতঃপরু স্ত্রীশিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের একান্ত-প্রয়োজনীয় গৃহশিল্প শিখাইবার ও মোটামুটি maternity ও nursing শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ভাবে নানা দিক থেকে দেশের নারীদের ও বালিকাদের শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হয়ে বারবারই মনে হয়েছে যে, বাণী-ভবন আশ্রমটিকে কলকাতার বাইরে কোথাও স্থানান্তরিত ক'রে, পল্লীগ্রামের আবহাওয়ায় সম্পূর্ণরূপে পল্লীজীবন যাপনের উপযোগী শিক্ষা ও আদর্শে বধূদের যদি গ'ড়ে তুলতে পারি, তবেই সমিতির কার্য্যে সার্থকতা যথার্থভাবে সফল করা যেতে পারে; কিন্তু নানা কারণে সে পরিকল্পনা এতদিন কার্য্যে পরিণত হতে পারে নি। সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে এই জেলার উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন, আই. সি. এস. মহোদয়ের প্রচেষ্টায় এবং দেশবাসীর উৎসাহে বহু সদনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যনামের সঙ্গে সংযুক্ত বাণী-ভবনের একটি শাখা মেদিনীপুরে স্থাপিত করা যায় কি না এবং বিধবাগণের দুঃখ দূর করতে যে মহাত্মা আজীবন চেষ্টা করেছেন, সেই মহাত্মার জেলায় বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁরই সেই আরব্ধ কর্ম্ম সফল ক'রে উঠতে দেশবাসীর উৎসাহ লাভ করা যায় কি না—এই বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র লেখালেখি হয়। বলা বাহুল্য, ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় এবং মেদিনীপুরের জেলাবোর্ড এই ব্রতকর্ম্মে তাঁদের আন্তরিক সম্মতি ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ঝাড়গ্রামের বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব সমিতিকে ভূমি ও অর্থ নানা বিষয়ে সাহায্য করতে অগ্রসর হন। তাঁদের সকলের শুভ প্রচেষ্টায় ঝাড়গ্রামে বিদ্যাসাগর-বাণী-ভবনের শাখার ভিত্তি-স্থাপন উৎসবে আজ আমরা সকলে মিলিত হয়েছি। আমি রাজা সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও উপস্থিত ভদ্র-মণ্ডলীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।"

অতঃপর অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন—

"শ্রীযুক্তা বসু ও সমবেত বন্ধুগণ,

আজকের এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্যের ভার আমার উপর ন্যস্ত ক'রে বিদ্যাসাগর-বাণী-ভবনের কর্ত্তৃপক্ষ আমায় যে সম্মান দেখিয়েছেন, তজ্জন্য তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যোগ্যতর কোন ব্যক্তিকে এই সম্মানিত পদে বরণ করলে অধিকতর সুখের বিষয় হ'ত। কিন্তু মায়ের হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে, যিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে গ'ড়ে তুলেছেন, সেই মহীয়সী লেডি বসুর আহ্বান যখন পেলাম, তখন তা নতমস্তকে গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না; এ কর্ত্তব্য আমার কাছে এতই পবিত্র বোধ হ'ল যে, লৌকিক বিনয় প্রকাশেরও কোন অবকাশ খুঁজে পেলাম না। বিদ্যাসাগর-বাণী-ভবনের প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবার সুযোগ লাভে আমি আপনাকে ধন্য মনে করছি এবং এই পুণ্যকার্য্যে যদি কিয়ৎ পরিমাণেও সাহায্য করতে পারি, তা হ'লে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব

এ অতি সত্য কথা যে, বীরপূজা মানব-হৃদয়ের মহত্তম প্রবৃত্তি, এবং দেশের মহাপুরুষদের সম্মান প্রদর্শন ক'রে জাতি নিজেকে সম্মানিত করে। কিন্তু লজ্জার বিষয়—যে মহাপুরুষকে নিয়ে মেদিনীপুরের গৌরব, সেই পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর তাঁর জন্মভূমিতেই অবহেলিত। আমরা যে সত্য সত্যই আত্মবিস্মৃত জাতি, এই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন এই জেলার শাসনভার গ্রহণ ক'রেই আমাদের এই কলঙ্ক অপনোদনের প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ আজ একটি পুণ্যতীর্থে পরিণত।

মেদিনীপুর শহরে শ্রীযুক্ত সেনের উৎসাহে ও পরিচালনাধীনে যে প্রাসাদোপম বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হচ্ছে, তা সেই মহাপুরুষের নামেরই যোগ্য চিরস্থায়ী কীর্ত্তি। শ্রীযুক্ত সেনের চেষ্টায় বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর যে প্রামাণ্য ও শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তা বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আজ যে এখানে বিদ্যাসাগর-বাণী-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ল, এও শ্রীযুক্ত সেনের কল্পনাপ্রসূত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি, আমাদের কর্ত্তব্যের ঋণ লাঘব করবার সুবিধা দান ক'রে শ্রীযুক্ত সেন আমাদের সকলের সত্যিকার কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন।

আপনারা সকলে জানেন যে, আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা কিরূপ শোচনীয়। বড় দুঃখে আমাদের কবি গেয়েছিলেন—"না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না"। কিন্তু বহুদিন যাবৎ এদেশে

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন চেষ্টাই হয় নি। গত ১৯১৯ সালে মাননীয়া লেডি বসুর অনলস অধ্যবসায়ের ফলে, কলিকাতায় 'নারী-শিক্ষা-সমিতি' স্থাপিত হয়। বাংলার সমগ্র নারীজাতি, যাতে সুশিক্ষা লাভ ক'রে জীবনের পথে পুরুষের যথার্থ জীবনসঙ্গিনী হতে পারে, সুমাতা ও সুগৃহিণী হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে সোনার সংসার প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং প্রয়োজন হ'লে কঠোর জীবনসংগ্রামে স্বাধীন সম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন ক'রে স্বাবলম্বী হতে পারে, এই সকল মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নারী-শিক্ষা-সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

কিন্তু প্রথমত প্রকৃত গুণী নারী-শিক্ষয়িত্রীর অভাবে তাঁদের প্রচেষ্টা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নি। শুভ-কার্য্যের পথ বিঘ্নসঙ্কুল হ'লেও আন্তরিকতা ও সুবুদ্ধি কার্য্যকরী ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়।

ঝাড়গ্রামরাজ শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব এই বাণী-ভবন নির্ম্মাণের জন্য প্রায় ২৫ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও অর্থসাহায্য দিতে সম্মত হওয়ায় ঝাড়গ্রামে বাণী-ভবন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। মেদিনীপুর-জেলা-বোর্ডও বাণী-ভবন নির্ম্মাণের জন্য অর্থসাহায্য দিয়ে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।

অতঃপর জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বাণী-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মুরগী-পালন

তপনবিলাস মুখোপাধ্যায়

অল্প মূলধনে যে সকল ব্যবসায়ে লাভবান হওয়া যায়, তাহার মধ্যে মুরগী-পালন অন্যতম। বাংলা দেশে সাধারণত মুরগী-ব্যবসায়কে লোকে অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া থাকে, কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকায় লোকে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার ডিম উৎপন্ন করে। আমাদের দেশেও উন্নত প্রণালীতে মুরগী-পালন করিলে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। যে বিধিব্যবস্থায় মুরগী পুষিয়া লাভ করা যাইতে পারে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা হইল।

বাসস্থান—মুরগীর গৃহের জন্য এমন একটি জায়গা ঠিক করিতে হইবে, যেখানে বৃষ্টির জল দাঁড়াইতে না পারে। এ জায়গাটির মাটি বেলে বা কাঁকরময় হইলে ভাল হয়। দুপুর রোদ ও গ্রীষ্মে যাহাতে স্থানটি শীতল থাকে সেজন্য কয়েকটি বড় গাছ থাকা প্রয়োজন। উপযুক্ত ছায়ার ব্যবস্থা না থাকিলে পাখীগুলি শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়িবে এবং মরিয়া যাইবে। গাছ না থাকিলে, খড়ের ছাউনি দিয়া একটি চালা করিতে হইবে। এই চালাটি মুরগীর ঘরের পূর্ব্বদিকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১০ ফিট এবং উচ্চতায় ৮ ফিট—এরূপ আয়তনের একটি ঘরে ১০টি মুরগী অনায়াসে থাকিতে পারে। মুরগীর ঘরের দক্ষিণ দিক খোলা রাখিতে হইবে, যাহাতে ঘরে রীতিমত বাতাস খেলিতে পারে। শীতের দিনে উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক বন্ধ রাখিতে হইবে, যাহাতে অত্যধিক ঠাণ্ডা না লাগে। ঘরের মেঝেটি পাকা হইলেই ভাল হয়। মেঝের উপর ৩ ইঞ্চি পরিমাণ শুকনা মাটি কিংবা মোটা দানার বালি ছড়াইয়া দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে কেরোসিন তৈল কিংবা ফিনাইল মাটিতে ছিটাইতে হয়। প্রত্যহ ভোরে বালির উপরকার ময়লাগুলি ফেলিয়া দিতে হয় এবং প্রতি ৩ সপ্তাহ কিংবা ১ মাস অন্তর বালি বদলাইয়া দিতে হয়। ঘরের কোণে একটি মাটির গামলায় ছাই কিংবা খড় দিয়া ভরিয়া রাখিলে মুরগীগুলি সেখানেই ডিম দিবে। ডিম দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের বন্দোবস্ত না থাকিলে মুরগীগুলি যেখানে-সেখানে ডিম দিবে এবং তাহাতে অনেক ডিম নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যাঁহাদের এ ভাবে ঘর করিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহারা দৈর্ঘ্যে ৬ ফিট, প্রস্থে ৪ ফিট ও উচ্চতায় ৪ ফিট, এরূপ আয়তনের কাঠের বাক্স প্রস্তুত করাইয়া উহার উপরিভাগ ও সম্মুখের দিকে জালের বেড়া দিয়া লইবেন। এরূপ বাক্সে ১টি মোরগ ও ৫।৬টি মুরগী থাকিতে পারে। বাক্সটি ছোট চালার নীচে বা গৃহের বারান্দায় রাখা যাইতে পারে। বাক্সের মাঝখানে মেঝে হইতে ৬" বা ১' ফুট উপরে আড়াআড়ি-ভাবে একটি কাঠের দাঁড় রাখিলে ভাল হয়।

মুরগীর খাদ্য—বাংলায় মুরগীকে নির্দ্দিষ্টভাবে খাওয়াইবার প্রথা নাই বলিলেই হয়। অনেকের ধারণা, ইহাদের চরিতে দিলেই খাইবার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু ডিমের ওজন ও মুরগীর আকার বাড়াইতে হইলে, তাহাদের খাদ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ভাল জাতের মুরগীর বাচ্চাকে জন্মাইবার পর হইতে ডিম দিবার সময় পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত তালিকা অনুসারে খাওয়ানো উচিত। ডিম হইতে বাহির হইবার পর ৩৬ হইতে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মুরগীর বাচ্চাকে কিছু খাইতে দিতে নাই। এই সময়ের পর ইহাদের সম্মুখে কিছু মোটা পরিষ্কার বালি খাইবার জন্য রাখিতে হয়। নিম্নলিখিত খাদ্যের সংমিশ্রণকে ভিজাইয়া অর্দ্ধশুষ্ক অবস্থায় খাওয়াইলে সুফল পাওয়া যায়। এই সময় অতীত হইলে খাইবার পাত্রগুলি সরাইয়া লওয়া উচিত। ভুক্তাবশিষ্ট যাহাতে মাটিতে পড়িয়া না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

মুরগীকে প্রত্যহ কিছু কিছু কাঁচা সব্জি দেওয়া উচিত। লেটুসের পাতা ছোট ছোট করিয়া কুচাইয়া বাচ্চাকে খাওয়াইলে ভাল হয়। এক মাস পর্য্যন্ত ইহা দেওয়া চলে। ইহার পর হইতে সব্জিগুলিকে এমন ভাবে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়, যাহাতে মুরগীর বাচ্চাগুলি ঠোকরাইয়া তাহা খাইতে পারে। বিকালে খাদ্যের সঙ্গে বাঁধাকপির পাতা কুচাইয়া দেওয়া যায়। আট হইতে বারো সপ্তাহের বাচ্চাকে মাটা-তোলা বা টানা দুধ দেওয়া উচিত।

মুরগীর ঘরে পরিষ্কার মিটকা জল প্রচুর পরিমাণে রাখিতে হয়, যেন প্রত্যেক মুরগী ইচ্ছামত তাহা খাইতে পারে। জল ছাড়া মুরগীর আহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে গুঁড়া কাঠকয়লা, মোটা বালি ও ঝিনুক ভাঙা রাখিতে হয়।

খাদ্যের নাম	১৪ দিন পর্য্যন্ত (ক)	২ হইতে ৮ সপ্তাহ (খ)	৮ হইতে ১৬ সপ্তাহ (গ)	১৬ হইতে ৩২ সপ্তাহ (ঘ)
চাউলের খুদ	৩০ ভাগ	৩০ ভাগ	৩০ ভাগ	৩০ ভাগ
গম	৩০ "	২০ "	২০ "	২০ "
গমের ভুষি	২০ "	২০ "	২০ "	১৫ "
চাউল সিদ্ধ	২০ "	১০ "	...	...
ভুট্টার দানা ভাঙা	...	১৬ "	১৬ "	১৫ "
ডাল	...	৪ "	৪ "	৫ "
লবণ	...	শতকরা ৩ "	শতকরা ৩ "	শতকরা ৩ "
চিনা বাদামের খৈল	...	...	৫ "	৫ "
মাংস সিদ্ধ	...	...	৫ "	৫ "

এই খাদ্য (ক) চিহ্নিত বয়সের বাচ্চাকে দিনের বেলায় তিন ঘণ্টা অন্তর, (খ) চিহ্নিত বয়সের বাচ্চাকে দিনের বেলায় চার ঘণ্টা অন্তর এবং (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত বয়সের মুরগীকে অপরাহ্ণে একবার দিতে হয়। আধ ঘণ্টার ভিতর যাহা খাইতে পারে এরূপ পরিমাণ খাদ্য দিতে হয়।

মেদিনীপুর জেলায় সালবনি থানার অন্তর্গত ভীমপুর ও রাঙামাটিয়া গ্রাম দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া গভর্মেণ্ট হইতে ২০টি উৎকৃষ্ট জাতের মোরগ বিতরণ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশী মোরগের উচ্ছেদ করা হইয়াছে। ভাল জাতের মোরগের সংমিশ্রণে দেশী মুরগীরা নানা ভাবে

উন্নতি লাভ করিবে। এই প্রণালীতে মুরগীর আকার ও ডিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং গ্রামবাসীরা মুরগী-পালনের দ্বারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে।

মৃৎশিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র—এগরা

নীহারকুমার রায়

মৃৎশিল্প বলিতে আমরা সাধারণত কুমারের হাঁড়ি, কলসী, খুরি ইত্যাদিই বুঝি। কিন্তু চীনামাটি-নির্ম্মিত সমুদয় দ্রব্যাদি এবং সাধারণ এঁটেল মাটির উপর glaze করা জিনিসপত্র—এমন কি, ইট, টালি ইত্যাদি জিনিসগুলিও মৃৎশিল্পের অন্তর্গত। কাজেই দেখা যাইতেছে, মৃৎশিল্পের সীমা বহুদূরবিস্তৃত।

নিম্নলিখিত উপায়ে সাধারণত মাটির জিনিস তৈয়ারি করা হয় :—

১। চাকের সাহায্যে (By throwing on the potter's wheel)

২। চাপ দিয়া (By the method of pressing)

৩। ঢালাই করিয়া (By the method of casting)

উপরোক্ত যে কোন উপায়ে তৈয়ারি জিনিস হইতে হাওয়ায় জলটা টানিয়া লইলে, turning instrument দ্বারা জিনিসগুলিকে কাটিয়া এবং জল-ন্যাকড়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া লইয়া জিনিসগুলিকে আবশ্যকমত আকার (proper shape) দেওয়া হয়। জিনিসগুলি যখন ভালরূপে শুকাইয়া যায়, তখন সামান্য তাপে ঐগুলিকে পোড়াইতে হয়। এই প্রথম পোড়ানো জিনিসগুলিকে Biscuit বলে এবং এই প্রথম পোড়ার নাম Biscuit firing.

'বিস্কুট'(biscuit)গুলিকে তৎপরে Glaze paste-এর ভিতর ডুবাইয়া দ্বিতীয় বার অধিক তাপে পোড়াইতে হয়। দ্বিতীয় বার পোড়ানো হইয়া গেলেই উজ্জ্বল, চক্‌চকে finished product বাহির হয়। এই দ্বিতীয় বারের পোড়ানোকে Glaze firing বলা হয়। Lead oxide, silica, china clay, common clay ও colouring oxideএর সংমিশ্রণে এঁটেল মাটির glaze তৈয়ার করিতে হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন রঙের জন্য ভিন্ন ভিন্ন colouring oxide ব্যবহার করিতে হয়।

এগরা কেন্দ্রে সাধারণত এঁটেল মাটির উপর glaze করা জিনিসই তৈয়ার করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার কারণ এই যে, চীনামাটির জিনিস তৈয়ার করার চেয়ে এঁটেল মাটির জিনিস করিতে অনেক কম মূলধন লাগে। এঁটেল মাটির গ্লেজ করা জিনিস করিতে আবশ্যক কাঁচামাল এঁটেল মাটি আমাদের দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু চীনামাটির জিনিস প্রস্তুত করিতে হইলে প্রায় সমস্ত কাঁচামালই ক্রয় করিয়া আনিতে হয়; উপরন্তু এঁটেল মাটির কারখানার তুলনায় অনেক বেশি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা আবশ্যক হয়।

কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত এগরা কেন্দ্রের কার্য্য গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ করা হয়। বর্ত্তমানে এখানে ১২টি ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। আগামী আগস্ট মাসে ইহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে।

তমলুক মহকুমায় নরঘাট-পল্লী-সংস্কার-সমিতির বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

(ক) সূচনা

বঙ্গীয় গভর্মেণ্ট প্রাপ্তবয়স্কগণের শিক্ষা সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা করেন, তদনুসারে গত ১৯৩৭ সালের শেষ ভাগে বয়স্ক-শিক্ষা-প্রচারের উদ্দেশ্যে তমলুক মহকুমার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানার এলাকায় নর, চাক্‌নান, বরোজ ও কদমতলা গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ

করা হয়। এই চারিটি কেন্দ্রের কার্য্য-পরিচালনা সম্বন্ধে তদানীন্তন মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারই উপদেশে গত ১৯৩৮ সালের ২৪এ জানুয়ারি একটি নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে ঐ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, বর্ত্তমান মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. কে. আচার্য্য, আই. সি. এস. মহোদয়ের অনুপ্রেরণায় পল্লী-সংস্কার-সমিতি স্থাপন করিয়া মাননীয় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের পল্লী-উন্নয়ন-পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করা হয়। বর্ত্তমানে নর, চাক্‌নান, বরোজ, কদমতলা, চক পুরুলিয়া ও কোটবাড় এই ছয়টি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সমিতির কার্য্য চলিতেছে।

(খ) জলসরবরাহ ও পথ-নির্ম্মাণ

নরঘাটের নলকূপটি ১৯৩৭ সালের প্রথম হইতে ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া ছিল। পল্লীবাসীর নিকট হইতে দুই শত টাকা চাঁদা তুলিয়া এবং গভর্মেণ্টের অর্থসাহায্য লইয়া এই নলকূপটির সংস্কার করা হইয়াছে। ইহাতে নিকটবর্ত্তী পাঁচ সাতখানি গ্রামের অধিবাসীর ও পথিকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নরগ্রামে ১৮০০ হাত দীর্ঘ একটি গ্রামপথের সংস্কার করা হইয়াছে। গ্রামে যে ৮৭ ঘর গৃহস্থ আছেন, তাঁহারা এই কার্য্যের জন্য প্রত্যেক ঘর হইতে একজন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এই স্বেচ্ছাসেবকগণ ৪৭টি ঝুড়ি ও ৪০টি কোদাল লইয়া কার্য্য করিয়াছে। গ্রামবাসীর স্বেচ্ছাশ্রমে একটি জল-নিকাশী খাল কাটা হইয়াছে—ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ হাত। চাক্‌নান কেন্দ্রে ১২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ১১০০ হাত দীর্ঘ একটি গ্রামপথের সংস্কার করিয়াছে।

(গ) স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ

নরগ্রামে ৪টি পুকুরের জল সেচন করিয়া ফেলা হইয়াছে। ৫টি পুকুরের সংস্কার করা হইয়াছে। চক পুরুলিয়া গ্রামে ৪টি পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে। রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে গ্রামবাসীকে মাঝে মাঝে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। পল্লী-সংস্কার-সমিতির গৃহে ও বিভিন্ন কেন্দ্রে খাদ্য ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

গত মে মাসে নরঘাটে কলেরার প্রকোপ হইলে স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টারের সাহায্যে ৮০ জন লোককে টিকা দেওয়া হইয়াছিল। বিগত শিবরাত্রি মেলার সময় রাধাগঞ্জ বাজারে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

(ঘ) কৃষির উন্নতি

মহিষাদলের সার্কেল অফিসারের নিকট হইতে দেড় মণ পাটনাই ধান্যের বীজ আনাইয়া নরগ্রামে বিতরণ করা হইয়াছিল। ধান্যের ফলন বিঘা প্রতি ১০ মণ হইতে ১৩ মণ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। মহিষাদলের Assistant Live Stock officerএর নিকট হইতে নেপিয়ার ঘাসের চারা আনাইয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে বিতরণ করা হইয়াছে। নরগ্রামে খাসমহালের যে পুকুরটি রহিয়াছে, তাহা সংলগ্ন জমি সমেত খাসমহাল হইতে জমা লইয়া সমবায়-প্রথায় একটি Agricultural Society স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। চাষ, গো-পালন, পশুখাদ্য, কার্পাস ও চিনাবাদামের চাষ ইত্যাদি বিষয় জনসাধারণকে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ঙ) শিক্ষা ও মানসিক আমোদ

নরঘাট নৈশ-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সহস্তে নৈশ-বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রতিদিন ৫।৬টি ছাত্র এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত এবং সমিতি ইহাদিগকে 'আলু-ভাতে ভাত' খাইতে দিতেন। যাহারা নিতান্ত নিঃস্ব তাহাদিগকে সামান্য অর্থসাহায্য দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যালয়-গৃহের চালটি ছাওয়ার জন্য ৪।৫ কাহন বিচালি সংগ্রহ করা হয় এবং জানালা, কপাট ইত্যাদির জন্য তাল, নিম ইত্যাদি বৃক্ষ সংগ্রহ করা হয়। বর্ত্তমানে ছাত্র-সংখ্যা হিন্দু মুসলমান লইয়া ৩৮। ছাত্রদের বয়স ২০ হইতে ৪০ বৎসর। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় গ্রামবাসীর নিকট হইতে মাসিক চাউল পাওয়া গিয়াছে। রাধাগঞ্জ বাজারের বাঙালী ও অবাঙালী ব্যবসায়িগণ লণ্ঠন, কেরোসিন, বই, স্লেট, পেন্সিল, মাদুর, ব্ল্যাকবোর্ড প্রভৃতি দান করিয়া বিদ্যালয়কে সাহায্য করিয়াছেন। কোটবাড় কেন্দ্রে নৈশ-বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৭০। বরোজগ্রামে স্থানীয় গ্রামবাসীর প্রচেষ্টায় একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ১০০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। বিদ্যালয়ের জন্য ভিক্ষাদ্বারা ৩৫ বিঘা জমি

সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে প্রায় ২২৫৲ মজুত আছে। বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণও সম্পন্ন হইয়াছে। চক পুরুলিয়া গ্রামে অনুন্নত বালকগণের জন্য একটি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

প্রাপ্তবয়স্ক পল্লীবাসীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে নরঘাটে একটি পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। পাঠাগারটির নাম দেওয়া হইয়াছে—ইউনিয়ন লাইব্রেরি। ভ্রাম্যমান পাঠাগারের বাক্স নিয়মিত আসায় জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে।

নরঘাটে একটি ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সভ্যসংখ্যা ৩৭। এখানে তিনখানি দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে লওয়া হয়। ক্লাবের নাট্যবিভাগ অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। প্রতি মাসে একবার করিয়া গান-বাজনার আসর করা হয়।

(ঘ) সঙ্গীত

নরঘাটে একটি সসীম দায়িত্ববিশিষ্ট (Limited Liability) যৌথ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অংশীদারের সংখ্যা ৫৯; Paid up capital ৪২৫৲; ২৬৯০৲ টাকা দাদন দেওয়া হইয়াছে; ৭৩৩৷০ কর্জ্জ পরিশোধ করা হইয়াছে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ৫০০৲ টাকার উপর কর্জ্জ পরিশোধ করা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হওয়ায় পল্লীবাসীর বিশেষ উপকার হইয়াছে। ইহার সাহায্যে বেকার যুবকগণ ১৩টি দোকান খুলিতে সমর্থ হইয়াছেন; কয়েকটি পুরাতন দোকানও নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কর্জ্জ দেওয়ার যে 'টেব্‌ল' (Table) প্রস্তুত করা হইয়াছে তদনুসারে কর্জ্জ দেওয়া হয়। ১০০৲ কর্জ্জ থাকিলে মাসিক ৮।৯৲ হিসাবে শোধ করিলে বৎসরে মাত্র ৭৲ সুদ দিতে হয়। এরূপ ব্যাঙ্কের প্রতি জনসাধারণের অধিকতর আগ্রহ দেখা যায়।

(ছ) খেলাধুলা ও শারীরিক আমোদ

নরঘাট কেন্দ্রে একটি ব্যায়াম-আগার স্থাপন করিয়া ডন-বৈঠক, মুগুর প্রভৃতি ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফুটবল, ভলিবল, ব্যাড্‌মিণ্টন খেলারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বৎসর হইতে একটি ফুটবল শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হইবে।

আয়-ব্যয়

গত বৎসর সমিতির আয় মোট ২২৬৶৬ পাই। ইহার মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যাদির মূল্য এবং জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত ৫০৲। তমলুক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ১৫৲ এবং স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ১০৲ টাকা অর্থসাহায্য ধরা হইয়াছে। উক্ত সমস্ত অর্থই গৃহ-নির্ম্মাণ ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নরঘাট গ্রামের নলকূপের জন্য যে ২০০৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা তমলুক সব-ট্রেজারিতে জমা আছে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

মহিষাদলের সার্কেল অফিসারের পরিচালনায় সমিতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। নরঘাট কেন্দ্রে ডাঃ বরেন্দ্রনাথ চন্দ্র, সতীশচন্দ্র মাইতি, পরেশচন্দ্র মাইতি, চাক্‌নান কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ জানা (প্রেসিডেণ্ট নরঘাট ইউনিয়ন বোর্ড) ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ জানা, বরোজ কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত নীলমণি মান্না, হরিপদ দাস, বঙ্কিমবিহারী দাস, চক পুরুলিয়া কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত সদানন্দ আড়ি, ভৈরবচন্দ্র মাইতি, কোটবাড় কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর রায়, কুমারনারায়ণ জানা (প্রেসিডেণ্ট, ১নং ইউনিয়ন), নরগ্রাম কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মাইতি, কদমতলা কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। স্থানাভাবে সকল কর্ম্মীর নাম না দেওয়া হইলেও তাঁহাদের কাহারও দান সামান্য নহে। বর্ষে বর্ষে সকলের সাহায্য ও প্রীতি লাভ করিয়া সমিতি ধন্য হউক। *

শ্রীজয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, নরঘাট-পল্লী-সংস্কার-সমিতি

* গত ২৬এ এপ্রিল, মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

সম্পাদক, 'পল্লী-শ্রী'

ভারতের কৃষকের দুরবস্থা ও তাহার কারণ

এদেশে কৃষক যেরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশার মধ্যে দিন কাটায়, তাহা সকলেই জানেন। অধিকাংশ চাষী প্রতিদিন পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের গৃহে শিশুরা দুধ পায় না; উপবাসী থাকিতে থাকিতে মার বুকের দুধ শুকাইয়া গিয়াছে, বাড়িতে একটি গোরু থাকিলেও খাইতে না পাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহাও দুধ দেয় না, কিম্বা সামান্য যেটুকু দুধ দেয়, চাষী পিতা শীর্ণকায় ছেলেমেয়েকে তাহা খাইতে না দিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়; দুধ বেচিয়া সামান্য যাহা পায়, তাহা হইতেই দিনান্তে প্রয়োজন তৈল, লবণ প্রভৃতি কিনিয়া থাকে। চাষীর পরিবারে কাহারও রোগ হইলে পয়সার অভাবে চিকিৎসা হয় না। নিকটে দাতব্য ডাক্তারখানা থাকিলে (পল্লীগ্রামের দাতব্য ডাক্তারখানায় অবশ্য জটিল রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই) তবু কতকটা চিকিৎসা হইতে পারে। নতুবা বিনা চিকিৎসায় ভুগিতে ভুগিতে রোগী মরিয়া থাকে। দৈবক্রমে যাহাদের অসুখ সারে, তাহারাও দুর্ব্বল শরীরে প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার না পাইয়া মরিয়া থাকে। মৃত্যুর কোলে তাহাদের সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয়।

কৃষকের এই শোচনীয় দুর্দ্দশার প্রধান কারণ তাহাদের দারিদ্র্য এবং তাহাদের শোচনীয় দারিদ্র্যের প্রধান কারণ কৃষিক্ষেত্র হইতে পর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে অক্ষমতা। শতকরা ৬৭ জন ভারতবাসী চাষ-আবাদে জীবিকা সংগ্রহ করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অন্য কোন উপায়ে আয় বাড়াইবার সুযোগ পায় না। কৃষির উন্নতি না হইলে, এবং অন্য কাজে কিছু আয় করিতে না পারিলে তাহাদের দুর্দ্দশার প্রতিকার হইবে না।

কৃষির উন্নতিসাধনের উপায় সরকার বহুদিন যাবৎ অনুসন্ধান করিতেছেন। ভারতের বর্ত্তমান বড়লাট মাননীয় লর্ড লিন্‌লিথগোর সভাপতিত্বে ১৯২৮ সনে তদুদ্দেশ্যে একটি কৃষি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, কৃষির উন্নতিমূলক উপায় অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার একটি গবেষণা-পরিষদ স্থাপন করিয়াছেন। উহা কৃষি-গবেষণা-পরিষদ (Imperial Council of Agricultural Research) নামে পরিচিত। চাষের উন্নতির জন্য এই পরিষদ যে চেষ্টা করিতেছেন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফল কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য কৃষি-বিজ্ঞানবিদ্ ডক্টর সার্ জন রাসেলকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিস্তারিত অনুসন্ধান করিয়া তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ভারতে কৃষির ও কৃষকের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ বুঝিতে পারা যায়।

কৃষির উন্নতিসাধনে অন্যান্য দেশে যে সকল চেষ্টায় সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা এদেশে কেন ফলবতী হইতে পারে না, সে সম্বন্ধেও তিনি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কৃষিমঙ্গলমূলক কার্য্য সম্পর্কে উহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন। সে কারণে তাঁহার মতামত আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

গ্রামে শিক্ষিত লোকের অভাব

অন্যান্য দেশে কৃষির উন্নতির জন্য যে সকল চেষ্টায় সুফল পাওয়া গিয়াছে, বিশেষ কতকগুলি কারণে ভারতে তাহা দ্বারা সুফল পাওয়ার আশা কম। নিরক্ষরতা, কৃষকের ঋণভার, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও স্বাস্থ্যহানি-হেতু স্বাভাবিক কার্য্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় নিশ্চেষ্টতা, লোকসংখ্যার তুলনায় গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি, সামাজিক বাধা-নিষেধ এবং ৭ লক্ষেরও বেশি গ্রামে কৃষি-মঙ্গলমূলক কাজ প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা আরম্ভ করার অসুবিধাই ঐ সকল কারণ; এই সকল বাধা সহজে দূর হইবে বলিয়াও আশা করা যায় না।

চাষীর মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠাপন্ন শ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকাই বোধ হয় কৃষির উন্নতিসাধনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি অসুবিধা হইতেছে। এই শ্রেণীর লোকের চেষ্টায়ই পাশ্চাত্য দেশে কৃষিক্ষেত্রের নানারূপ উন্নতি হইয়াছে; কৃষিক্ষেত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, কৃষিবিজ্ঞানে

সুশিক্ষিত, চাষে ও পশুপালনে বিশেষ ওয়াকিবহাল, এই শ্রেণী জমি হইতে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণে ফসল তোলার সকল উপায়ই জানেন। তাঁহারা না থাকিলে ঐ সকল দেশে কৃষি যে এখনকার মত উন্নত হইত না, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তক্রমে বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে চাষের উন্নতিসম্পর্কে কোন আবিষ্কার হইলে সঙ্গে সঙ্গে বহু কৃষিক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা হয়; বহু জমির মালিক, কোন কোন চাষী উপযোগিতা বুঝিতে পারিলে নিজ ব্যয়েই উহা লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য প্রণালী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। ইহারা অনেক সময় নিজেদের চেষ্টায় চাষের উন্নতির উপায় আবিষ্কার করেন, এবং এই সকল চাষীর সমান ফসল তুলিতে পারিলে সরকারী কৃষিক্ষেত্রের পরিচালকগণও বহুস্থলে নিজেদিগকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করেন।

শিক্ষিত এই শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে ক্ষেতের কাজ করার ও পল্লী অঞ্চলে বাস করার ফলে পল্লীসমাজের আকর্ষণও অনেকটা বাড়িয়া থাকে।

এইরূপ একটি শ্রেণী না থাকা ভারতের দুর্ভাগ্য। জমির মালিকগণ অনেকেই শহরে বাস করেন; যাঁহারা গ্রামে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে খুব বেশি জমি চাষ করেন না। ইহার দুই চারিটি ব্যতিক্রমও আছে। সিন্ধুতে সুক্কুর গাল অঞ্চলে, পঞ্জাবে ও উত্তর-বিহারে কোন কোন জমিদার নিজ তত্ত্বাবধানে চাষ করান এবং নিজে ক্ষেতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মজুরদিগকে নির্দ্দেশ দেন। ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ দেওয়া এবং এইরূপ জমিদারের সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করা উচিত।

শিক্ষিত কৃষকের সংখ্যা বাড়ানো অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাহাতে চাষ-বাস আরম্ভ করেন, তাহার ব্যবস্থা করাও বিশেষ প্রয়োজন। কৃষি-বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও পরীক্ষা পাস করার পরে চাষ করিতে যায় না। পাশ্চাত্য দেশে কৃষি-কলেজের ছাত্রগণ পড়া শেষ হইলে নিজের হাতে চাষ-বাস আরম্ভ করে। আর ভারতে কৃষিবিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা পাইয়া যুবকগণ হাতে চাষ না করিয়া চাকুরি আরম্ভ করে; তাহারা যে শিক্ষা পাইয়াছে ও যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে, এই সকল চাকুরিতে তাহা সদ্ব্যবহার করার সুবিধা খুব বেশি পায় না। সংস্কৃতে প্রবাদ আছে,

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াম্, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

বর্ত্তমান যুগে ভারতবাসী উহার সত্যতা অস্বীকার করিতেছে।

এখন সরকারী চাকুরিই শ্রেষ্ঠতম ও কৃষিকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতেছে। সেই কারণেই কলেজের ছাত্রগণ চাষ-বাস আরম্ভ করে নাই। কৃষি-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রগণ জমি চাষ আরম্ভ করিয়া গ্রামে বাস না করিলে কলেজগুলি পল্লী-জীবনে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। সমস্ত ভারত ঘুরিয়া কৃষি-কলেজে শিক্ষিত ২।৩ জন মাত্র চাষী দেখিয়াছি। পক্ষান্তরে অল্প কয়েকজন জমিদারকে বিশেষ উৎসাহের সহিত আমি চাষ করিতে দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা অনেকেই কৃষি-কলেজে শিক্ষা পান নাই।

তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, কৃষি-কলেজে শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাষ আরম্ভ করিলে তাহাদের প্রতিবেশী বহু চাষী বিশেষ উপকৃত হইবে। এইরূপ একজন শিক্ষিত কৃষক আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বীয় কৃষিক্ষেত্রে যদিচ্ছা কাজ করার অধিকার থাকায় তিনি উৎকৃষ্ট বীজ বোনার, জমিতে সার দেওয়ার উদ্দেশ্যে নানারূপ কাঁচা ফসল চাষ করার, জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে প্রয়োজন ফসলগুলি একটির পর একটি চাষ করার, ইচ্ছানুসারে সার দেওয়ার, জল সেচ করার, উৎকৃষ্ট ফসল-চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষা করার, মৌমাছি-পালনের ও সমবায় নীতিতে ফসল বিক্রয় করার নানা সুবিধা পাইয়াছেন। ক্ষেতের কাজে তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন; এখন জমির পরিমাণ বাড়ানোই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু গ্রামে আর জমি নাই—সকল কৃষকের সম্পত্তি—সাধারণ গো-চারণের যে মাঠ আছে, তাহা তাঁহাকে বিক্রয় করিতে পল্লীর অন্যান্য কৃষক সম্মত নহে। কৃষি-কলেজে শিক্ষিত যুবকগণ কেন কৃষিকার্য্যে অবতরণ করে না, তাহা অনুসন্ধান করা এবং কৃষিকার্য্যে ঐরূপ যুবকের সংখ্যা-বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষিত যুবকগণ যাহাতে চাষ-বাস আরম্ভ করে, তজ্জন্য কোন কোন স্থানে চেষ্টা হইতেছে। সিন্ধু জিলায় দাদুতে

তদুদ্দেশ্যে একটি কৃষিক্ষেত্র খোলা হইয়াছে। কৃষি-কলেজে শিক্ষিত ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে, এখানে ২ বৎসরের জন্য জমি লইয়া চাষ করিতে পারে, সরকারী কৃষি-বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের উপদেশ তাহাদিগকে লইতে হয়; দুই, দুইজন ছাত্রকে একটি দলে ভাগ করিয়া ৩½ একর—প্রায় ৯৬ বিঘা জমি দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে ইহাদিগকে স্বীয় চেষ্টায় জমি সংগ্রহ করিতে হয়।

বোম্বায়ে বন-বিভাগ ভূমিহীন লোকদিগকে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সরকারী বনে ফলের চাষ করিতে দিয়া থাকেন। ঐ সময় অন্তে তাহাদিগকে জমি ছাড়িয়া দিতে হয়। কেবলমাত্র ভূমিশূন্য কৃষকদিগকে এক্ষণে এই সুবিধা দেওয়া হইতেছে; কৃষি-কলেজে শিক্ষিত যুবকদিগকে এইরূপ কোন সুবিধা দেওয়া সম্ভব কি না, তাহা বিবেচনা করাও প্রয়োজন।

শিক্ষিত যুবক পল্লীগ্রামে বসতি করিলে গ্রামবাসী-দিগের সুবিধা হইবে বটে; কিন্তু গ্রামে সমশ্রেণীভুক্ত লোকের অভাব হেতু ঐ সকল যুবকের বিশেষ অসুবিধা হইবে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য পাঞ্জাবে যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরলোকগত সার্ ফজলি হোসেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া ঐ পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করেন। সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে সাধারণ কৃষকের আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখিয়া সুপরিচালিত কৃষিক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ সম্পর্কে তিনি বিশেষ আশান্বিত হন এবং শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা চাষ আরম্ভ করাইবার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবে নূতন নূতন গ্রাম গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন কলেজ কর্ত্তৃক মনোনীত ২২ জন ছাত্র সহ এক একটি গ্রাম স্থাপিত হয়; সাধারণ কলেজের ২০ জন ও কৃষি-কলেজের ২ জন ছাত্রকে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঠানো হয়; এবং প্রত্যেককে কতকগুলি সর্ত্তে ৫৫॥ একর (প্রায় ৭০ বিঘা) জমি দেওয়া হয়; ঐ সকল সর্ত্ত পালিত হইলে ৫ বৎসর পরে জমিতে তাহাদিগকে দখলি সর্ত্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

পাঞ্জাব সরকার মনে করেন যে, এই পরিকল্পনা সফল হইয়াছে; অন্যত্র এইরা বিস্তার করার প্রস্তাবও তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন।

কৃষিঋণের বোঝা

ভারতের কৃষক ঋণভারে জর্জ্জরিত। যে সকল স্থানে সরকারী বা বে-সরকারী চেষ্টায় পল্লীমঙ্গলজনক কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তথায়ও খবর লইলে জানা যায় যে, বৎসর শেষে অধিকাংশ কৃষক-পরিবারেই ঘাঁটতি পড়ে এবং বেনিয়ার ও মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া সেই ঘাঁটতি পূরণ করা হয়। বহুদিন যাবৎ এইরূপ অবস্থা চলিতেছে। ১৯৩০ সনে কেন্দ্রীয়-ব্যাঙ্ক-তদন্ত-কমিটি ভারতে কৃষিঋণের পরিমাণ ৯০০ কোটী টাকা অনুমান করিয়াছিলেন, ১৯৩৬ সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহা ১৮০০ কোটী টাকা অনুমান করিয়াছেন। ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা, বৎসরের পর বৎসর সুদ দেওয়াও অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং অনাদায়ী সুদের দায়ে ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িতেছে। অবশ্য, কোন কোন প্রদেশের সরকার পরবর্ত্তী কালে ঋণের ও সুদের পরিমাণ কমাইয়া এবং ঋণের দায়ে চাষীর সম্পত্তি-বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া আইন রচনা করিয়াছেন।

ঋণের দায়ে কৃষকের কার্য্যক্ষমতা একেবারে লোপ পাইয়া থাকে—চাষের উন্নত প্রণালী দ্বারা জমিতে ফসল বাড়িলেও তাহার সুবিধা মহাজন পাইবে এবং নিজে পাইবে না—এই আশঙ্কায় চাষী কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি সাধনে আদৌ চেষ্টা করে না। অন্য দিকে জমিতে যাহাতে যথাসম্ভব ফসল হয়, তাহার জন্য মহাজনরাও চাষীকে উৎপীড়ন করে; কেন না, ফসল না হইলে মহাজন সুদ বা ফসল পাইতে পারে না। কোন কোন স্থানে মহাজনের চেষ্টায় কৃষিক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও নূতন নূতন বীজ বোনা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মহাজন বা বেনিয়াকে পল্লী-জীবনের আর্থিক ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। এই উক্তি অলীক নহে। তাহারা গ্রামের উন্নতি করিতে সচেষ্ট হইলে পল্লীমঙ্গলমূলক কাজে অনেক বেশি সুফল পাওয়া যাইত।

সমবায় আন্দোলন

সমবায় আন্দোলনের সাহায্যে পাশ্চাত্য দেশে গ্রামের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ভারতেও এই আন্দোলন দ্বারা অনেক উপকার আশা করা গিয়াছিল।

সমবায় আন্দোলন বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। সমবায় আন্দোলনের সাহায্যে ঋণদানের সুবিধা করার জন্যই ভারতে বেশি চেষ্টা হইয়াছে; ঋণ সরবরাহের জন্য বহু সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার লইয়া উহারা সভ্যদিগকে টাকা ধার দিয়াছে। ধার দিতে কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই, কিন্তু টাকা আদায় করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির জন্য স্বল্পকাল পরে পরিশোধের সর্ত্তে যে টাকা ধার দেওয়া উচিত ছিল, তাহা অন্যান্য প্রয়োজনে দীর্ঘকালের মেয়াদে ধার দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনকালে উহা ফেরত পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ উহার অধিকাংশই পরিশোধ হইবে না এবং হিসাবের খাতায় "বাতিল" করিতে হইবে। ঋণদান ব্যবস্থার সহিত সঞ্চয় না রাখিয়া সাধারণভাবে উন্নতির জন্য কতকগুলি সমবায়-সমিতি গঠিত হইয়াছিল—উহাতে খুব বেশি সভ্য পাওয়া যায় নাই।

এই ব্যর্থতার জন্য সমবায় নীতিকে দায়ী করা চলে না; ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা এই আন্দোলনের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। কৃষিপ্রধান দেশ ডেন্‌মার্ক সমবায় আন্দোলনে অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে; তথাকার কৃষকের সচ্ছলতা অন্যান্য দেশবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ডেন্‌মার্কে নিম্নলিখিত কারণে এই আন্দোলন সফল হইয়াছে,—

(১) গ্রামবাসীগণের মধ্যে জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদ নাই; তাহারা সকলেই সমশ্রেণীভুক্ত।

(২) কৃষকগণ সকলেই শিক্ষিত।

(৩) সমবায় আন্দোলনের প্রথমাবস্থায়ই উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল; স্বগৃহে এবং পল্লীতে উচ্চতর জীবনযাত্রা-প্রণালী ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল, জাতীয়তার এবং সমষ্টিগত জীবনযাত্রার আদর্শ তাহাদিগকে শিখানো হইতেছিল।

(৪) সমবায়-সমিতিগুলির অধিকাংশই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান; তাহারা চাষীর নিকট হইতে ফসল লইয়া বাজারে বিক্রয় করে এবং গৃহে ও কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজন সকল জিনিস চাষীকে সরবরাহ করে। স্থানীয় ব্যাঙ্ক ও সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে তাহারা মূলধন পাইয়া থাকে এবং সুভাগন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকে। অধিকাংশ সভ্য স্থানীয় সেভিংস ব্যাঙ্কেরও আমানতকারী। ঐ টাকাই সমবায়-সমিতিকে এবং সমিতির মারফতে সভ্যদিগকে দেওয়া হয়; সুতরাং ঋণগ্রহণকারী প্রত্যেকেই উহা পরিশোধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

দুঃখের বিষয় ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে এদেশে সমবায় আন্দোলন সফল করিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে। এজন্য কিছু কিছু কাজ হইয়াছে; একেবারে নিরাশ হওয়ারও কোন কারণ নাই। সরকারী কর্ম্মচারীগণের চেষ্টায় পাঞ্জাবে কতকটা সাফল্য লাভ করা গিয়াছে। বোম্বাইয়ে কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী এই আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন—সার্ চুনিলাল মেটা প্রভৃতি বোম্বাই প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালক। বীরভূমে সুরুল শ্রীনিকেতনের পরিচালনায় কতকগুলি সমিতিও ভাল কাজ করিতেছে। বাহিরের লোক, ব্যবসায়ীরা পরিচালনা-ভার লইলে এবং ঋণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদিগকে মিতব্যয় শিখাইতে পারিলে এই আন্দোলন কতকটা সফল হইবে বলিয়া মনে করা যায়।

মাথা পিছু জমির অল্পতা

কৃষির উন্নতির আর একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, কৃষকের মাথা পিছু জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম, তদুপরি উহা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত। প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনানুসারে পিতার সকল পুত্র এবং মুসলমান পরিবারে কন্যাও জমি পাইয়া থাকে। মোট জমির বিভিন্ন খণ্ডগুলি দূরে দূরে অবস্থিত। এই সকল খণ্ড একত্র করিয়া একই স্থানে একসঙ্গে কৃষককে তাহার সকল জমি দিতে পারিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে অসুবিধাও প্রচুর। অন্যান্য দেশেও এই সমস্যা দেখা গিয়াছিল, প্রচুর বাধা অতিক্রম ও আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে জমির খণ্ড খণ্ড অংশগুলি একত্র করা হইয়াছিল। পোল্যাণ্ডে এক্ষণে এইভাবে খণ্ড খণ্ড জমি একত্র করা হইতেছে

এবং চাষীরা তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিতেছে। ভারতে ইহা করিতে অসুবিধা আরও বেশি, তথাপি উহা প্রয়োজন। কোন কোন স্থানে চাষীদিগকে বুঝাইয়া ইহাতে সম্মত করা গিয়াছে। পাঞ্জাবে জমি সংযোজিত করার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতিগুলি বেশ ভাল কাজ করিতেছে।

যে সকল স্থানে জমির খণ্ড খণ্ড অংশগুলি একত্র করা যায় না, সেস্থানে একসঙ্গে ফসল চাষ করার ও কাটার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যুক্তপ্রদেশে সরকারী জলসেচ-পরিকল্পনা অনুসারে মীরাট বিভাগে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে ও ইহার ফলে ফসলের পরিমাণ বাড়িয়াছে, চাষীর শ্রমও কমিয়াছে।

যে সকল অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে, তথায় চাষী ও জমিদারের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী বহু শ্রেণী আছে। জমি হইতে ফসল তোলার কাজে কোন সাহায্য না করিয়াও ইহারা প্রত্যেকে জমিতে আয়ের একটা অংশ লইয়া থাকে। অথচ জমির বা প্রজার প্রতি তাহাদের কোনই দায়িত্ব নাই। কৃষির উপর ইহাদের প্রতিক্রিয়া বুঝিবার কোন উপায় নাই।

কৃষি সম্পর্কে শিক্ষার অভাব

অন্যান্য দেশে বালকদিগের মনে চাষ-বাসে আগ্রহ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে গ্রামের বিদ্যালয়ে ভাল ভাল বাগান তৈয়ারি করা হয়। বিদ্যালয়ে বাগান না থাকিলে গ্রামে বালকদিগের বিশেষ কোন আকর্ষণ থাকে না; ফলে বড় হইয়া তাহারা গ্রাম ছাড়িতে পারে। ভারতে খুব কম বিদ্যালয়েই বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করিয়া বাগান রচনা করা উচিত।

চাষীর আয় বাড়াইবার অন্য উপায়

কেবলমাত্র ক্ষেতের ফসল বিক্রয় করিয়া চাষী সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে না। বাকি টাকার জন্য তাহাকে অন্য কাজ করিতে হয়, কিম্বা ধার করিতে হয়। বছরে বহু সময় চাষী বসিয়া থাকে—সকল সময় ক্ষেতে কাজ থাকে না। ঐ সময় অনেকে গাড়ি চালাইয়া বা নৌকা বাহিয়া কিছু উপার্জ্জন করে। কিন্তু মোটর গাড়ির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতেও আয় কমিয়াছে। শহরে এবং হাটে বাজারে দিনমজুরিও কোন কোন সময় মিলিয়া থাকে, কিন্তু গ্রামে ছোট ছোট শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিলে চাষীকে কাজ দেওয়ার খুব সুবিধা হয়। ঐ সকল ছোট ছোট কারখানায় তৈয়ারি জিনিস বেচিতে অবশ্য প্রচুর অসুবিধা আছে—পল্লীর বাহিরে কুটীরবাসীর তৈয়ারি জিনিসের চাহিদা অনেকটা ভাবপ্রবণতার উপর নির্ভর করে। বিশ্বভারতী অথবা দয়ালবাগ (আগ্রা) প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান মানবতার দিক হইতে আবেদন জানাইয়া ঐ সকল জিনিস বিক্রয় করিতে পারে; কিন্তু লেনদেনের হিসাবে কারখানায় তৈয়ারি সুলভ মালের প্রতিযোগিতায় উহা বিক্রয় করা সহজ নহে। ভারতীয় নারীগণ কেবলমাত্র কুটীরে তৈয়ারি জিনিস কিনিয়া এই সমস্যার কতকটা সমাধান করিতে পারেন।

সাধারণভাবে কুটীরশিল্প বিস্তারে অসুবিধা থাকিলেও এরূপ একটি শিল্প আশাতীত বিস্তারলাভ করিয়াছে। হাতে চালানো তাঁত-শিল্প ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছে, তাঁতে তৈয়ারি জিনিস স্বদেশে ও বিদেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। ভারতের কলে ও তাঁতে বোনা কাপড়ের পরিমাণ সম্পর্কে নিম্নপ্রকাশিত সংখ্যা দ্বারা তাহা বুঝা যায়:—

	তাঁতে বোনা কাপড় (কোটী গজ)	কলে বোনা কাপড় (কোটী গজ)
১৯৩০-৩১	১৩৯	২৫৬
১৯৩১-৩২	১৫০	২৯৯
১৯৩২-৩৩	১৭০	৩১৭
১৯৩৩-৩৪	১৪৪	২৯৪॥০
১৯৩৪-৩৫	১৪৬	৩৩৯৸০
১৯৩৫-৩৬	১৮৪	৩৫৬৸০
১৯৩৬-৩৭	১৪৯	৩৫৭
১৯৩৭-৩৮	অজ্ঞাত	৪০৮

প্রধান একটি কুটীর-শিল্প হিসাবে গালার গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে ইহার চাষ ও গালা তৈয়ারি হয়।

হাঁস মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষীপালনও আয়-বৃদ্ধির একটি উপায়। উৎকৃষ্ট পাখীর চাহিদা ক্রমশ বাড়িতেছে। ডিম ও পাখী বাজারে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ইহা দ্বারা চাষীর বেশ আয় হইতে পারে।

মৌমাছি পালন করিয়াও কোন কোন অঞ্চলে চাষী বেশ লাভ করিতে পারে। পার্ব্বত্য অঞ্চলেই এই ব্যবসায়ে বেশি লাভ হইয়া থাকে, সমতল অঞ্চলে তত লাভ হয় না। সাধারণত ফলের চাষের সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি পালন করা হয়।

গ্রামে নেতার অভাব

গ্রামে অশিক্ষিত ও গরিব চাষীদিগকে ঠিক পথে চালাইবার মত উপযুক্ত নেতা থাকিলে অনেক অসুবিধা দূর হইতে পারে। গ্রামে প্রধান কিম্বা অধিকাংশ জমির মালিক বাস করিলে ইহার অনেক অসুবিধাই দূর হইয়া থাকে। সুন্দরবনে চাষীদিগের উন্নতির জন্য তথাকার জমিদার সার্ ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন যে চেষ্টা করিতেছেন, এ সম্পর্কে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার জমিদারীতে কয়েক শত চাষী আছে, তাহাদিগকে ঋণদানের জন্য এবং তাহাদের ফসল বিক্রয়ের জন্য তিনি দুই প্রকার সমবায়-সমিতি গঠন করিয়াছেন। ফসল-বিক্রয়-সমিতিগুলি ফসলের মূল্য হইতে চাষীর দেনা ঋণ-দান-সমিতিকে পরিশোধ করিয়া বাকি টাকা চাষীর হাতে দিয়া থাকে। বড় বড় জমিদারগণ পরিশ্রম করিলে নিজ নিজ জমিদারীতে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। অবশ্য কৃষকদিগের মধ্যে ধনী ও অভিজাত একটি শ্রেণী না থাকায় ঐরূপ পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনে বিশেষ অসুবিধা হইবে। সাধারণ গ্রামবাসী গ্রামের উন্নতিতে নিজেদের দায়িত্ব বুঝিতে না পারিলে গ্রামের সকল প্রকার উন্নতি হইতে পারে না।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবে গ্রামে কোনরূপ আকর্ষণ নাই। তাহার ফলে, পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যও খারাপ হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষিত নরনারী শহরে কোন কাজ পাইলে গ্রামে বাস করিতে চাহে না।

সুতরাং কৃষির উন্নতি করিতে হইলে গ্রামের উন্নতি করিতে হইবে। এ সম্পর্কে বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার প্রেরণায় বহু কর্ম্মী গ্রামের উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। ইহা বিশেষ শুভলক্ষণ। এ সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট একটি কার্য্যসূচী রচনার উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ কর্ম্মীদিগের একটি সম্মেলন আহ্বান করা বাঞ্ছনীয়। গ্রাম সম্পর্কে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারিলে কোন পরিকল্পনাই সফল হইতে পারে না; গ্রামের উন্নতিসাধনে গ্রামবাসীরা নিজেরাই যাহাতে চেষ্টা করে, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাহিরের লোকের চেষ্টায় কিছুদিন সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা ফিরিয়া গেলে গ্রামবাসীরাও পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে। সমষ্টিগতভাবে গ্রামের উন্নতিমূলক কাজ করিতে যে সময় প্রয়োজন, গ্রামবাসীরা স্বচ্ছন্দে তাহা দিতে পারে। একবার তাহাদিগকে এই কাজে লাগাইতে পারিলে ইহা স্থায়ী হইবে।

পল্লী-বিদ্যালয়

পল্লীজীবনে আকর্ষণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে বহু বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। গোড়া হইতেই যাহাতে ঠিক পথে শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা এক্ষণে প্রয়োজন। কেবলমাত্র সাহিত্য-শিক্ষার কোন উপকারিতা নাই। উহা দ্বারা বালকগণ জমিতে আকৃষ্ট হয় না; গ্রামে থাকিয়াই তাহারা কি ভাবে নিজের ও সমাজের উন্নতি করিতে পারে, তাহা তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। মাঠে নামিয়া কিম্বা বাগানে কোদাল ধরিয়া নিজে কাজ না করিলে উচ্চশিক্ষা পড়াইয়া লাভ হয় না। হাতে কাজ করার সময় গাছগুলি ছাত্রের সম্মুখে থাকে ও উহা দেখিয়া সে অনেক বেশি জ্ঞান লাভ করিতে পারে। গ্রামের বিদ্যালয়ে একটি বাগান রাখার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বেই আমি উল্লেখ করিয়াছি। গ্রামে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক্ষণে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা দ্বারা পল্লীজীবনে তাহাদের আকর্ষণ লোপ পাইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে। পল্লীমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ফসলের পরিমাণ বাড়াইবার ও

সার প্রয়োগের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হয়, কৃষকগণ যাহাতে তাহা জানিতে পারে এবং নিজ নিজ কৃষিক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করে, সেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বে-সরকারী য়ুরোপীয় পরিচালিত বহু কৃষি-ক্ষেত্রে নূতন নূতন প্রণালীতে চাষ করিয়া এবং উৎকৃষ্ট বীজ বুনিয়া ফসলের পরিমাণ দেড়গুণ হইতে দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু সাধারণ কৃষক এখন পর্য্যন্ত এই সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুযোগ গ্রহণ করে নাই। ইহার সুবিধা কৃষকদিগকে হাতে কলমে করিয়া দিতে পারিলে ধীরে ধীরে ইহা বিস্তার লাভ করিবে।

এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপযোগিতা বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয় এবং কৃষকের জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হয়। সরকারী কৃষিক্ষেত্রে রাজকর্ম্মচারীদিগের পক্ষে যাহা সম্ভব হয়, সাধারণ কৃষকের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং ঐ সকল ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষা সফল হইলেও সাধারণ চাষী তাহা প্রয়োগ করার সুবিধা না পাইতে পারে। কৃষকের জমি লইয়া যে পরীক্ষা হয়, তাহাতেও কেবলমাত্র নূতন ধরণের বীজ বোনা ও নূতন ধরণের লাঙ্গল প্রভৃতি দ্বারা চাষ করার সুবিধা দেখানো হয়।

ইহার পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ একটি কৃষিক্ষেত্র লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিলে ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে। চাষীই ঐ কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিবে। যে চাষী সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ফসল তুলিতে পারে, এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে চাষ করিতে সম্মত—তাহাকে নিজ ক্ষেত্রে ঐ সকল প্রণালী অনুসারে চাষ করার জন্য কতকগুলি সুবিধা দেওয়া যায়; বিনামূল্যে কিম্বা অল্প দরে বীজ দিয়া ও যন্ত্রাদি কেনার জন্য টাকা ধার দিয়া তাহাকে সাহায্য করিলে প্রতিবেশী কৃষকগণও তাহার কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি দেখিয়া উৎসাহিত হইতে পারে। ইহার ফলে কৃষির উন্নতি করিতে আগ্রহ জন্মিবে।

সরকারী কৃষিক্ষেত্রে এক্ষণে যে সকল পরীক্ষা হইতেছে, সাধারণ কৃষকের জমিতে সেই সকল পরীক্ষা করিলে অনেক বেশি উপকার হইবে। সরকারী কৃষিক্ষেত্রে এক্ষণে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিতে বহু সময়ক্ষেপ হয়। উহার বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই। সাধারণ কৃষকের জমিতে নানারূপ পরীক্ষায় ইহার কিছু সময়ক্ষেপ করিলে অনেক সুফল পাওয়া যাইবে; পরীক্ষাকারীদিগের অভিজ্ঞতা বাড়িবে, চাষীরাও পাশে দাঁড়াইয়া কিছু শিখিতে পারিবে। এরূপ পরীক্ষায় চাষীর কাজের যে ক্ষতি হইবে, তাহা পূরণের জন্য অবশ্য কিছু ব্যয়ও করিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপযোগিতা চাষীকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। যে সকল কর্ম্মচারী ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন, কিম্বা কথায় কথায় চাষীদিগকে নিজ মতাবলম্বী করিতে পারেন, তাঁহারা এই কাজের বিশেষ উপযোগী। ইহা জন্মান্তরীণ শক্তি—অভ্যাসের দ্বারা ইহা লাভ করা যায় না। যে সকল কর্ম্মচারী এই কাজ ভালভাবে করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে অন্য কাজে নিয়োগ করা উচিত নহে। পদোন্নতির উদ্দেশ্যে তাঁহারা যাহাতে অন্য বিভাগে যাওয়ার চেষ্টা না করেন, তজ্জন্য এই বিভাগেই তাঁহাদের বেতন বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

বেতারের বিস্তার দ্বারা কৃষির কতটা উন্নতি হইতে পারে, তাহা অনুসন্ধান করাও প্রয়োজন। গ্রামে বেতার-বার্ত্তা শুনিবার সু-ব্যবস্থা থাকিলে বেতারের সাহায্যে বাজার-দর, কৃষিমঙ্গল-ব্যবস্থা প্রভৃতি জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া যায়। পল্লী অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যেও বেতার দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইতে পারে।

সম্পাদকের নিবেদন

'পল্লী-শ্রী'র প্রথম বর্ষ শেষ হ'ল। যাঁরা এ পত্রিকাখানিকে এতদিন প্রীতির চোখে দেখেছেন, যাঁদের সহানুভূতি ও উৎসাহে এর যাত্রাপথের সকল বিঘ্ন দূরে গেছে—আশা করি, আগামী বর্ষেও তাঁরা প্রীতি, সহানুভূতি ও উৎসাহ দিয়ে একে বাঁচিয়ে রাখবেন।

এ জেলায় পল্লী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টার পরিচয় দিতে পত্রিকাখানির সৃষ্টি। কিন্তু শুধু সেই কথা শুনিয়ে পত্রিকা তৃপ্ত হতে পারে নি। প্রতি মাসে সাহিত্য, বিজ্ঞানের কথা, পল্লীগাথা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কৃষি ও শিল্পের প্রচার, খেলাধূলা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞের লেখা বক্ষে ধারণ করার গৌরব এই ক্ষুদ্রায়তন মাসিকপত্রিকাখানি অর্জ্জন করেছে। বাংলার সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে সুপরিচিত স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-গবেষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একে স্নেহের চক্ষে দেখেছেন এবং তাঁদের কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। 'পল্লী-শ্রী' পত্রিকার এইটুকুই বৈশিষ্ট্য।

যাঁরা প্রথম বর্ষে পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন, আশা করি দ্বিতীয় বর্ষেও তাঁদের সহানুভূতি থেকে পত্রিকাখানি বঞ্চিত হবে না। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা যথারীতি তাঁদের নামে পাঠানো হবে। পত্রিকাপ্রাপ্তির সঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা পাঠাইলে পত্রিকাখানির যথেষ্ট উপকার করা হবে।

সম্পাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম
মেদিনীপুর জেলা-পল্লী-উন্নয়ন-সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রবোধ নারায়ণ শচীন্দ্রনাথ
প্রেস, ২০৯ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত